তফসীরে নূরুল কোরআন

সপ্তদশ পারা

১৭

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

সপ্তদশ খন্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

তফসীরে নূরুল কোরআন

সপ্তদশ খন্ড

১৭

সপ্তদশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্ণরস, সদস্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড, মরহুম ইমাম ও খতীব, লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

تفسير نور القران

للعلامة محمد امين الاسلام

الجزء السابع عشر

ষষ্ঠ প্রকাশ	ঃ	মহররম-১৪৪২ সেপ্টেম্বর-২০২০ আশ্বিন-১৪২৭
প্রকাশক	ঃ	মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান
সর্বস্বত্ব	ঃ	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মুদ্রণে	ঃ	নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০
হাদিয়া	ঃ	৩৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

আন-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১৩০১৪৮৮৯

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

Tafseer-e Nurul Quran (17): By Hazrat Moulana Mohammed Aminul Islam (R). Published by Al-Balag Publications. 12/17, Sir Sayed Ahmed Road. Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207, Mobile : 01713014889
Price : 350.00

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم.

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অনন্ত অসীম শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের সপ্তদশ খন্ড পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!! যদি এ অধমের দেহের প্রতিটি পশমের রসনা থাকতো, আর প্রত্যেকটি রসনা দ্বারা সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করতে থাকতাম, তবুও তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে শোকর গুজারীর হক্ব আদায় হতনা। কেননা, তাঁর নেয়ামত অসীম, আর শোকর গুজারীর সাধ্য সীমিত। এ অক্ষমতা ও অপারগতার জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। এটি আল্লাহ পাকের নিতান্ত দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয় যে তিনি তাঁর এ নগণ্য, অযোগ্য বন্দাকে তাঁর পবিত্র কালামের তফসীর রচনার তৌফিক দান করেছেন এবং আজ তফসীরে নূরুল কোরআনের সপ্তদশ খন্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ পেশ করার সুযোগ দিয়েছেন, এজন্যে আদায় করি তাঁর মহান দরবারে সেজদায়ে শোকরানা।

অগণিত দরুদ ও সালাম প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর নেক নজরের বরকতে আল্লাহ পাক তফসীরে নূরুল কোরআন রচনা ও প্রকাশনার তৌফিক দান করেছেন, যিনি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ রসূল, যিনি সত্য প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক সফলকাম, যিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বাধিক নৈকট্যের অধিকারী, যিনি আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং পছন্দনীয়, যিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন।

একথা সর্বজন বিদিত যে, মানব জীবন দু'টি বস্তুর সমন্বিত রূপ। একটি দেহ, আর একটি রূহ। দেহ ব্যতীত রূহ থাকেনা, আর রূহ ব্যতীত দেহ অসার, মূল্যহীন, সমাধিস্থ হওয়ার বস্তু। যতক্ষণ মানব দেহে রূহ থাকে, শুধু ততক্ষণই মানুষ জীবন্ত, চলন্ত, সক্রীয় এবং কর্মব্যস্ত আর রূহ ব্যতীত দেহ নিক্রীয়। মানব দেহের পরিপুষ্টি সাধনের জন্যে মহান দাতা আল্লাহ পাক সৃষ্টি জগতে তার পানাহারের ব্যবস্থা রেখেছেন এবং পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا. (সূরা হুদ-৬)

"পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রাণী মাত্রেরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ পাকের উপর"।

এজন্যে যমীনের মধ্যে আল্লাহ পাক সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে রিয্ক আমানত করে রেখেছেন। সকল যুগের, সকল দেশের মানুষ যমীন থেকে তার খাদ্য-দ্রব্য আহরণ করছে এবং কখনও এর ব্যতিক্রম হয়না। মানুষের দৈহিক শক্তির মূল উৎস হলো তার খাদ্য দ্রব্য। আর আল্লাহ পাক যমীনে যে জীবনী শক্তি সুপ্ত এবং গুপ্ত রেখেছেন, তার প্রথম কাজই হলো মানুষের খাদ্য উৎপাদন। ফল-মূল সহ যাবতীয় ফসল সরবরাহ করা। কোরআনে করীমে এ সত্যকে এভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ.

(সূরা ইয়াসিন-৩৩)

"এবং তাদের জন্যে মৃত যমীন একটি নিদর্শন, এ মৃত বা শুষ্ক যমীনকে আমি জীবনী শক্তি দান করি এবং তা থেকে তাদের জন্যে ফল মূলের বীজ বের করি, তা থেকে তারা আহার করে"।

আমরা প্রতিদিন এ দৃশ্য দেখে থাকি যে, যখনই যমীনে কোন বীজ বপন করা হয়, তখনই যমীন তা গ্রহণ করে। কেননা, যমীনের মালিক আল্লাহ্ পাক তাকে এ আদেশই দিয়েছেন। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানব দেহের খাদ্য আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে এভাবেই সরবরাহ হয়ে আসছে।

কিন্তু রূহ যদি তার খাদ্য গ্রহণ করতে না পারে, তবে স্বাভাবিক ভাবেই রূহ হয়ে পড়বে দুর্বল। এজন্যে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক মানব-রূহের শক্তির মূল উৎস রেখেছেন পবিত্র কোরআন। রূহের কাজই হলো স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ (সূরা বাক্বারা-১৫২)

"এবং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো, আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়োনা"।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ পাকের জিকরই হলো তাঁর নৈকট্য লাভের পন্থা, আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (সূরা রা'দ-২৮)

মনে রেখ, শুধু আল্লাহ পাকের জিকর বা স্মরণেই মানুষের অন্তর শান্তি লাভ করে, তার মনের পিপাসা মিটে, আর এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে আল্লাহকে স্মরণ করেনা, সে প্রকৃতপক্ষে জীবনী-শক্তি রহিত। কেননা, তার রুহ শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনা, তার দেহ শক্তিশালী হলেও সে হয় জীবন-মৃত।

হযরত আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাকে কিছু নসিহত করুন। তিনি এরশাদ করলেন, তুমি দৃঢ়ভাবে তাকওয়া অবলম্বন কর, কারণ তা হলো সবকিছুর মূল। আমি আরজ করলাম, আরও কিছু নির্দেশ করুন। তিনি এরশাদ করলেনঃ কোরআন পাকের তেলাওয়াত কর, কারণ এটি দুনিয়াতে তোমার নূর, আখেরাতে তোমার সম্পদ। (এবনে হাব্বান)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজে কোরআন শিখে ও অন্যকে শেখায়। (বোখারী শরীফ)

অন্য একখানি হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম হবে পবিত্র কোরআন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (কেয়ামতের দিন) পবিত্র কোরআন ধারণকারীকে বলা হবে, কোরআনে করীম পাঠ করতে থাক এবং জান্নাতের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাক। তরতীলের সঙ্গে পাঠ করতে থাক, যেমন তুমি দুনিয়াতে তরতীলের সঙ্গে পবিত্র কোরআন পাঠ করত। কেননা, তোমার তেলাওয়াত যে আয়াতে গিয়ে শেষ হবে সেখানেই হবে তোমার মঞ্জিল।

অতএব, জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যমই হলো পবিত্র কোরআন।

যেভাবে মানুষ যখন যমীনে তার খাদ্য দ্রব্য অন্বেষণ করে, তখন যমীন তা দিতে কার্পণ্য করেনা; বরং যে, যে প্রকার খাদ্য চায়, তাকে সে প্রকার খাদ্যই সরবরাহ করে; ঠিক তেমনি মানব রূহ যখনই পবিত্র কোরআন থেকে শক্তি আহরণ করতে চায়, পবিত্র কোরআন তা সরবরাহ করে থাকে। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে সর্বকালের মানুষের জন্যে হেদায়েত রেখেছেন। এ দিক থেকে বিচার করলে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কোরআনই হলো আল্লাহ্ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত, যা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি নাযিল হয়েছে, তাঁর মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতি এ নেয়ামত লাভ করেছে। পবিত্র কোরআন অদ্বিতীয়, মহান আসমানী গ্রন্থ। অন্যান্য সমস্ত আসমানী গ্রন্থে যা কিছু আছে, সবই সন্নিবেশিত হয়েছে পবিত্র কোরআনে। আর এছাড়াও বাড়তি অনেক কিছু রয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে, সকলের জন্যে এতে রয়েছে দিক-নির্দেশনা। পবিত্র কোরআনের ভাষা সরল এবং প্রাঞ্জল। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-ধারা অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং আকর্ষণীয়, বিবেকবান মানুষ মাত্রেরই মন আকৃষ্ট হয় পবিত্র কোরআনের প্রতি।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, বাংলা ভাষী মানুষ আরবী ভাষায় পারদর্শী না হওয়ার কারণে পবিত্র কোরআনের অমৃত ভান্ডার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এ মহান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ শুরু হয়েছে প্রায় আশি বছর পূর্ব থেকে মাত্র। কিন্তু পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্যে শুধু অনুবাদ যথেষ্ট নয়, চাই এর জন্যে একটি বিস্তারিত, মৌলিক তফসীর গ্রন্থ, যা হবে সুবিন্যস্ত, বিস্তারিত এবং প্রামাণ্য।

মূলতঃ এ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পরই, এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা করে তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা শুরু হয়।

কোন্ ভাষায় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে শোকর আদায় করবো যে, তিনি আজ তফসীরে নূরুল কোরআনের সপ্তদশ খন্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ পেশ করার তৌফিক দিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের, তাই তাঁর মহান দরবারে পেশ করি এই শুভ মুহূর্তে বারে বারে সেজদায়ে শোকরানা।

হে আল্লাহ্! কবুল কর তফসীরে নূরুল কোরআনকে এবং এ মহান গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। এর মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের আলো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার তৌফিক দান কর। হে আল্লাহ্! এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, তা শুধু তোমার দানেই হয়েছে, আর যা কিছু রয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ তোমার দানেই হবে। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার দানের ভিখারী, আমরা তোমার পেয়ারা হাবীব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত, তাঁর উসিলায় আমাদের এই সাধনা কবুল কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমরা তোমার রহমত এবং মাগফেরাতের প্রার্থী, হে আল্লাহ্! যারা এ মহান গ্রন্থ পাঠ করছেন এবং যারা এ ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন বা কোন প্রকার সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও এর বরকতে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্য দান কর। আল্লাহুম্মা আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত–

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

২৫-৭-৯৩ ইং

وصلي الله تعالي علي خير خلقه محمد وعلي اله واصحابه اجمعين.

সূচিপত্র

বিষয় :	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৩
সূরা আম্বিয়া	১১
সূরা আম্বিয়া প্রসঙ্গে	১২
এ সূরার ফজিলত	১২
এ সূরার আমল	১২
স্বপ্নের তা'বীর	১৩
তফসীরুল কোরআন	১৩
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	১৩
অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী	১৩
শানে নুযুল	১৭
তফসীরুল কোরআন	১৯
শানে নুযুল	১৯
নবী শুধু মানুষই হন	২০
আল্লাহ পাকের বিরাট অনুগ্রহ	২০
পানাহার না করা বুযুর্গী নয়	২১
পবিত্র কোরআনে রয়েছে উপদেশ-সার্বিক কল্যাণ	২২
জালেমদের ধ্বংস অনিবার্য	২৪
তফসীরুল কোরআন	২৬
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২৬
শানে নুযুল	২৭
তফসীরুল কোরআন	৩৩
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৩৩
তফসীরুল কোরআন	৩৮
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৩৮
শানে নুযুল	৩৯
আল্লাহ পাকের প্রতি ভক্তি-মিশ্রিত ভয় থাকতে হবে	৪০
আয়াতের মর্মকথা	৪২
তফসীরুল কোরআন	৪৩
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৪৩
আসমান যমীন সৃষ্টির ধারা	৪৫
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	৪৬
শানে নুযুল	৪৮
তফসীরুল কোরআন	৫১
শানে নুযুল	৫১
দোযখ থেকে আত্মরক্ষা কর	৫৪
প্রিয়নবী (সাঃ)-এর জন্যে সান্ত্বনা	৫৫
তফসীরুল কোরআন	৫৬

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....৫৬
মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য.....৫৭
তফসীরুল কোরআন.....৬০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....৬০
আয়াতের মর্মকথা.....৬০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....৬৫
পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য.....৬৬
তফসীরুল কোরআন.....৬৭
তফসীরুল কোরআন.....৭১
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....৭১
বিস্ময়কর ঘটনা.....৭৪
তর্ক শাস্ত্রের কৌশল.....৭৫
তফসীরুল কোরআন.....৭৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....৭৭
ইব্রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার প্রস্তাব কে দিয়েছিল?.....৭৯
বিরাট অগ্নিকুন্ড তৈরী করা হলো.....৭৯
গিরগিটিকে হত্যা কর.....৮০
সারা পৃথিবীতে আগুন তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে.....৮১
অগ্নিতে কতদিন ছিলেন?.....৮২
নমরুদ ধ্বংস হলো.....৮৩
হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর হিজরত.....৮৬
তফসীরুল কোরআন.....৯০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....৯০
তাঁরা ছিলেন জাতির নেতা.....৯০
হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি যে নির্যাতন হয়েছিল.....৯৩
তফসীরুল কোরআন.....৯৫
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....৯৫
একটি ঘটনা.....৯৬
হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর বিচার.....৯৮
পাহাড় এবং পাখীরাও আল্লাহর জিকর করতো.....৯৯
হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর আকাশ ভ্রমণ.....১০২
তফসীরুল কোরআন.....১০৪
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....১০৪
হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর বংশ পরিচয়.....১০৫
হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর ঘটনা.....১০৫
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব.....১১৭
মৃত সন্তানদেরকে কি জীবিত করা হয়েছে?.....১১৭
জুলকিফল প্রসঙ্গে.....১১৯
সবরের আদর্শ.....১২০
তফসীরুল কোরআন.....১২৩

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা ১২৩
মাছের পেটে কতদিন ছিলেন ১২৬
এ দোয়ার ফজিলত ১২৭
তফসীরুল কোরআন ১৩০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৩০
তৌহীদের আহ্বান যুগে যুগে ১৩১
নেক আমলের শুভ পরিণতি ১৩২
ঈমান পূর্বশর্ত ১৩২
কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী ১৩৩
আয়াতের মর্মকথা ১৩৪
কেয়ামতের আলামত ১৩৫
তফসীরুল কোরআন ১৩৭
জান্নাতবাসীর জন্য সু-সংবাদ ১৪০
চিরকাল মনের সুখে অতিবাহিত করবে ১৪০
তফসীরুল কোরআন ১৪২
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৪২
ভয়াবহ বিপদ কখন হবে ১৪২
আয়াতের মর্মকথা ১৪৩
নেককার লোকদের উদ্দেশ্যে সুসংবাদ ১৪৫
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৪৫
একটি প্রশ্ন ১৪৭
জবাব ১৪৭
মুসলমানদের অবনতি কেন? ১৪৮
রহমতুল্লিল আলামীন ১৫০
তফসীরুল কোরআন ১৫২
সূরা হজ্জ ১৫৬
সূরা হজ্জ প্রসঙ্গে ১৫৬
সূরা হজ্জের ফযিলত ১৫৬
তফসীরুল কোরআন ১৫৮
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ১৫৮
আয়াতের তাৎপর্য ১৫৯
শানে নুযুল ১৬২
আয়াতের মর্মকথা ১৬৩
তফসীরুল কোরআন ১৬৫
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৬৫
মানব সৃষ্টির ইতিকথা ১৬৫
পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের বরকত ১৬৮
তফসীরুল কোরআন ১৭১
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৭১
কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী ১৭১

কেয়ামত কায়েম হওয়ার যৌক্তিকতা ১৭২
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৭৪
শানে নুযুল ১৭৪
তফসীরুল কোরআন ১৭৬
আয়াতের মর্মকথা ১৭৮
তফসীরুল কোরআন ১৮০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৮০
তফসীরুল কোরআন ১৮৬
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৮৬
শানে নুযুল ১৮৬
হক্ব ও বাতিলের সংঘর্ষ যুগে যুগে ১৮৮
কাফেরদের শাস্তি ১৮৯
মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ ১৯১
তফসীরুল কোরআন ১৯৪
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৯৪
আয়াতের মর্মকথা ২০১
তফসীরুল কোরআন ২০৩
হজ্জের আহ্বান ২০৩
সর্বপ্রথম যারা হজ্জের আহ্বানে সাড়া দেয় ২০৪
হজ্জের উপকারিতা ২০৪
নিদৃষ্ট দিনগুলো ২০৫
মাসআলা ২০৬
মাসআলা ২০৬
মাসআলা ২০৭
হাদীসের আলোকে মানত ২০৮
মাসআলা ২০৯
কা'বা শরীফ চির সংরক্ষিত ২১০
তফসীরুল কোরআন ২১৪
আয়াতের মর্মকথা ২১৭
কোরবানীর ফজিলত ও বিধান ২১৮
হাদীসের ব্যাখ্যা ২১৯
কোরবানীর গুরুত্ব ২১৯
কার উপর কোরবানী ওয়াজিব ২২০
কোরবানীর জন্তু ২২০
মাসআলা ২২০
মাসআলা ২২১
মাসআলা ২২১
কেমন জন্তু কোরবানী করতে হবে ২২১
মাসআলা ২২১
কোরবানীর গোশ্‌ত এবং চামড়া ২২২

তফসীরুল কোরআন.....২২৪
শানে নুযুল.....২২৭
কোরবানীর উদ্দেশ্য.....২২৭
তফসীরুল কোরআন.....২৩০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....২৩০
মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা.....২৩১
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....২৩১
কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি.....২৩২
শানে নুযুল.....২৩৪
আয়াতের মর্মকথা.....২৩৫
মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ.....২৩৬
শান্তির জন্যেই জেহাদ.....২৩৭
তফসীরুল কোরআন.....২৪১
ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা.....২৪২
প্রিয়নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা.....২৪৪
তফসীরুল কোরআন.....২৪৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....২৪৭
শানে নুযূল.....২৪৭
একদিন হাজার বছরের সমান.....২৪৮
তোমাদেরকে সাবধান করাই আমার কাজ.....২৫০
কল্পনাতীত নেয়ামত.....২৫০
তফসীরুল কোরআন.....২৫৩
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....২৫৩
আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা.....২৫৪
নবী রসূলগণের সংখ্যা.....২৫৫
তফসীরুল কোরআন.....২৫৯
একটি প্রশ্ন.....২৬০
আখেরাতে নাজাত শুধু আল্লাহ পাকের দানেই হবে.....২৬০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....২৬৩
তফসীরুল কোরআন.....২৬৬
তফসীরুল কোরআন.....২৬৯
স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর.....২৭০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....২৭১
শানে নুযুল.....২৭২
প্রিয়নবী (সাঃ)-এর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ.....২৭৩
তফসীরুল কোরআন.....২৭৪
তফসীরুল কোরআন.....২৭৭
তফসীরুল কোরআন.....২৮১
মুসলিম জাতির উচ্চ মর্যাদা.....২৮৫
দ্বীন ইসলামকে সহজ করেছেন.....২৮৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

তফসীরে নূরুল কোরআন

সপ্তদশ খন্ড | সপ্তদশ পারা

সূরা আম্বিয়া

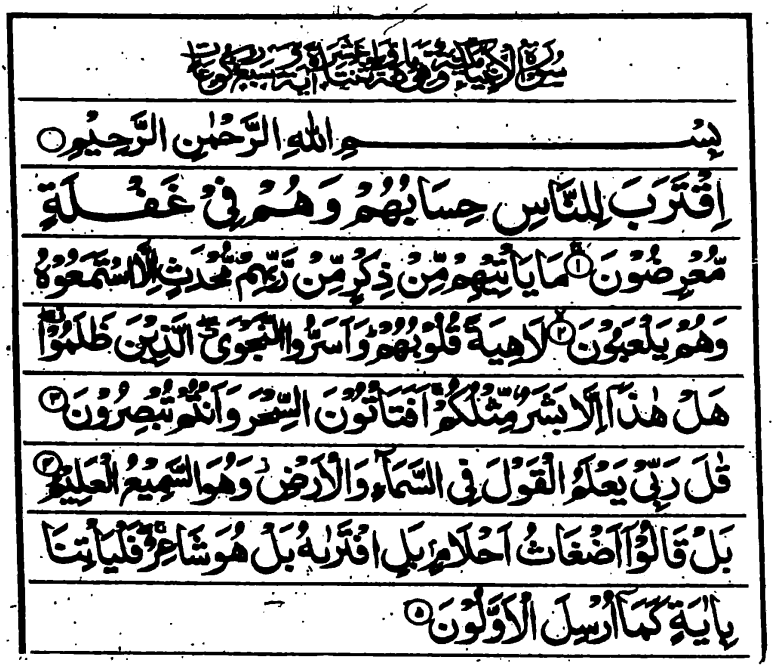

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَاثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً وَسَبْعُ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ

مُّعْرِضُوْنَ ۝١ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ

وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝٢ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۗ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۗ

هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝٣

قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۡ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٤

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۢ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَأْتِنَا

بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝٥

তরজমা

(১) মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় সমাগত, কিন্তু তারা বে-খবর, গাফলতের কারণে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

(২) যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে কোন নতুন নসিহত আসে তখন তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে।

(৩) তাদের মন থাকে সম্পূর্ণ অমনযোগী হয়ে, জালেমরা গোপনে পরামর্শ করে, "এই লোকটি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষই," অতএব তোমরা দেখে শুনে কেন তার যাদুর কবলে পড়বে?

(৪) তিনি বললেন, আসমান যমীনের সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক জানেন। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(৫) বরং তারা একথাও বলে, এসব অলীক কল্পনা হয় সে নিজেই উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব, সে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক, যেমন পূর্ববর্তীগণ নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন।

সূরা আম্বিয়া প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ, এর আয়াত সংখ্যা ১১২, রুকু-৭।

এ সূরায় ১৭ জন আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ রয়েছে। এতে বিবরণ রয়েছে তাঁদের তবলীগের, কিভাবে তাঁরা মানুষকে তৌহীদের প্রতি আহ্বান করেছেন, আর কিভাবে কাফেররা তাঁদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম কিভাবে তাদের নির্যাতন-উৎপীড়নে সবর করেছেন, আল্লাহ পাক অবশেষে তাঁদেরকে সফলকাম করেছেন, তাঁদের শত্রুদের পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। এ সূরায় তৌহীদ ও রেসালতের অনেক অকাট্য দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, পাশাপাশি কেয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এসবই হলো দ্বীন ইসলামের মৌলিক উপাদান, যার উপর বিশ্বাস করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। এ সূরার সমস্ত আয়াত মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরাতুল আম্বিয়া মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা আম্বিয়া মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে।[১]

এ সূরার ফজিলত

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার হিসাব সহজ করে দেবেন।

এ সূরার আমল

যার নিদ্রা হয়না, যে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে; কোন রোগ, চিন্তা বা ভয়ের কারণে এ অবস্থা হয়, হরিণের চামড়ার উপর সূরাতুল আম্বিয়া লিপিবদ্ধ করে যদি তার কোমরে বেঁধে দেয়া হয়, তবে সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হবে।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬০৭

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে সূরা আম্বিয়া পাঠ করছে তবে সে অনেক অর্থ-সম্পদ লাভ করবে এবং আল্লাহ পাক তাকে নেক আমলের তৌফিক দান করবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

যারা আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয় এবং আখেরাতের ব্যাপারে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এরপর কাফেরদেরকে প্রদত্ত ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা, দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ বা ঐশ্বর্য আখেরাতের স্মরণ থেকে গাফলতের কারণ হয়, এ কারণেই এ সূরার শুরুতে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে করে যারা গাফলতের মধ্যে নিপতিত রয়েছে তারা গাফলত পরিহার করে আখেরাতের চিন্তা করে, চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের হেদায়েতের উপর আমল করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করে।

অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

এতদ্ব্যতীত, এ আয়াত সমূহে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ

মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ তারা রয়েছে গাফেল, উদাসীন এবং আখেরাতের ব্যাপারে বিমুখ।

কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আবির্ভাব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

بعثت انا والساعة كهاتين

"আমি এবং কেয়ামত প্রেরিত হয়েছি এভাবে", একথা বলে তিনি শাহাদাতের আঙ্গুল এবং তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলকে দেখিয়েছেন।

অর্থাৎ এ দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে যতখানি তফাৎ রয়েছে, আমার এবং কেয়ামতের মধ্যে ততখানি তফাৎ রয়েছে। অথচ এতদসত্ত্বেও মানুষ গাফলতের মধ্যে রয়েছে, কেয়ামতের কঠিন দিনের জন্যে তারা কোন প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেনা। দুনিয়াতে মানুষের জীবন ও মৃত্যু অব্যাহত রয়েছে সর্বত্র, কারো আগমন ঘটছে এ পৃথিবীতে, আর কেউ এ পৃথিবী থেকে গমন করছে। এভাবে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসান ঘটছে অহরহ। কিন্তু তবু মানুষ তার ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যদিও এ আয়াত কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, বিশেষতঃ যারা শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করতো এবং হিসাব-নিকাশকে অবিশ্বাস করতো, কিন্তু বর্তমান যুগে অনেক লোক মুসলমান হওয়া সত্বেও আখেরাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল বা উদাসীন রয়েছে, তাই তাদের উদ্দেশ্য রয়েছে এ আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী।

এরশাদ হয়েছেঃ

اِقْتَرَبَ

অর্থাৎ মানুষের জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের সময় সমাগত।

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এত বড় বিপদ নিকটবর্তী হওয়া সত্বেও সে লোভ-লালসায়, ভোগ-বিলাসে মত্ত; দুনিয়ার আরাম-আয়েশে মুগ্ধ, খেলা-ধূলায় লিপ্ত, অথচ তাদের ভয়াবহ পরিণাম আসন্ন, সেদিকে তাদের মোটেই ভ্রুক্ষেপ নেই, যেন তারা এ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হয়ে এসেছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে الناس শব্দটি দ্বারা কাফের মুশরেকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এ আয়াতে দু'টি অভিযোগ আনা হয়েছেঃ

وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ

(১) তারা আখেরাতের হিসাব-নিকাশ বা অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফলতের অবস্থায় রয়েছে।

مُّعْرِضُوْنَ

(২) তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য লাভের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণে বিমুখ রয়েছে।[১]

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন পরিণামদর্শী ব্যক্তি আখেরাতের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনা, বরং আখেরাতের জীবনের সাফল্যের জন্যে সর্বদা সতর্ক, সাবধান এবং সক্রিয় থাকা পরিণামদর্শী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের উপদেশের জন্যে একের পর এক আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু তারা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যত নসিহতই আসুক না কেন তারা কিন্তু খেলা-ধূলায়ই লিপ্ত রয়েছে। তারা ঘুমের ঘোরে এমনভাবে মত্ত রয়েছে যেন কখনও তাদের মৃত্যু আসবেনা। তারা আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বিদ্রুপ করছে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৪০

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ

পাপীষ্ঠরা খেলা-ধূলায় মত্ত, পবিত্র কোরআনে মহান শিক্ষার প্রতি এ কাফেরদের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই, তারা এর প্রতি খেলাচ্ছলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছে। দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাসে, ভোগ-বিলাসে এ কাফেররা এমনভাবে মত্ত মুগ্ধ যে, আখেরাতের কথা চিন্তা করার মত অবস্থাতেও তারা নেই। কোরআনে করীমের মহান শিক্ষা গ্রহণ করার এবং ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। তফসীরকার আবু বকর ওয়াররাক আলোচ্য বাক্যের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[১]

وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

(জালেমরা গোপনে পরামর্শ করে) কানে কানে কথা বলাকে আরবী ভাষায় نجوى বলা হয়। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অতি সঙ্গোপনে অসৎ পরামর্শ করতো, এ পর্যায়ে اسروا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার দ্বারা গোপনীয়তার আধিক্য বোঝানো হয়েছে।

অথবা এর অর্থ হলো, যে স্থানে বসে তারা এ গোপন পরামর্শ করতো তাও গোপন রাখা হতো, যেন তাদের পরামর্শ সম্পর্কে কেউ কোন খবর না পায়।

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

যারা জুলুম করতো, যারা সীমালঙ্ঘন করতো।

আলোচ্য আয়াতে ظلموا শব্দ দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

"এই লোকটি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষই"।

কাফেররা পবিত্র কোরআনকে সত্য মানতো না, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করতো। তারা গোপন বৈঠকে একত্রিত হতো এবং বলতো, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরই ন্যায় মানুষ, তিনি ফেরেশতা নন, আমাদের তুলনায় তাঁর এমন কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, আমরা তাঁকে মেনে চলবো?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে আল্লাহর রসূল হওয়ার জন্যে ফেরেশতা হওয়া জরুরী, যিনি আমাদের ন্যায় মানুষ, তিনি রসূল হতে পারেন না। প্রকৃত অবস্থা এই যে, যাদের নিকট রসূল প্রেরিত হন, রসূলকে তাদেরই ন্যায় হওয়া জরুরী, যাতে করে তারা রসূলের অনুসরণ করতে পারে এবং তাঁর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। ফেরেশতা যদি রসূল হন, তবে মানুষ তার দ্বারা কিভাবে উপকৃত হবে এবং ফেরেশতাই যে রসূল তার পরিচয় কিভাবে পেতে পারে, এমন অবস্থায় ফেরেশতাকে মানবাকৃতি ধারণ করতে হবে। কিন্তু যখন মানবাকৃতি ধারণ করবে তখন কিভাবে জানা যাবে যে ইনি ফেরেশতা?[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৪৯

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫০

কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা দেখে হতবাক হলো, তবে ঈমান আনল না, তাই তারা বলল,

اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ

"অতএব, তোমরা দেখে শুনে কেন তার যাদুর কবলে পড়বে"?

অর্থাৎ এই লোকটি যদিও আমাদেরই ন্যায় মানুষ, কিন্তু সে যাদু জানে আর কোরআনের নামে সেই যাদুমন্ত্রই আমাদেরকে শোনায়। অতএব, আমরা কেন তার যাদুতে জড়াতে যাবো? যা তোমরা স্বচক্ষে দেখছো, সে যা পেশ করছে তা যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযাকে যাদু বলার পক্ষে তাদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ ছিল না; বরং পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করার লক্ষ্যেই তারা এসব কথা বলতো।

প্রথম প্রথম আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাদের গোপন পরামর্শ সম্পর্কে অবগত করতেন, পরে তাদেরকে জবাব দেয়ার জন্যে নির্দেশ করলেন। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের হুকুমে তাদের জবাব দিলেন, যা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"তিনি বললেন, আসমান যমীনের সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক জানেন, আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।

অতএব, তোমাদের কোন গোপন কথাই তাঁর নিকট গোপন নেই, তোমরা যা কিছু গোপনে ইসলামের বিরুদ্ধে পরামর্শ কর, আল্লাহ পাক সবই আমাকে জানিয়ে দেন, কেননা তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। আসমান যমীনের সব কিছুই তাঁর নিকট সুস্পষ্ট। পৃথিবীতে বা আসমানে যে যা বলে তিনি সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, অতএব তোমাদের গোপন বৈঠকের কথা আল্লাহ পাকের নিকট কি করে গোপন থাকতে পারে!

কাফেররা পবিত্র কোরআনকে শুধু যাদুমন্ত্র বলেই নিরস্ত হয়নি; বরং তারা বলেছে এটি হলো (হযরত) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর দেখা এলোমেলো স্বপ্নের সমষ্টি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰىهُ

"বরং তারা একথাও বলে, এসব অলীক কল্পনা হয়তো সে নিজেই উদ্ভাবন করেছে"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, পবিত্র কোরআনের অলৌকিক প্রভাবে মক্কার কাফেররা এত হতবাক হয়েছিল এবং এত বেশী বিব্রত বোধ করছিল যে, পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিল না। তাই কখনও পবিত্র কোরআনকে তারা যাদু বলতো, আর কখনও এলোমেলো স্বপ্ন বলে বেড়াত। এরপর বলেছে, بَلِ افْتَرٰىهُ না, এই কালাম এলোমেলো স্বপ্ন নয়, বরং এই ব্যক্তি এ কথাগুলোকে নিজেই রচনা করেছেন এবং আল্লাহ্‌র কালাম বলে প্রচার করছেন। بَلْ هُوَ شَاعِرٌ বরং সে একজন কবি, আর কবি হিসেবেই তিনি এই কালাম রচনা করেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন মুশরেক কোরআনে করীমকে এলামেলো স্বপ্ন বলেছে। আর কেউ কেউ বলেছে, এগুলো হলো তাঁর মনগড়া রচনা। আর কোন কোন কাফের বলেছে ইনি হলেন একজন কবি, আর কোরআন হলো তাঁর কাব্য।

পূর্ববর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে, কাফেররা পবিত্র কোরআনকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মনগড়া রচনা বলেছিল। আর এ আয়াতে বলেছে, এটি হলো তাঁর কাব্য রচনা, তিনি হলেন কবি। এ দু'টি কথার মধ্যে পার্থক্য এই, মন-গড়া কথার উদ্দেশ্য হলো মিথ্যা কথা বলে তাকে সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা। আর কাব্য হলো এমন কথা-মালার সমষ্টি যা শ্রবণকারী বা পাঠকের অন্তরে ভয় বা আনন্দ-উৎসাহ বা ভক্তি সৃষ্টি করে। কাব্য রচনার উদ্দেশ্য হলো পাঠক বা শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত করা।[১]

فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ

"অতএব, সে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক, যেমন পূর্ববর্তীগণ নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন"।

যেহেতু কাফেররা পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিস্মিত ছিল, কিন্তু তাদের কোরআন বিরোধিতার কারণে তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিল না। তাই কখনও একথা বলতো, যখন এ কোরআন স্বপ্ন নয়; যাদুও নয়, কাব্যও নয়, আর তিনি বলেন যে তিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রসূল হয়ে এসেছেন, অতএব তাঁর কর্তব্য হলো রসূল হিসাবে কোন নিদর্শন উপস্থাপন করা, যেমন ইতিপূর্বেও রসূলগণ বিভিন্ন নিদর্শন নিয়ে এসেছেন। হযরত সালেহ (আ.) উষ্ট্রীর নিদর্শন এনেছেন, হযরত মূসা (আঃ) লাঠির মোজেযা প্রদর্শন করেছেন এবং হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ পাকের হুকুমে মৃতকে জীবিত করতেন, জন্মান্ধকে চক্ষুস্মান করতেন এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে তুলতেন।

অতএব, যদি আপনিও এমন কোন বিস্ময়কর নিদর্শন স্থাপন করেন তবে আমরা আপনাকে রসূল হিসাবে মেনে নেব এবং আপনার প্রতি ঈমান আনব।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আরবের মুশরেকদের এ আবদার আর এ ফরমায়েশ ঈমান আনার জন্যে ছিল না; বরং তা ছিল হিংসা-প্রসূত এবং কলহ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার নিমিত্তে, কেননা যদি কোন নিদর্শন দেখলেই তারা ঈমান আনতো, তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অসংখ্য মোজেযা দেয়া হয়েছিল যা তাদের ঈমান আনয়নের জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ঐ মোজেযা সমূহ দেখার পরও তারা ঈমান আনেনি।[২]

শানে নুযুল

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলোচ্য আয়াত اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ এর শানে নুযুল সম্পর্কে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আমের এবনে রাবীয়া (রাঃ)-এর গৃহে একবার একজন মেহমান আসলেন, তিনি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান এবং মর্যাদা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫১

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫২
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬১০-১১

দিলেন এবং মেহমানদারীর হক্ব আদায় করলেন, এমনকি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তাঁর ব্যাপারে সুপারিশ করলেন। কিছুদিন পর ঐ মোমেন তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে অমুক এলাকার বিরাট জমি দান করেছেন, আমি চাই ঐ জমির কিছু অংশ আপনার নামে দিয়ে দেই, যেন আপনার জীবনেও স্বচ্ছলতা আসে এবং আপনার সন্তান-সন্ততিরাও ঐ সম্পত্তি দ্বারা উপকৃত হয়।

হযরত আমের (রাঃ) জবাব দিলেন, ভাই! আমার এর কোন প্রয়োজন নেই, আজকে একখানি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মর্ম হলো এ ক্ষণস্থায়ী জগত বড় অপ্রিয়, এরপর তিনি এ আয়াত اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ তেলাওয়াত করলেন।

অর্থাৎ মানুষের হিসাবের সময় ঘণিয়ে এসেছে, অথচ তারা গাফলতের সাগরে নিমজ্জিত রয়েছে। তাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে উপদেশই আসুক না কেন, তারা সেদিকে কর্ণপাতই করেনা। তারা থাকে খেলাধূলায় মশগুল; আরাম-আয়েশে, ভোগ-বিলাসে মত্ত, তাদের অন্তর আল্লাহ পাকের কালামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, তারা শুধু যে পথভ্রষ্ট তাই নয়; বরং তারা অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এজন্যে তারা গোপনে পরামর্শ করে এবং বলে, এ ব্যক্তি তো আমাদেরই ন্যায় মানুষ, তবে হ্যাঁ সে যাদু জানে, আর যাদু দ্বারাই আমাদেরকে আকৃষ্ট করতে চায়। আল্লাহ পাক তাদের কথার জবাবে এরশাদ করেছেন, আসমান-যমীনে, আকাশ-পাতালে যখনই যেখানে যা কিছু হয় সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। অতএব, তাঁর নিকট কোন কিছু গোপন নেই। তোমাদের এসব গোপন পরামর্শের এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি শত্রুতা পোষণের, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতার পরিণাম ভয়াবহ, এর শাস্তি অবধারিত।[১]

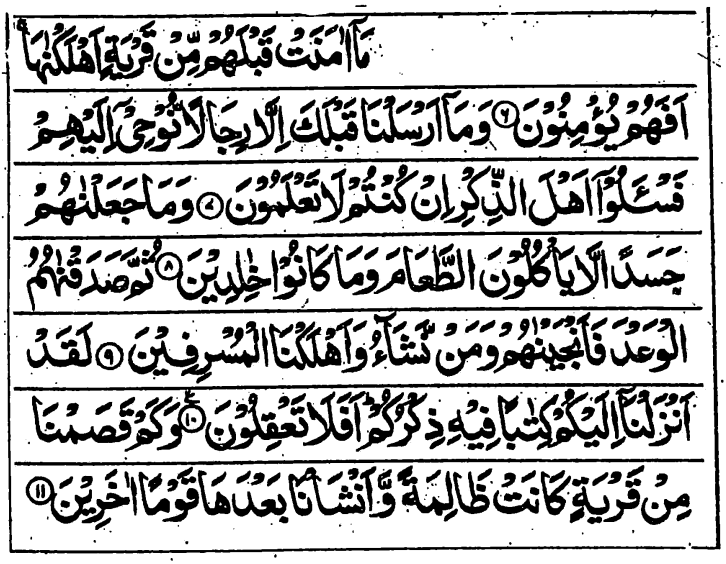
مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا
اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ
فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٧ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ
جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝٨ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ
الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝٩ لَقَدْ
اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٠ وَكَمْ قَصَمْنَا
مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝١١

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-২

তরজমা

(৬) তাদের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, তার অধিবাসীরা ঈমান আনেনি; তবে কি তারা ঈমান আনবে?

(৭) (হে রসূল!) আপনার পূর্বে ওহী সহ আমি মানুষই প্রেরণ করেছিলাম অতএব, তোমরা যদি তা না জান তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।

(৮) আর আমি নবীগণকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে তারা আহার্য গ্রহণ করতো না, আর তারা চিরস্থায়ীও ছিলনা।

(৯) এরপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, ফলে তাদেরকে এবং আমার যাকে ইচ্ছা তাকে রক্ষা করি, আর সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে ধ্বংস করি।

(১০) আমি তাদের নিকট এমন কিতাব নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে উপদেশ, তবু কি তোমরা বুঝতে পারনা?

(১১) আর আমি এমন কত জনপদই ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা ছিল সীমা লঙ্ঘনকারী, পাপীষ্ঠ এবং তাদের পরে আমি সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا.

এবনে জরীর কাতাদার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বলেছিল, যদি আপনি নবুওয়্যতের দাবীতে সত্য হন, তবে সাফা নামক পাহাড়টিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করুন। কাফেরদের এ উক্তির পর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং আল্লাহ পাকের এ বাণী পৌঁছে দেন, "(হে রসূল!) যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আপনার জাতি যা চায়, তা করে দেয়া হবে," অর্থাৎ অনতিবিলম্বে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা হবে, কিন্তু এরপরও যদি তারা ঈমান না আনে, তবে তাদের সকলকে ধ্বংস করা হবে, কোন প্রকার অবকাশ দেয়া হবেনা। আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে আপনার জাতিকে আরো অবকাশ দেয়া হোক এবং তাদেরকে আরো চিন্তা করার সুযোগ দেয়া হোক, তবে তা-ও দেয়া যেতে পারে। এর জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি আমার জাতির জন্যে আরো অবকাশ প্রদানের আরজী পেশ করি। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

মক্কার কাফেররা নবুওয়্যতের সত্যতার নিদর্শন হিসেবে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার যে দাবী করেছিল, তার জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ

মক্কার কাফেরদের পূর্বেও অনেক জনপদবাসী তাদের নিকট প্রেরিত নবীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ মোজেযা চেয়েছিল, যখন মোজেযা এসেছিল তখন তারা সত্য গ্রহণে

অস্বীকৃতি জানিয়েছিলে, পরিণামে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে এ কাফেররাও ঈমান আনবেনা। যেহেতু মক্কাবাসীকে ধ্বংস করা আল্লাহ পাকের মর্জি নয়, আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ মর্মে আরজী পেশ করেছেন, তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে আরো কিছু দিন অবকাশ দিয়েছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ মক্কার কাফেরদের ফরমায়েশী মোজেযা প্রদর্শন না করার মধ্যে রয়েছে তাদেরই জন্যে বিরাট কল্যাণ। যদি তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা হতো এবং এরপরও তারা ঈমান না আনত, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ধ্বংস করা হতো।

নবী শুধু মানুষই হন

যেহেতু কাফেররা বলতো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের ন্যায় মানুষই; তারই জবাবে আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ

"(হে রসূল!) আপনার পূর্বে ওহী সহ আমি মানুষই প্রেরণ করেছিলাম, অতএব তোমরা যদি তা না জান তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর"।

যেহেতু কাফেররা বলতো, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষ, তিনি কিভাবে আল্লাহ পাকের রসূল হবেন? তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ ইতিপূর্বে যত রসূল এসেছেন সকলেই মানুষ ছিল এবং মানুষের মধ্যে পুরুষ ছিল। কখনও কোন ফেরেশতাকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়নি, এমনিভাবে কখনও কোন নারীকে নবী বানানো হয়নি, অতএব মানুষ হওয়া নবী হওয়ার জন্যে অসুবিধাজনক কিছু নয়। নবী মানুষই হন এবং পুরুষ হন। যদি মুসলমানদের কথায় তোমরা আস্থা স্থাপন না করতে পার, তবে ইহুদী নাসারাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, যারা তৌরাত ও ইঞ্জিলের আলেম, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। কেননা, মক্কার পৌত্তলিকরা তৌরাত ও ইঞ্জিলের আলেমদের প্রতি আস্থা রাখত, তাদেরকেই জিজ্ঞাসা কর যে ইতিপূর্বে নবী রসূলগণ মানুষের মধ্য থেকে হতেন, না ফেরেশতা। তারা এ সম্পর্কে তোমাদেরকে সঠিক তথ্য প্রদান করবে।

আল্লাহ পাকের বিরাট অনুগ্রহ

বস্তুতঃ এটি মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের একটি বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে মানুষকে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেন, যাঁর কাছে মানুষ বসতে পারে, শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং তাঁর অনুসারী হতে পারে। যদি মানুষ না হয়ে ফেরেশতাদের মধ্য থেকে নবী মনোনীত হতেন, তবে তাদের থেকে হেদায়েত লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ

"আর আমি নবীগণকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য গ্রহণ করতো না"।

কাফেরদের অন্য একটি সন্দেহের জবাব রয়েছে এ আয়াতে। তারা বলতো, "এই রসূল খাবার কেন গ্রহণ করেন"? তাদের এ উক্তির জবাবেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ আমার প্রেরিত রসূলগণ রক্ত-মাংষের মানুষই ছিলেন, মানব সুলভ যাবতীয় গুণের অধিকারী ছিলেন তাঁরা। ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত ছিলেন না তাঁরা।

আলোচ্য আয়াতের جسد শব্দটির অর্থ দেহ, এর আভিধাণিক অর্থ হলো কোন বস্তুর একত্রিত হওয়া, কেননা অনেকগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত হওয়ার মাধ্যমেই দেহ অস্তিত্ব লাভ করে, নবীগণ ফেরেশতা নন যে পানাহার করবেন না।

وَمَا كَانُوا خٰلِدِيْنَ

"আর তারা চিরস্থায়ী হবে না"।

কেননা তাঁরা খোদা নন, যাঁর মৃত্যু নেই। তাঁরা আল্লাহ পাকের বন্দা, তাঁরা মানুষ। তাই মানুষের স্বাভাবিক জীবনের সকল বৈশিষ্ট্যই তাঁদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে। হ্যাঁ, তাঁরা আল্লাহ পাকের নবী ও রসূল। তাঁদের কাজ হলো আল্লাহ পাকের মহান বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়া। অতএব, যদি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয়, তবুও তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালতের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থিত হতে পারেনা। ইতিপূর্বে নবী রসূলগণের এ অবস্থাই ছিল, তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে পৃথিবীতে এসেছিলেন, এরপর মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁরা বিদায় গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ যেভাবে পূর্বকালের কাফেররা তাদের নিকট প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, ঠিক তেমনি এ যুগের কাফেররাও (হে রসূল!) আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে। অতএব মনক্ষুণ্ন হওয়ার কিছুই নেই।

পানাহার না করা বুযুর্গী নয়

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এতে প্রমাণিত হয় যে, খাবার গ্রহণ না করা বুজুর্গীর আলামত নয় এবং আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল হওয়ার নিদর্শনও নয়, যা সাধারণতঃ মানুষ মনে করে।[১]

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ

"এরপর আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা সত্য করে দেখিয়েছি"।

অর্থাৎ আমি নবী রসূলগণকে যে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা সত্য করে দেখিয়েছি, তাদেরকে সাহায্য করেছি। যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের বিরুদ্ধে এবং আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বদরের যুদ্ধ সহ সকল রণাঙ্গণে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কেরামকে তাঁদের বিজয় এবং সাফল্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত করেছেন, যুগে যুগে তাঁদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করেছেন। এটিই পৃথিবীর ইতিহাস, শুধু তাই নয়;

১। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৬৩৬

পৃথিবীতে যখনই যেখানে আল্লাহর নবীর প্রকৃত অনুসারীদের বিরুদ্ধে যে কেউ সংঘর্ষে লিপ্ত হবে তারা ধ্বংস হবে। এ যুগে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণার সত্যতার একটি নতুন দৃষ্টান্ত।

فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ

"আর আমি নবীগণকে রক্ষা করেছি এবং যাদেরকে আমি চাই তাদেরকেও"।

অর্থাৎ নবী রসূলগণের অনুসরণকারীদের আল্লাহ পাক রক্ষা করেছেন তাঁর আযাব থেকে এবং কাফেরদের নির্যাতন থেকে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ কারণেই আল্লাহ পাক আরব জাহানকে ব্যাপক ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন। যদিও তখন কেউ কেউ ঈমান আনেনি, কিন্তু তাদের বংশধরদের মধ্যে ঈমান আনয়নের সম্ভাবনা ছিল, যা আল্লাহ পাক জানতেন।

وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ

"কুফর ও নাফরমানীতে যারা সীমা লঙ্ঘনকারী তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি"।

যারা প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করেছে, পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন-উৎপীড়ন করেছে ইসলামের প্রথম জেহাদ বদরের রণাঙ্গনে আল্লাহ পাক সেই দূরাত্মা কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় দান করেছেন। এভাবে সারা আরবে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। এর মাত্র বারো বছরের মধ্যে পৃথিবীর এক বিরাট অংশে ইসলাম এক বিজয়ী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। পারশ্য সাম্রাজ্য এবং রোমক সাম্রাজ্য যারা এক হাজার বছর ধরে পরস্পরের মধ্যে বিবদমান ছিল, তারা মাত্র এক যুগের মধ্যেই মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়েছে। এসবই আল্লাহ পাকের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এবং তাঁর সাহায্যের ফলশ্রুতি। আর আল্লাহ পাক সত্যকে বিজয়ী করেন এবং অসত্যের মূলোৎপাটন করেন।

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

"আমি তোমাদের নিকট এমন কিতাব নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে উপদেশ, তবু কি তোমরা বুঝতে পারনা"?

পবিত্র কোরআনে রয়েছে উপদেশ-সার্বিক কল্যাণ

এ আয়াতে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে কোরায়শদেরকে। অর্থাৎ হে কোরায়শ! এই কোরআনে তোমাদের আলোচনা রয়েছে। আর কোন কোন তফসীরকারের মতে, এর দ্বারা শুধু কোরায়শ নয়; বরং সমগ্র আরব জাহানকে সম্বোধন করা হয়েছে, কেননা তারাই পবিত্র কোরআনের প্রথম শ্রোতা ও প্রথম পাঠক।

অর্থাৎ হে আরববাসী! পবিত্র কোরআনে রয়েছে তোমাদের আলোচনা, রয়েছে তোমাদের জন্যে নসিহত এবং এর দ্বারা তোমাদের মর্যাদার উন্নতি হয়েছে। তোমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে এতে রয়েছে সতর্কবাণী, বিশেষ নসিহত। পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে

তোমাদেরকে সর্বপ্রকার উপদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে করে তোমরা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে আত্মরক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা কর। তবু কি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি করবে না? অর্থাৎ যদি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা কাজ লও, সত্যকে গ্রহণ কর তবে তা হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর এবং তোমাদের পরম সাফল্যের কারণ।

অথবা এর অর্থ হলো, পবিত্র কোরআনে রয়েছে তোমাদের জন্যে বিশেষ মর্যাদা, কেননা তা তোমাদের ভাষায়ই নাযিল করা হয়েছে।

অথবা আলোচ্য আয়াতে ذكر হল আল্লাহর জিকর এবং দ্বীনি বিষয়ের জরুরী আলোচনা।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে ذكر অর্থ হলো সুনাম, সুখ্যাতি বা উপদেশ বা সেই নৈতিক গুণাবলী যা দ্বারা তোমাদের সুনাম অর্জিত হয়।

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ذكر শব্দটির তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেনঃ আলোচনা, মর্যাদা ও উপদেশ যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াত রয়েছেঃ

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

"নিশ্চয় এটি নসিহত তোমার জন্যে ও তোমার জাতির জন্যে"।

অথবা আলোচ্য আয়াতের ذكر অর্থ উপদেশ, অর্থাৎ তোমরা যেন পবিত্র কোরআনের উপদেশ গ্রহণ কর, আল্লাহ পাকের নির্দেশিত পথে চল এবং নিষিদ্ধ কাজ সমূহ পরিত্যাগ কর, পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

"আর (হে রসূল!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ উপদেশ মোমেনদের উপকারে আসবে"।

অথবা এর অর্থ হলো ঃ পবিত্র কোরআনে রয়েছে তোমাদের দ্বীনের জরুরী বিষয়ের আলোচনা।

আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামুসে ذكر শব্দটির অর্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এভাবেঃ কোন বিষয়কে স্মরণ করা, তার আলোচনা করা, সুনাম করা, মর্যাদা দেয়া, নামায, দোয়া প্রভৃতি।

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থাৎ তোমরা কি এমন কথাও বুঝতে পারনা, যাতে রয়েছে তোমাদের সমূহ কল্যাণ? কেননা, পবিত্র কোরআন তোমাদেরই একজনের নিকট নাযিল হয়েছে এবং তোমাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং এর দ্বারা সারা পৃথিবীতে তোমাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি তোমরা আল্লাহ পাকের এ মহান নেয়ামতের অনাদর কর এবং আল্লাহ পাকের প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর বিরোধিতা কর তবে তা তোমাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়; এমন অবস্থায় তোমরা আল্লাহ পাকের আযাবের অপেক্ষা কর।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫৩-৫৪

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে সে যুগের সকল কাফেরকে, যারা পবিত্র কোরআনের সত্যতাকে অস্বীকার করতো এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বিরোধিতা করতো।[১]

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) এবনে আবি হাতেম, এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ذكر এর অর্থ "শরফ" অর্থাৎ হে আরববাসী! পবিত্র কোরআনে রয়েছে তোমাদের মর্যাদা।

আর এবনুল মুনজের ও হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতে ذكر এর অর্থ "দ্বীন"। অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে রয়েছে তোমাদের দ্বীনের কথা।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের ফজিলত ও মাহাত্ম বর্ণনা করেছেন এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণের জন্যে অনুপ্রাণিত করে এরশাদ করেছেনঃ "আমি এই কিতাব তোমাদের জন্যে নাযিল করেছি, এতে রয়েছে তোমাদের মর্যাদা, তোমাদের দ্বীন, তোমাদের শরীয়ত এবং তোমাদের কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য! এতদসত্ত্বেও তোমরা এ নেয়ামতের অনাদর করছো এবং এ মহান নেয়ামত সম্পর্কে উদাসীন রয়েছ"![৩]

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ .

"আর আমি এমন কত জনপদই ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা ছিল সীমা লঙ্ঘনকারী, পাপীষ্ঠ এবং তাদের পরে আমি সৃষ্টি করেছি অপর জাতি"।

জালেমদের ধ্বংস অনিবার্য

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, হে মক্কাবাসী বা আরববাসী! তোমাদের নিকট আমি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি, তাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে উপদেশ, তাতে রয়েছে তোমাদের দ্বীন দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ। কিন্তু তোমরা যদি এ নেয়ামতের অনাদর কর তবে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের চিরাচরিত নীতি কার্যকর হবে। ইতোপূর্বে যারা তাদের নিকট প্রেরিত নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে, এমন বহু জনপদবাসীকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা চিরতরে সর্বস্বান্ত হয়েছে তাই বলে আল্লাহ পাকের দুনিয়া অনাবাদী রয়নি, এরপর তিনি তাদের স্থলে অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তোমরাও তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা কর। কুফর, নাফরমানী, সত্য-বিরোধিতা পরিহার কর, অন্যথায় ভয়াবহ পরিণামের জন্যে প্রস্তুত থাক।[৪]

তাফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৪৫

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৩৪৫

২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪৪

৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-২৫

৪। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬১২

فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوْا وَ
ارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٣﴾
قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى
جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ
مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ
فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۭ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

তরজমা

(১২) এরপর যখন তারা আমার শাস্তির আভাস পায়, তখনই তারা জনপদ থেকে পলায়নপর হয়;

(১৩) (তাদেরকে বলা হয়) তোমরা পলায়ন করোনা, তোমাদের নিজেদের ঘরে এবং যেখানে তোমরা আয়েশ করেছিলে সেখানে ফিরে যাও, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হতে পারে।

(১৪) তারা বললো, "সর্বনাশ আমাদের! আমরাই ছিলাম সীমা লঙ্ঘনকারী"।

(১৫) এরপর অনবরত তারা এ বিলাপই করতে থাকে, অবশেষে আমি তাদেরকে কেটে কেটে স্তূপাকৃত করে দেই, তারা ভস্ম হয়ে থাকে।

(১৬) আসমান, যমীন এবং তন্মধ্যে যা কিছু আছে তা আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।

(১৭) যদি আমি কিছু খেলনা তৈরী করার ইচ্ছা করতাম তবে তা নিজ থেকে তৈরী করতে পারতাম, একান্তই যদি তা আমাকে করতে হতো;

(১৮) বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি, ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাত মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা কিছু বর্ণনা কর সে-সব কথায় রয়েছে তোমাদেরই সর্বনাশ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, ইতোপূর্বে বহু জালেম সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি এবং এরপর তাদের স্থলে অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেছি।

আলোচ্য আয়াতে সেই ধ্বংস-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ.

যখন ঐ দূরাত্মা কাফেররা আল্লাহ পাকের আযাবের আভাস পায়, এমনকি আযাবকে স্বচক্ষে দেখতে পায় তখন আত্মরক্ষার্থে পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করে; কিন্তু সে মুহূর্তে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন ফেরেশতা বা কোন মোমেন তাদেরকে ডাক দিয়ে বলেঃ

لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ

পলায়ন করোনা, কোথায় যাও, দাড়াও, সেদিকেই ফিরে যাও যেখানে একদিন তোমরা ভোগ-বিলাসে, আনন্দ-উল্লাসে মত্ত ছিলে; আর তোমাদের সেই বাড়ী-ঘরের দিকেই ফিরে যাও যেখানে তোমরা আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলে।

لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ

"তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে"।

তোমাদের সেই ধন-সম্পদ, তোমাদের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ্য, জনপ্রিয়তার কী হলো? আল্লাহ পাকের যে নেয়ামত তোমরা অহরহ ভোগ করছিলে তার জন্যে কি শোকর আদায় করেছিলে?

অথবা, এর অর্থ হলো তোমরা ফিরে যাও তোমাদের সভা-সমিতিতে, জলসা-ঘরে, তোমাদের চাকর-বাকররা হয়তো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, এখন আমাদের প্রতি আপনার কী আদেশ?

অথবা, এর অর্থ হলো হয়তো লোকেরা তোমাদের মজলিসে এসে নিজ নিজ বিপদের কথা বলবে এবং তোমাদের নিকট অনেক কিছু জানতে চাইবে।

অথবা, এর অর্থ হলো কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। আর জিজ্ঞাসাবাদ শাস্তির ভূমিকা স্বরূপই হয়ে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো তাদেরকে একজন নবীকে হত্যা করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫৪-৫৫

শানে নুযুল

ইমাম রাজী (রঃ) এবং আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইয়ামনের "হাজুরা" নামক বস্তির অধিবাসীদের সম্পর্কে। ঐ এলাকার অধিবাসীরা ছিল আরব। আল্লাহ্ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে একজন নবী প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু দূরাত্মা কাফেররা নবীর হেদায়েত মান্য করা তো দূরের কথা, তারা তাঁকে হত্যা করে বসে। তিনি তাদেরকে তৌহীদে বিশ্বাসের আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরিণামে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ্ পাক তাদের শাস্তি স্বরূপ জালেম বখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দিলেন। সে তাদেরকে পাইকারী হারে বন্দী করলো এবং হত্যা করলো। এ হত্যাকাণ্ড দেখে তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হলো এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করতে লাগলো। ঐ মুহূর্তে ফেরেশতাগণ তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন, খবরদার! পলায়ন করোনা, ফিরে যাও, যেখান থেকে এসেছ সেখানে, তোমাদের বাড়ী-ঘরে, যেখানে তোমরা আল্লাহ্ পাকের বিধান অমান্য করেছ, পাপাচারে লিপ্ত হয়েছ, হয়তো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ অর্থ- হয়তো তোমাদের নিকট কিছু চাওয়া হবে।

ইমাম কাতাদা (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, হয়তো তোমাদের নিকট জরিমানা স্বরূপ অর্থ-সম্পদ দাবী করা হবে।

যাহোক, বখতে নসর তাদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করে। তখন গায়বী আওয়াজ আসেঃ "আল্লাহর নবী হত্যা করার এটিই শাস্তি"। তখন তারা অনুতপ্ত হয় এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু সে অনুতাপ তাদের কোন উপকারে আসেনি।

অথবা এর অর্থ হলো, এ পলায়নের সময় তারা একে অন্যকে বলে, পলায়ন করোনা, চল বাড়ী ফিরে যাই, হয়তো আর্থিক জরিমানা আদায় করে আত্মরক্ষা করতে পার, তখন আসমান থেকে গায়বী আওয়াজ আসে, "নবীকে হত্যা করার শাস্তি"।[১]

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

"তখন তারা বলেছিল, হায় আক্ষেপ! আমরাই ছিলাম জালেম, আমরা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছি, আমরা সীমা লঙ্ঘন করেছি"।

দূরাত্মা কাফেরদের ঐ অসহায় অবস্থা সত্যিই দেখার মত, তখন তারা নিজেরাই নিজেদের দোষ স্বীকার করছিল এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতি দেখে আক্ষেপ করছিল। কিন্তু সে আক্ষেপ-অনুতাপ তাদের কোন উপকারেই আসেনি। অসময়ের কান্না অরণ্যে রোদন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৪৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫৭

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خَامِدِيْنَ

এভাবে তাদের আক্ষেপ-অনুতাপ, হা-হুতাশ এবং আত্ম-বিলাপ অব্যাহত ছিল, তারা ক্রন্দণরত ছিল। এদিকে বখতে নসরও তার হত্যাকান্ড অব্যাহত রেখেছিল। তখন তাদের অবস্থা ছিল এমন, জমিতে ফসল কেটে স্তূপাকার করে রাখলে যেমন হয়, অথবা কাঠ আগুনে পুড়ে যেভাবে ছাই ভস্মে পরিণত হয়, "হাজুরা" নামক জনপদের অধিবাসী অবাধ্য কাফেরদের ঐ অবস্থাই হয়েছিল।

جَعَلْنٰهُمْ

আমি তাদের এ অবস্থা করেছি, আর তা হয়েছে তাদের ঘৃণ্য কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ।[১]

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ.

"আসমান যমীন ও তন্মধ্যে যা কিছু আছে তা আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি"।

পূর্ববর্তী আয়াতে একটি নাফরমান সম্প্রদায়ের নাফরমানীর চরম শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে নিতান্ত ন্যায় বিচারের খাতিরে। কেননা, আল্লাহ পাক আসমান যমীনকে তথা নিখিল বিশ্বকে ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেননি; এ নীলাভ আকাশ এবং এ বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী আল্লাহ পাক অকারণে সৃষ্টি করেননি। অতএব, সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবাং মহান স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বুদ্ধিমান মানুষের একান্ত কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে যারা ব্যর্থ হবে, তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ, যার একটি দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী আয়াতে পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এ সূরার শুরু থেকে পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত নবুওয়্যত ও রেসালত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের নবীর নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে এবং প্রেরিত নবীর বিরোধিতা করেছে তাদের পরিণামও ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে তৌহীদের বিবরণ স্থান পেয়েছে এবং শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে নির্দেশ রয়েছে যে, তোমরা আসমান যমীনের বিস্ময়কর সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা কর, আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের প্রতি লক্ষ্য কর, সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর। আসমান যমীনের সৃষ্টি-রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল কর, আর মনে রেখ! আল্লাহ পাক আসমান যমীনকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি। আর পৃথিবী খেলা-ঘর নয়। অতএব, সত্য উপলব্ধি কর এবং বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে সর্বত্র আল্লাহ পাকের যে অদৃশ্য ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে তা প্রত্যক্ষ কর। কেউ যেন একথা মনে না করে যে তাকে উদ্দেশ্য-বিহীন ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে পৃথিবীতে যা খুশী তাই করবে, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তার কোন সওয়াবও নেই, আযাবও নেই, এমন অবস্থা অবশ্যই নয়; বরং প্রত্যেকটি মানুষের জীবন দায়িত্বপূর্ণ, সে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫৫

দায়িত্ব যেমন রয়েছে তার স্রষ্টার প্রতি, তেমনি রয়েছে অন্য সৃষ্টির প্রতিও। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"আর আমি মানুষ ও জ্বীনকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যেই সৃষ্টি করেছি"।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবনকে, যেন তিনি পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে অধিকতর উত্তম"।

অতএব, পৃথিবী খেলা-ঘর নয় পরীক্ষাগার, কে তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে তার হিসাব-নিকাশ হবে কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে। যারা পৃথিবীকে খেল-তামাশার স্থান মনে করে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ভুলে যায়, তাদেরকে সে উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যেই প্রেরিত হয়েছেন যুগে যুগে নবী রসূলগণ। যারা নবী রসূলগণকে অমান্য করেছে তাদের অনেকেরই শাস্তি দুনিয়াতেই হয়েছে এবং আখেরাতেও হবে। পবিত্র কোরআনের পাঁচশত আয়াতে এমন জাতিগুলোর অপকর্মের এবং শাস্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে মানব জাতিকে সাবধান করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ.

(আর আমি আসমান যমীনকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি) বরং এ সৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে বিরাট হেকমত, বিশেষ রহস্য। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

"নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে"।

আর অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا

"আর আমি আসমান যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে অযথা সৃষ্টি করিনি"।

যারা কাফের, মুশরেক, বে-দ্বীন তারা এ ভ্রান্ত ধারণায় মত্ত রয়েছে যে, এ পৃথিবী সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য নেই, এমনকি তাদের নিজেদের জীবনেরও কোন উদ্দেশ্য নেই, তাই তারা দুনিয়ার মায়ায় মত্ত থাকে, খেলা-ধূলায় মগ্ন থাকে, উদ্দেশ্য বিহীন জীবন-যাপন করে, পাপাচারে লিপ্ত থাকে। যেমন কোরআনে করীমের সূরা ইউনুসে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ○ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"নিশ্চয় যারা আমার মোলাকাতের আশা পোষণ করেনা, পার্থিব জীবন নিয়েই হয় পরিতৃপ্ত এবং তাতেই থাকে নিশ্চিন্ত এবং যারা আমার আয়াত সমূহ থেকে গাফেল থাকে, তাদের ঠিকানাই হবে দোযখ। তাদের কৃতকর্মের কারণে"।

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ.

"যদি আমি কিছু খেলনা তৈরী করার ইচ্ছা করতাম তবে তা নিজ থেকে তৈরী করতে পারতাম, একান্তই যদি তা আমাকে করতে হতো"।

· তফসীরকার আতা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আলোচ্য আয়াতে لهو দ্বারা স্ত্রী উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হাসান ও কাতাদা (রহঃ)-ও এ মতই পোষণ করেছেন।

আর কালবী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অন্য একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, لهو শব্দ দ্বারা সন্তান-সন্ততি অর্থ করা হয়েছে।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করেছেন। যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয় তবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই, যদি আমি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার গ্রহণের ইচ্ছা করতাম তবে তা আমার শান মোতাবেকই গ্রহণ করতাম। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে এর দ্বারা পথভ্রষ্ট নাসারা, ইহুদী এবং মুশরেক সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে, কেননা ঐ পথভ্রষ্ট লোকেরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাকের পুত্র এবং তাঁর মাতাকে আল্লাহ পাকের স্ত্রী মনে করে (নাউযুবিল্লাহি মিন জালেক)।

আর ইহুদীরা হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র এবং মুশরেকরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা মনে করে, অথচ স্ত্রী পুত্র গ্রহণ করা আল্লাহ পাকের শানের খেলাফ, তিনি এসব সম্পর্কের অনেক উর্দ্ধে। আল্লাহ পাকের কোন শরীক নেই, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, তিনি সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত। তিনি মহান, অদ্বিতীয়, তাঁর সম্পর্কে এসব চিন্তা করাও মহা পাপ।

إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ

· তফসীরকার কাতাদা (রঃ), এবনে জোরায়েয (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতাংশে ان শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমি তা করবো না। যেহেতু আয়াতের শুরুতে এরশাদ হয়েছে, যদি আমি স্ত্রী পুত্র গ্রহণের ইচ্ছা করতাম তবে তা আমার নিজের পক্ষ থেকেই গ্রহণ করতাম কিন্তু তা আমি করবো না, কেননা এসব আল্লাহ পাকের শানের খেলাফ। মানব, দানব, ফেরেশতা এককথায় সব কিছুই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, সবই আল্লাহ পাকের গোলাম, তিনিই একমাত্র মালিক। অতএব, তাঁর সাথে এমন সম্পর্ক অচিন্ত্যনীয়।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫৬

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

"বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি, ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাত মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়"।

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, এ পৃথিবী খেলাঘর নয়, কর্মক্ষেত্র। যেমন আরবী প্রবাদ রয়েছেঃ

الدنيا مزرعة الاخرة

'দুনিয়া হলো আখেরাতের কর্মক্ষেত্র'।

দুনিয়ার এ জীবনে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে যে যত বেশী সুখ-সামগ্রী সংগ্রহ করবে, সে আখেরাতে তত বেশী সুখ-শান্তি লাভ করবে। তাই দুনিয়াতে হক্ব ও বাতিল, সত্য-অসত্যের সংগ্রাম চলছে অবিরাম। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

بَلْ نَقْذِفُ

"বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'হক্ব" শব্দ দ্বারা সে সব আয়াত সমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ পাকের মহান পবিত্র সত্তার পবিত্রতার বিবরণ রয়েছে, আর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সম্পর্ক থেকে আল্লাহ পাকের পবিত্রতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং "বাতিল" শব্দ দ্বারা কাফের-মুশরেক, ইহুদী-নাসারাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে বোঝানো হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ "বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি, ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাত মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়", আল্লাহ পাকের শানে বেয়াদবীপূর্ণ এসব মন্তব্যের বাতুলতা ঘোষিত হয়।

وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

অর্থাৎ এ পর্যায়ে তোমরা যা কিছু বর্ণনা কর, তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ রয়েছে। আল্লাহ পাকের শানে তোমাদের এ বেয়াদবীর শাস্তি তোমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে, তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতাংশের আরও একটি ব্যাখ্যা করেছেন যে এর অর্থ হলো, যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা-জ্ঞান করে, তাঁকে যাদুকর বলে, পবিত্র কোরআনকে যাদু বা স্বপ্নের এলোমেলো কথা বলে, তাদের জন্যে রয়েছে চরম শাস্তি।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা যেমন অমার্জনীয় অপরাধ, ঠিক তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়অসাল্লামকে অমান্য করার এবং পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করার শাস্তিও অবধারিত।[১]

তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬১৬

তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪৬

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৪৮

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢١﴾
لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۭ قُلْ هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ۭ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

তরজমা

(১৯) আসমান যমীনের সব কিছু তাঁরই, যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর এবাদত থেকে দর্প ভরে বিরত থাকেনা, আর আলস্যও করেনা।

(২০) তারা দিবা-রাত্রি তাঁর মহিমা ঘোষণা করে (তসবীহ পাঠ করে), তারা ক্লান্তি বোধ করে না।

(২১) তারা (কাফেররা) মাটি থেকে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম?

(২২) আসমান যমীনে যদি আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ থাকতো, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব, আরশের অধিপতি আল্লাহ পাক তাদের বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, মহান।

(২৩) তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনা, বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে।

(২৪) তারা কি আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য মা'বুদ গ্রহণ করেছে? (হে রসূল!) আপনি বলুন, তবে তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর, এটি আমার সঙ্গী-সাথী এবং আমার পূর্ববর্তীদের কথা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানেনা, ফলে তারা বিমুখ হয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সেই কাফের মুশরেকদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের সাথে স্ত্রী পুত্রের সম্পর্কের বেয়াদবী-পূর্ণ কথা বলে। আল্লাহ পাক এসব সম্পর্কের উর্দ্ধে। তিনি যাবতীয় দুর্বলতা এবং সকল প্রয়োজন থেকে পবিত্র। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ পাকের সাথে এমন কোন সম্পর্ক হতেই পারেনা। কেননা, আসমান যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের মালিকানাধীন। সব কিছুর উপর তাঁর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি, মানব-দানব-ফেরেশতা সবই তাঁর বন্দা। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্কদাতা। তাই প্রত্যেকেরই কর্তব্য হলো, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। বস্তুতঃ দ্যূলোক-ভ্যূলোকের সব কিছুই আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন। সব কিছুকেই তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে আছে।

وَمَنْ عِنْدَهٗ

অর্থাৎ যারা তাঁর নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতা, যেমন আরশ বহনকারী বা অন্যান্য দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা- সবই আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায়, তসবীহ পাঠে সর্বক্ষণ মশগুল রয়েছে।

لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ

"তারা তাঁর এবাদত থেকে দর্প ভরে বিরত থাকেনা, আর আলস্যও করেনা"।

আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের বন্দেগী থেকে ক্ষণিকের জন্যেও বিরত থাকেনা, আলস্যও করেনা। এবাদতের মধ্যেই তারা স্বাদ লাভ করে, তাই আল্লাহ পাকের এবাদতের মধ্যেই তারা মশগুল থাকে। আর এবাদত না করাকে তাদের ধ্বংস মনে করে, শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ পাকের গোলামীর মধ্যেই তারা রাজকীয় সম্মান বোধ করে।

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ

"তারা দিবা-রাত্রি তাঁর মহিমা ঘোষণা করে (তসবীহ পাঠ করে), তারা ক্লান্তি বোধ করেনা"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে এবনে আবি হাতেমের সূত্রের উল্লেখ করে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একবার প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মজলিশে তশরীফ রেখেছিলেন। তিনি এরশাদ করলেন, হে লোক সকল! আমি যা শ্রবণ করি তোমরা কি তা শ্রবণ কর? সকলে জবাব দিল, আমরা কিছুই শ্রবণ করিনা। তখন তিনি এরশাদ করলেন, আমি আসমানগুলোর

একটি শব্দ শ্রবণ করছি, আর সত্য হলো এই, শব্দ করাই উচিত। কেননা, আসমানে এক বিগত স্থানও এমন নেই যেখানে কোন ফেরেশতা আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত নেই।

আবদুল্লাহ এবনে হারেস এবনে নওফেল বলেন, আমি হযরত কা'বে আহ্বার (রঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, তখন আমার বয়স কম ছিল, আমি তাঁকে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি।

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ

(তারা দিবা-রাত্রি তাঁর মহিমা ঘোষণা করে, তারা ক্লান্তি বোধ করেনা।)

এতে প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ করতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছানো তাদের দায়িত্ব, এতদ্ব্যতীত তারা আরও বেশী দায়িত্ব পালন করে, তাদের এ দায়িত্ব পালনও কি তাদেরকে তসবীহ পাঠে বিরত রাখেনা? আমার এ প্রশ্নের কারণে কা'বে আহ্বার (রঃ) একটু সতর্ক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই শিশুটি কে? লোকেরা বললো, আবদুল মোত্তালেবের বংশধর। তখন তিনি আমার কপালে চুম্বন করলেন এবং বললেন, আমরা যেভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি, ঠিক তেমনি ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করে। দেখ আমরা চলাফেরা করি, কথাবার্তা বলি এবং নিঃশ্বাসও গ্রহণ করতে থাকি, আমাদের কথা-বার্তা নিঃশ্বাস গ্রহণে যেমন বাধা প্রাপ্ত হয় না, ঠিক তেমনি ফেরেশতাদের তসবীহ পাঠও সর্বক্ষণ অব্যাহত থাকে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) কা'বে আহ্বারের এ কথাটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং একথাও লিখেছেন, যেভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করা আমাদের জীবন ধারণের কারণ হয় এবং নিঃশ্বাস গ্রহণে মানুষ কখনও ক্লান্তি বোধ করেনা, ঠিক তেমনি ফেরেশতাদের জন্যে আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ হলো তাদের জীবনের উপকরণ, কখনও তারা এতে ক্লান্তি বোধ করেন না।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের জিকরে যারা মুগ্ধ-মত্ত-মাতোয়ারা থাকেন তাদের পানাহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, বিবাহ সব কিছুই আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে শক্তি লাভের লক্ষ্যেই করা হয়। কেননা এমন ব্যক্তি সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকরে মুগ্ধ থাকেন, এক মুহূর্তের তরেও তাঁরা আল্লাহ পাকের জিকর থেকে গাফেল হন না।

বিখ্যাত সুফী বুযুর্গ হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রঃ)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁকে বলা হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করুন, তিনি বললেনঃ আমি তাঁকে ভুলিনি, যে নতুন করে স্মরণ করতে হবে। এরপর তিনি একটি কবিতা পাঠ করেনঃ

"তিনি সর্বক্ষণ আমার অন্তরে রয়েছেন, আর আমার অন্তরে তাঁর অবস্থানই আমার অন্তরের সৌন্দর্যের উপকরণ। আমি তাঁকে ভুলিনি যে তাঁকে নতুন করে স্মরণ করবো। তিনিই আমার মালিক, প্রতিপালক এবং আমার আশা-ভরসার স্থল, তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে সম্পূর্ণভাবে"।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৭
তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৪৯

এমন আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তিগণের দ্বারা সাধারণতঃ কোন গুনাহর কাজ হয়না, তাঁরা এ সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকেন। কিন্তু যদি কখনও তকদীরি ব্যাপার হিসেবে কোন গুনাহ হয়ে যায় তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হন এবং তওবা করেন। এভাবে আল্লাহ পাক তাদের ত্রুটিগুলোকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। আর একথার ভিত্তিতেই বলা হয় হক্কানী আলেমগণের নিদ্রাও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এমন লোকদের সম্পর্কে বলা যায় তাঁরাও সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের স্মরণে মশগুল থাকেন, কখনও ক্লান্তি বোধ করেন না।[১]

اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ

"তারা (কাফেররা) মাটি থেকে তৈরী করে যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে পারে"?

অর্থাৎ তৌহীদের এত দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা কি আল্লাহ পাক ব্যতীত মাটির তৈরী কোন কিছুকে মা'বুদ ঠিক করেছে? কেননা কাফেররা পাথর, স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল প্রভৃতি দ্বারা মূর্তি তৈরী করতো এবং তাদের পূজা অর্চনা করতো। কিন্তু আল্লাহ পাক যখন তাদেরকে ধ্বংস করবেন তখন কি তাদের উপাস্যরা মৃতকে জীবিত করতে পারবে?

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে কাফেরদের চরম মূর্খতার কথা প্রকাশ করে তাদের উপাস্যদের অক্ষমতার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। বস্তুতঃ এবাদতের যোগ্য তিনিই হতে পারেন যিনি জীবন দান করেন, যিনি মৃত্যু-মুখে পতিত করেন, যিনি সর্ব প্রকার নেয়ামত প্রদানের শক্তি রাখেন, অথচ তারা যে মূর্তিদের পূজা করে সেগুলো সম্পূর্ণ অক্ষম, অসহায়। অতএব, এমন কিছুর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করা নিতান্ত মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

"আসমান যমীনে যদি আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ থাকতো তবে উভয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু, সৃষ্টি জগতের নিয়ম-শৃংখলা, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, সকাল-সন্ধ্যার আগমন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীর সৃজণ সব কিছু একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, সর্বত্র এক মহাশক্তির অদৃশ্য ক্ষমতা বিরাজমান রয়েছে। যদি একাধিক উপাস্য থাকতো তবে সৃষ্টি-জগতে কোন নিয়ম-শৃংখলা থাকতো না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের বিস্ময়কর কুদরত-হেকমত, তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অগণিত নিদর্শন, তাঁর কলা-কৌশলের অপূর্ব মাহাত্ম, তাঁর অনন্ত-অসীম দান, তাঁর অদ্বিতীয় মহান কীর্তি সমূহ সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বিশ্বাসের জন্যে সম্পূর্ণ যথেষ্ট। যে সত্য-সন্ধানী, যে কল্যাণকামী, যে পরিণামদর্শী সে অবশ্যই নিখিল বিশ্বের এসব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু যারা বিবেক বুদ্ধির সদ্ব্যবহার না করার সংকল্প গ্রহণ করে, অথবা যারা আদতেই নির্বোধ শুধু তারাই আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫৮

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

"অতএব, আরশের অধিপতি আল্লাহ পাক তাদের বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি মহান"।

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহীদের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে কাফের মুশরেকরা আল্লাহ পাকের শানে যে আপত্তিকর মন্তব্য করে তা থেকে মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে। যিনি আরশের মালিক, যিনি মহিমময়, যিনি সর্বশক্তিমান, অদ্বিতীয়, লা-শরীক আল্লাহ পাক, আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি, তিনিই একমাত্র মা'বুদ, আমরা তাঁরই বন্দেগী করি। তিনি নিখিল বিশ্বের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, তিনি ব্যতীত আর কেউ এবাদতের যোগ্য নয়। মুশরেকরা আল্লাহ পাকের স্ত্রী পুত্র হওয়ার যে ভ্রান্ত ধারণা রাখে তা থেকে তিনি পবিত্র।

তফসীরকারগণ বলেছেন, 'রব্বুল আরশ' বাক্যটি সংযোজন করে এ বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ পাক সকল প্রকার খুঁত, দোষ, দুর্বলতা এবং যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত, পবিত্র, তাঁর মহিমা, তাঁর শান সবার উপরে। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাকর। তিনি অপরাজেয়, তিনি চির বিরাজমান, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ

"তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে কেউই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনা; বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে"।

এজন্যেই তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষমতা কারোই নেই, আর সমগ্র সৃষ্টি জগতকে তাঁর তরফ থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে। প্রত্যেকেই তার আচরণের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে জবাবদেহী করতে বাধ্য থাকবে। আল্লাহ পাক সব কিছুর মালিক, সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। অতএব, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারে এমন সাধ্য কারোই নেই। আর যেহেতু নিখিল বিশ্বের সব কিছুই তাঁর কর্তৃত্বাধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই তিনি প্রত্যেককে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন; এমন অবস্থায় তাঁর সাথে কোন কিছুই শরীক হতে পারেনা।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً

"তারা কি আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য মা'বুদ গ্রহণ করেছে"?

অর্থাৎ তৌহীদের এতসব অকাট্য যুক্তি প্রমাণ থাকা সত্বেও যারা মানবতার চরম অধঃপতন পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকতায় বিশ্বাসী এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রধানতম অন্তরায় শেরক বা অংশীবাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, তবে কি তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে মা'বুদ বলে গ্রহণ করেছে? অথচ এ অন্যায়ের কোন যুক্তিই তাদের নিকট নেই, তাদের সেই হাতে বানানো তথাকথিত উপাস্যরা কি মৃতকে জীবিত করতে পারে? মৃতদেরকে কবর থেকে উত্থিত করতে পারে? তাদের পূজারীদের কোন উপকার করতে পারে? যখন কিছুই পারেনা

তখন অন্য কারো মা'বুদ বা উপাস্য হওয়ারও কোন যোগ্যতা নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, শেরকের পক্ষে তোমাদের নিকট যদি কোন দলিল থাকে তবে তা উপস্থিত কর। কিন্তু শেরকের পক্ষে কোন দলিল, কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। অতএব, আল্লাহ পাকের সাথে শেরক বা অংশী স্থাপন অযৌক্তিক, অসুন্দর, অকল্যাণকর, মূর্খতাপ্রসূত এবং অবমাননাকর, কেননা মানুষ সৃষ্টির সেরা, স্রষ্টার প্রতিনিধি, তাই কোন সৃষ্টির নিকট মানুষের মাথা নত করার অর্থ মানবতার অবমাননা। মানব জাতিকে এ অবমাননা থেকে রক্ষা করার নিমিত্তেই পবিত্র কোরআন তৌহীদের বাণী প্রচার করছে। শুধু পবিত্র কোরআনই নয়; বরং ইতিপূর্বে যে সব আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে যেমন তৌরাত, ইঞ্জিল, যবুর সে সব আসমানী কিতাব সমূহেও রয়েছে তৌহীদের আহ্বান এবং শেরকের বাতুলতার ঘোষণা।

هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ

"এটি আমার সঙ্গী-সাথী এবং আমার পূর্ববর্তীদের কথা"।

তফসীরকার আতা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন– ذكر من معى অর্থ হলো কোরআনে করীম, আর ذكر من قبلى অর্থ তৌরাত ইঞ্জিল অর্থাৎ পবিত্র কোরআন হোক বা তৌরাত ইঞ্জিল হোক বা অন্য কোন আসমানী ছহীফা হোক, সমস্ত আসমানী গ্রন্থে একই কথা রয়েছে, তৌহীদে বিশ্বাস কর, শেরক বর্জন কর, তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস হলো নাজাতের পন্থা। আর শেরক বা অংশীবাদ অমার্জনীয় অপরাধ, যার শাস্তি দোযখ।

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

"কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানেনা, ফলে তারা বিমুখ হয়"।

বস্তুতঃ মক্কার মুশরেকরা আসমানী কিতাব সমূহকে মানতো না এবং আসমানী কিতাবে কি রয়েছে তা জানতও না। তাই তারা সত্য গ্রহণে ছিল বিমুখ, তৌহীদের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থাপিত হবার পরও তারা তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ থেকে বিমুখ হয়েছে।[১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়েছেন, (হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে একথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন, মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, এটি আমার উম্মতের এবং পূর্বকালের সকল নবী রসূলগণের এবং তাদের অনুসারীদের বিশ্বাস। আর সমস্ত আসমানী কিতাবেও এ বিশ্বাসের কথাই ঘোষণা করা হয়েছে এবং সকল কল্যাণকামী মানুষ এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করেছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৬১

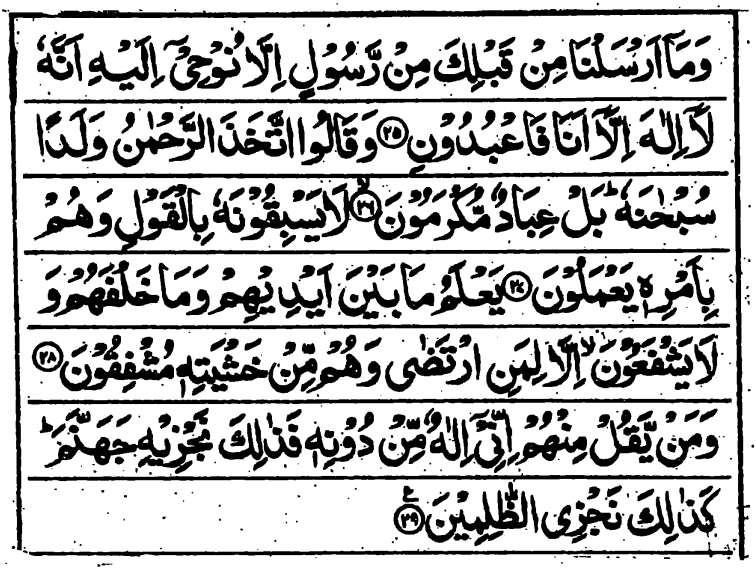
وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ
لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا
سُبْحٰنَهٗ ۭ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ
بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ
لَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾
وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۭ
كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

তরজমা

(২৫) আর আমি আপনার পূর্বে যে কোন রসূলকে প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই দিয়েছি যে প্রকৃতপক্ষে আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই অতএব, তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর।

(২৬) আর পাপীষ্ঠরা বলে, "দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন," তিনি পবিত্র, মহান; বরং তারা সকলেই আল্লাহ পাকের সম্মানিত বন্দা।

(২৭) তাঁর উপরে তারা কেউ কথা বলতে পারেনা, তারা তো তাঁর আদেশ মোতাবেকই কাজ করে থাকে।

(২৮) তাদের অগ্র-পশ্চাতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, তারা সুপারিশ করে শুধু তাদেরই জন্যে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, আর তারা থাকে তাঁরই ভয়ে ভীত।

(২৯) তাদের মধ্যে যে বলবে, আল্লাহ পাক ব্যতীত আমিই মা'বুদ, তাকে আমি দোযখের শাস্তি দেব। এভাবেই আমি সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহীদের বিবরণ ছিল। আর এ আয়াতেও তৌহীদেরই বিবরণ রয়েছে এভাবে যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তৌহীদের যে আহ্বান জানিয়েছেন তা নতুন কিছু নয়; বরং ইতিপূর্বে যত নবী রসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন তাঁরা সকলেই তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। সকল নবী রসূলের একই কথা, আর তা হলো

নিরঙ্কুশ তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত নবী প্রেরিত হয়েছে সকলের নিকট আমি এ প্রত্যাদেশ দিয়েছি যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, অতএব তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর, যেমন অন্য একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

"আর আমি প্রত্যেক উম্মতেই আমার রসূল প্রেরণ করেছি, যারা মানুষের মধ্যে এ ঘোষণা করেছেনঃ তোমরা সকলে এক আল্লাহর বন্দেগী কর"।[১]

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

"আর পাপীষ্ঠরা বলে– "দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন", তিনি পবিত্র, মহান, বরং তারা সকলেই আল্লাহ পাকের সম্মানিত বন্দা"।

শানে নুযুল

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে খাজাআ' গোত্রের লোকদের সম্পর্কে। তারা বলতো, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক)।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, শুধু খাজাআ গোত্রই নয়; বরং এতে রয়েছে ইহুদী খৃষ্টান এবং মুশরেকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ। কেননা, খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করতো (নাউজুবিল্লাহ)। আর ইহুদীরা হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতো (নাউজুবিল্লাহ)। আর মুশরেকদের আকীদা ছিল, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা (নাউজুবিল্লাহ)।

আলোচ্য আয়াতে এসব বাতিল এবং ভিত্তিহীন উক্তির প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পবিত্রতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا

"আর পাপীষ্ঠরা বলে, "দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন", তিনি পবিত্র, মহান, তাঁর শান সন্তান-সন্ততি গ্রহণের দুর্বলতা থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে। তাঁর সম্পর্কে এমন কথা ভাবাও মহা পাপ।

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

বরং তারা আল্লাহ পাকের সম্মানিত বন্দা, তারা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তাঁর অনুগত বন্দা, তাঁর গোলাম। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে مكرمون অর্থ مقربون عندہ تعالٰی অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য বন্দা।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৮

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মর্জির বিরুদ্ধে বা আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত টু' শব্দটি ক্বরার সাহস তাদের নেই। আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাই তাদের কাজ।

وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ

আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেকই তারা কাজ করে থাকে। আল্লাহ পাকের গোলামী করা, তাঁর মহান দরবারে বিনীত হয়ে হাযির থাকাই তাদের বৈশিষ্ট্য।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকল বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক অবগত। ফেরেশতাদের কোন কাজই আল্লাহ পাকের নিকট গোপন নেই। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সবকিছুই তাঁর নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত। কেননা আল্লাহ পাক অর্ন্তযামী। তাঁর নিকট কারো কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি সকলের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আল্লাহ পাকের নেককার বন্দাগণ এ সত্য উপলব্ধি করেন বলেই আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে সর্বদা বিরত থাকেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করেন। আত্ম-সংশোধনে সচেষ্ট থাকেন, আত্ম-সমালোচনা করে, আত্ম-বিশ্লেষণ করে আত্ম-শুদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন এবং আত্ম-শুদ্ধির মাধ্যমে আত্মোন্নতি লাভে সফল হন। যদি জানা বা অজানা অবস্থায় এমন কাজ হয়ে যায় যা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে তবে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তওবা এস্তেগফার করতে থাকেন এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হন। আর যিনি যত বেশী নৈকট্য-ধন্য হন তিনি তত বেশী ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন।

وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

"তারা সুপারিশ করে শুধু তাদেরই জন্যে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, আর তারা আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের দরবারে এত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন যে, তারা শুধু এমন লোকের ব্যাপারেই সুপারিশ করেন যাদের ব্যাপারে সুপারিশ করা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। আর এ সুপারিশও অত্যন্ত ভীত অবস্থায় করে থাকেন।

আল্লাহ পাকের প্রতি ভক্তি-মিশ্রিত ভয় থাকতে হবে

خشية শব্দটির অর্থ হলো ভক্তি-মিশ্রিত ভয়। আর এটি ওলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য বলে কোরআনে করীম উল্লেখিত হয়েছেঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

"শুধু আলেমগণই আল্লাহ পাককে ভয় করে থাকে"।

অর্থাৎ আলেমগণের ভয় হলো ভক্তি-মিশ্রিত ভয়। আর যাদের মধ্যে ভক্তি-মিশ্রিত ভয় থাকে, তারাই জীবন-সংগ্রামে সফলকাম হয়, যেমন সূরায়ে মু'মেনুনের প্রথম আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ.

"নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে সেই মোমেনগণ যারা তাদের নামাযে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকে", তথা ভক্তি-মিশ্রিত ভয় তাদের মধ্যে থাকে। আর এ خشية বা ভক্তি-মিশ্রিত ভয় যাদের মধ্যে থাকে তাদের পক্ষেই নামায সঠিকভাবে আদায় করা সহজ এবং সম্ভব হয়। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ○ اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

"আর নিশ্চয় নামায অত্যন্ত কঠিন তবে তাদের জন্যে নয় যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি ভক্তি-মিশ্রিত ভয় থাকে, যারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভ করবে এবং তারা তাঁর মহান দরবারে ফিরে যাবে"।[১]

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ

"তাদের মধ্যে যে বলবে আল্লাহ পাক ব্যতীত আমি মা'বুদ, তাকে আমি দোযখের শাস্তি দেব"।

অর্থাৎ ফেরেশতাদের মধ্যে কেউ যদি দাবী করে আল্লাহ ব্যতীত আমি মা'বুদ; তবে তার শাস্তি হবে দোযখ। তবে কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, শুধু ফেরেশতা নয়; যে কোন সৃষ্টি নিজেকে মা'বুদ বা উপাস্য বলে দাবী করবে, তার শাস্তি হলো দোযখ। এ আয়াত দ্বারা একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই।

দ্বিতীয়তঃ ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের অত্যন্ত অনুগত বন্দা। তাদের ব্যাপারে উপাস্য হওয়ার দাবীর কথা সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয়।

তফসীরকার কাতাদা এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য হলো ইবলিস। কেননা তাকে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সে আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করেছিল, অহংকার করেছিল, মানুষকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছিল।[২]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৩৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৬৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৩৩

আয়াতের মর্মকথা

কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ পাকের সন্তান-সন্ততি বলে উল্লেখ করেছে, অথচ তারা হলো আল্লাহ পাকের একান্ত অনুগত এবং নৈকট্য-ধন্য বন্দা। আল্লাহ পাকের নাফরমানী তাদের দ্বারা সম্ভবই নয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে যদি তাদেরও কেউ খোদায়ী দাবী করে বসে এবং মানুষকে তার বন্দেগী করতে আহ্বান জানায় তবে তারও রেহাই নেই, তার শাস্তিও অবধারিত, তাকে অবশ্যই দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ

"আর এভাবেই আমি জালেমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি"।

অর্থাৎ জালেম মাত্রের জন্যেই দোযখের শাস্তি অনিবার্য। আর শেরক হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জুলুম, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"নিশ্চয় শেরক সবচেয়ে বড় জুলুম"।

যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে সে সবচেয়ে বড় জালেম, সবচেয়ে বড় সীমা লঙ্ঘনকারী, তার শাস্তি হলো চির নরক-যন্ত্রণা। আর এটি এমন অপরাধ যা ক্ষমার অযোগ্য।

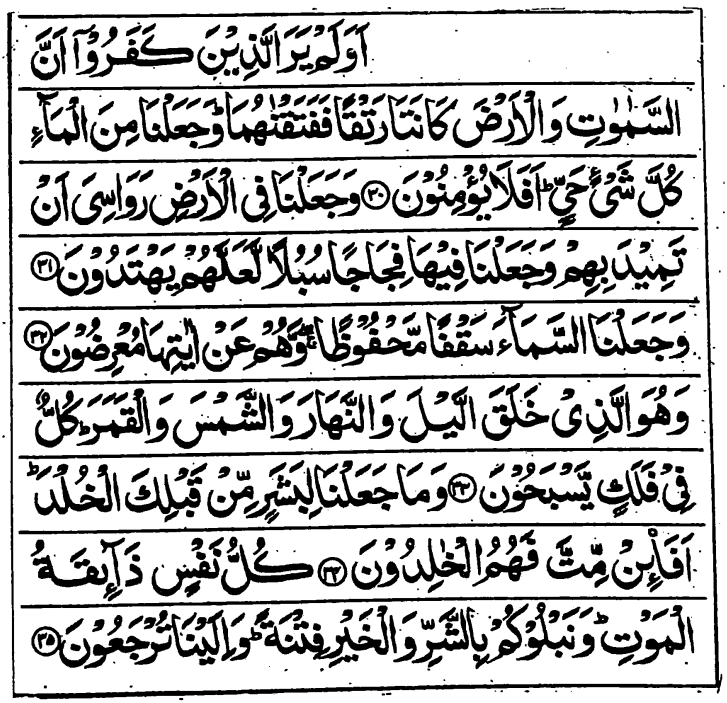
أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۭ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۗءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۭ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ
تَمِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝
وَجَعَلْنَا السَّمَاۗءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ۝
وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ كُلٌّ
فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۭ
اَفَاْىِٕنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕقَةُ
الْمَوْتِ ۭ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۭ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝

তরজমা

(৩০) এ কাফেররা কি ভেবে দেখেনি যে, আসমান যমীন মিশে ছিল ওতঃপ্রোতভাবে, এরপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম আর পানি থেকে সমস্ত প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম, তবু কি তারা ঈমান আনবেনা?

(৩১) আর আমি যমীনে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে করে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

(৩২) আর আমি আসমানকে সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ করেছি, কিন্তু কাফেররা আসমানের নিদর্শন সমূহ লক্ষ্য করে দেখেনা।

(৩৩) আর তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য-চন্দ্র, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে চলেছে।

(৩৪) (হে রসূল!) আমি আপনার পূর্বে কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। অতএব, আপনার ওফাত হলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে?

(৩৫) প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুর আস্বাদ ভোগ করতে হবে। আর আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি মন্দ ও ভাল দ্বারা, আর আমারই নিকট তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহীদের আলোচনা ছিল। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের, একত্ববাদের এবং তাঁর সর্বময় ক্ষমতার কয়েকটি দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا

অর্থাৎ কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে আসমান ও যমীন একত্রিত ছিল, আসমান ও যমীন অভিন্ন ছিল, একটি আরেকটির সঙ্গে মিলিত ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), যাহ্যাক (রঃ), আতা (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে আসমান ও যমীন একটির সঙ্গে আরেকটি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত হেকমতে উভয়ে পৃথক হয়।

আলোচ্য আয়াতের رَتْق শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, কোন কিছু বন্ধ করা, একত্রিত করা। আর فَتْق শব্দটির অর্থ খুলে দেয়া, চিরে দেয়া। অর্থাৎ আগে আসমান ও যমীন একত্রিত ছিল, তদের উভয়ের মুখ ছিল বন্ধ। আসমান থেকে পানি বর্ষিত হতো না, যমীনে কোন তরু-লতা জন্মাতো না। আল্লাহ পাক তাদের বন্ধ মুখ খুলে দিলেন এবং প্রত্যেককে পৃথক করে দিলেন।

মুজাহেদ (রঃ) ও সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আসমান ও যমীন একত্রিত ছিল, এরপর আল্লাহ্ পাক এক আসমানকে সাত আসমানে পরিণত করেন। এমনিভাবে যমীন একটিই ছিল, তাকে সাতটি স্তরে পরিণত করেন।

একরামা (রঃ) ও আতীয়্যা (রঃ) বলেছেনঃ আসমানে কোন ছিদ্র ছিলনা, তখন বৃষ্টিপাত হতো না, যমীনেও কোন ছিদ্র ছিলনা, কোন উদ্ভিদ উৎপন্ন হতো না, আল্লাহ্ পাক বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আসমানে ছিদ্র সৃষ্টি করে দেন এবং যমীনের বক্ষ চিরে তা থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। যেখানে কিছুই ছিলনা সেখানে আল্লাহ্ পাক সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতএব, সেই মহান দাতা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে আসমান যমীন একটির সঙ্গে আরেকটি মিলিত ছিল, এরপর আল্লাহ্ পাক প্রত্যেকটিকে পৃথক করে দেন এবং উভয়ের মাঝে তফাত সৃষ্টি করেন। আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং যমীন থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। আর প্রাণী মাত্রকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এর প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের এবং তাঁর মহা শক্তির জীবন্ত নিদর্শন। তাই কবি বলেছেনঃ

ففی کل شیء له اٰیة = تدل علی انه واحد

"প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহ্ পাকের কুদরতের নিদর্শন, আর প্রত্যেকটি বস্তুই একথার প্রমাণ যে তিনি এক, অদ্বিতীয়"।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়, সর্বপ্রথম রাত ছিল না দিন? তিনি বলেন, সৃষ্টির প্রথম দিকে যমীন ও আসমান একত্রিত ছিল, আর তখন ছিল ঘন অন্ধকার। আর অন্ধকারের নামই রাত। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, রাতই প্রথম।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তুমি হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা কর, তিনি যা জবাব দেন তা আমাকে বল। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সর্বপ্রথম আসমান যমীন একত্রিত ছিল, আসমান থেকে বারিপাত হতো না, যমীনেও কোন উদ্ভিদ উৎপন্ন হতো না। যখন আল্লাহ্ পাক প্রাণবান মাখলুক সৃষ্টি করলেন তখন আসমানে ছিদ্র করে বৃষ্টিপাত করলেন এবং যমীনের বক্ষ চিরে উদ্ভিদ উৎপন্ন করলেন। এ জবাব শ্রবণ করে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) অত্যন্ত খুশী হলেন।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যখন আমি আপনাকে দেখি তখন আমার নয়ন ও মন শান্তি লাভ করে, আপনি আমাকে বিশ্ব-সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, আবু হোরায়রাহ! সব কিছু পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৯-১০

প্রবেশ করতে পারি। তিনি এরশাদ করলেন, মানুষকে সালাম দেবে, পানাহার করাবে এবং সেলায়ে রেহমী করবে, আর রাত্রিকালে যখন মানুষ নিদ্রিত থাকবে তখন তুমি তাহাজ্জুদের নামায আদায় করবে, তাহলে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[১]

আসমান যমীন সৃষ্টির ধারা

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, "আসমান যমীন একত্রিত ছিল", তফসীরকারগণ এ কথাটির ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেনঃ

১. হযরত হাসান বসরী (রঃ), কাতাদা (রঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এবং একরামা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আসমান যমীন একই সঙ্গে মিলিত ছিল, আল্লাহ পাক উভয়কে পৃথক করে দিয়েছেন, আসমানকে বুলন্দ করেছেন এবং যমীনকে তার স্থানে রেখে দিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যমীনের সৃষ্টি প্রথমে হয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক আসমান যমীনকে পৃথক করে যমীনকে তার স্থানেই রেখে দিয়েছেন। আর আসমানের অংশকে উপরে তুলে নিয়েছেন।

২. কা'বে আহ্বার (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক আসমান যমীনকে একত্রিত অবস্থায়ই সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি বাতাস সৃষ্টি করেছেন, যা আসমান যমীনের মাঝখানে প্রবেশ করার মাধ্যমে উভয়কে পৃথক করা হয়েছে।

৩. আর আবু সালেহ ও মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আসমানগুলো একত্রিত ছিল, আল্লাহ পাক তাতে সাতটি স্তর সৃষ্টি করেছেন। আর এ অবস্থা যমীনেরও ছিল।

৪. হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হাসান বসরী সহ অন্যান্য তফসীরকারগণের মতে, আসমান যমীন একই সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় ছিল, আল্লাহ পাক উভয়কে পৃথক করে দিয়েছেন, আসমান থেকে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এবং যমীন থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে। দলিল হিসেবে তারা বলেছেন, পরবর্তী আয়াতে রয়েছে এর ইঙ্গিত, তাতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَيٍّ

অর্থাৎ আমি প্রত্যেকটি বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।

৫. আবু মুসলিম ইসফেহানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের رَتْق শব্দটি দ্বারা নাস্তিত্বের শুণ্য অন্ধকারকে বোঝানো হয়েছে। আর فَتْق শব্দ দ্বারা সৃষ্টি ও অস্তিত্বের কথা বোঝানো হয়েছে। এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, এ কাফের মুশরেকরা কি জানেনা যে, আসমান যমীনের কোন অস্তিত্বই ছিল না, আমিই সৃষ্টি করেছি আসমান যমীন এবং তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছি। আল্লাহ পাক মহান স্রষ্টা, যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন, এ মুশরেকরা তাঁর সাথে কিভাবে শেরক করে? তবে অধিকাংশ তফসীরকারগণ ঐ মতই গ্রহণ করেছেন, যা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ)-এর পক্ষ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৯-১০

২। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৬২-৬৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৩২-৩৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৩৪

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا.....

"কাফেররা কি দেখেনি যে আসমান যমীন মিশে ছিল ওতঃপ্রোতভাবে"?

আসমান যমীনের এ অবস্থা দেখার সুযোগ কাফেরদের কিভাবে হবে? কেননা, তখনতো কারোই অস্তিত্ব ছিলনা।

তফসীরকারগণ এর জবাব দিয়েছেন, আয়াতে যে দেখার কথা রয়েছে তা চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা নয়; বরং ভেবে দেখা বা চিন্তা করা যে, আসমান থেকে অহরহ বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, যমীন থেকে অগণিত প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হচ্ছে, এসব আপনা-আপনি তো হতে পারেনা, কোন মহাশক্তির ইচ্ছা ও মর্জিই কার্যকর হচ্ছে, যিনি আসমানের মুখ খুলে দেন, এরপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে, আর যিনি যমীনের বুক চিরে দেন যার ফলে একটি মসৃণ, ছোট্ট চারা যমীনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। এসব কিছু প্রত্যেকটি মানুষই দেখে, আর এসব দেখার পর স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য। এ কাফেররা তবুও কেন ঈমান আনেনা?

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

পৃথিবীতে যত প্রাণী রয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পানিই তার মূল উৎস। আল্লাহ পাকের এসব বিস্ময়কর নিদর্শন দেখেও যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনা তাদের অন্তর-দৃষ্টি উন্মীলিত হয়না, এটি তাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের এ বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ দেখেও কি তারা ঈমান আনবেনা?

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ

"আর আমি যমীনে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে করে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্য-স্থলে পৌছতে পারে"।

অর্থাৎ মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের এটি বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি যমীনকে মানুষের বাসোপযোগী করে দিয়েছেন, মানুষ যেন পৃথিবীতে নিরাপদে বসবাস করতে পারে তার বাস্তব ব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে বড় বড় পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি

করেছেন। কেননা, আল্লাহ পাক যমীনকে পানির উপর স্থাপন করেছেন। ফলে, যমীন এদিক সেদিক ঢলে পড়বে আশঙ্কা ছিল, আল্লাহ পাক বড় বড় পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করে যমীনকে স্থবির করে দিয়েছেন। যেমন, তিরমিযী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছেঃ

لما خلق الله الارض جعلت تميد ـ الحديث

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যখন যমীনকে সৃষ্টি করলেন, তখন তা নড়াচড়া করতে লাগলো, আল্লাহ পাক তখন পাহাড়-পর্বতকে তার উপর সৃষ্টি করে যমীনকে স্থবির করে দিলেন।

وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ

আর মানুষ যাতে করে একে অন্যের সাথে মেলা-মেশা করতে পারে, পাহাড়-পর্বত বাধা স্বরূপ না হয়, তাই আল্লাহ পাক পৃথিবীতে প্রশস্ত পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ যদি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম মহিমা, কুদরত-হেকমত এবং করুণার প্রতি লক্ষ্য করে এবং চিন্তা করে, তবে সে অবশ্যই শান্তি ও মুক্তির পথ পেতে পারে।

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ

"আর আমি আসমানকে সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ করেছি, কিন্তু কাফেররা আসমানের নিদর্শন সমূহ লক্ষ্য করে দেখেনা"।

আল্লাহ পাক মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনে আসমানকে মাথার উপর ছাদের মত করে তৈরী করেছেন, এটি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত এবং দয়া-মায়ার জীবন্ত নিদর্শন, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

(তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি কোন খুঁটি ব্যতীত আসমানকে বুলন্দ করেছেন) এবং সেই আসমানকে তিনি সুরক্ষিত করে রেখেছেন। যুগ যুগ ধরে তা মানুষের মাথার উপর রয়েছে, তাতে কখনও ফাটল ধরেনা, ভেঙে পড়ারও আশঙ্কা নেই। কি বিস্ময়কর দৃশ্য! কিন্তু মহাশূণ্যে ঝুলন্ত আসমানের বিস্ময়কর নিদর্শন দেখেও কাফেররা সত্য গ্রহণে বিমুখ হয়। তাই বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো, সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং নেয়ামত ভোগ করে দাতার দান গ্রহণ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

سَقْفًا مَّحْفُوْظًا

"সুরক্ষিত ছাদ" এর আরও একটি ব্যাখ্যা হলো, "আল্লাহ পাক আসমানকে সুরক্ষিত করেছেন অর্থাৎ শয়তান উর্দ্ধ জগতে গমন করে কোন খবর চুরি করতে পারেনা"।[১]

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

"আর তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য চন্দ্র, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে চলেছে"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৬৬

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا

'এবং সূর্য পরিভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে"।

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

"তা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণ"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ

"আর চন্দ্রের জন্যে আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মঞ্জিল; অবশেষে তা শুষ্ক বক্র পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে"।

এসবই আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন এবং মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। কেননা, আল্লাহ পাকের নির্দেশেই সব কিছু রয়েছে চলমান।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

"(হে রসূল!) আমি আপনার পূর্বে কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি, অতএব আপনার ওফাত হলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে"?

শানে নুযুল

এবনুল মুনজের এবনে জোরায়েযের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁর ওফাত সম্পর্কে অবগত করানো হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরজ করেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পরে আমার উম্মতের দিকে কে লক্ষ্য রাখবে'? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

وَمَا جَعَلْنَا

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনার পূর্বে কোন মানুষকেই আমি অনন্ত জীবন দান করিনি।

সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে। ইতোপূর্বে যত নবী রসূল আগমন করেছেন সকলকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

اَفَاۡئِنۡ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ

অর্থাৎ আপনার ইন্তেকাল হলে তারা কি বেঁচে থাকবে? মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান তাদের ব্যাপারে কি কার্যকর হবে না?

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, দূরাত্মা কাফেররা বলতো, আমরা সেই সময়ের অপেক্ষা করছি যখন এ ব্যক্তির মৃত্যু হবে। এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মৃত্যু কল্পনা করে তারা মনের জ্বালা জুড়িয়ে নিত। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতাংশে এরশাদ করেছেনঃ

اَفَاۡئِنۡ مِّتَّ

(হে রসূল!) যদি আপনার মৃত্যু হয়ও, তবে কি তারা চিরদিন বেঁচে থাকবে? অবশ্যই নয়, তাহলে তাদের আনন্দ-উল্লাসের কী কারণ থাকতে পারে![1]

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

"প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে"।

এ পৃথিবীতে যে আগমন করেছে, তাকে এখান থেকে অবশ্যই গমন করতে হবে। তফসীরকারগণ বলেছেন, ইসলামের উন্নতি-অগ্রগতি এবং মুসলমানদের সমৃদ্ধি দেখে কাফেররা বলতো, এসব কিছু ততদিনই থাকবে যতদিন এ ব্যক্তি থাকে। অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন কাল পর্যন্তই মুসলমানদের উন্নতি। তাঁর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে সবই বিদায় গ্রহণ করবে। তারই জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন যে, প্রাণী মাত্রকেই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। তবে মানুষের জীবন যেমন আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত ঠিক তেমনি এটি একটি কঠিন পরীক্ষাও। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

"আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করি মন্দ এবং ভাল দ্বারা, আর আমারই নিকট তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে"।

বস্তুতঃ মানুষকে পরীক্ষার্থেই দুনিয়ার এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য এবং বিপদাপদ ও সুখ-সম্পদের ব্যবস্থা রয়েছে। বিচিত্র ও বিভিন্ন অবস্থার মানদন্ডে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। বিপদে কে সবর অবলম্বন করে, নেয়ামত লাভ করে কে শোকর গুজার হয়, আর কে অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম হয়, কে প্রকৃত বন্দা, আর কে নকল, সবই বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের আমলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

অর্থাৎ তোমাদের সকলকে আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হাযির হতে হবে আমার দরবারে। তখন তোমাদের প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী প্রতিফল দেয়া হবে। যে বিপদে সবর করেছে তাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। যে নেয়ামত লাভ করে শোকর গুজার হয়েছে, যে বন্দা বন্দেগী করেছে তাকে তার সওয়াব দেয়া হবে, যে অলসতা বা অবহেলা করেছে তাদের প্রত্যেককে আমল অনুসারে পরিণতি ভোগ করতে হবে। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, মানুষের এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পরীক্ষার জন্যেই দেয়া হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

"তিনিই আল্লাহ পাক যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবনকে যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে ভাল কাজ করে"।

অতএব ভাল কাজ করার মধ্যেই জীবন-সাধনার সাফল্যের রহস্য রয়েছে নিহিত।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৬৯

وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا
الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾
خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا
عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً
فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا
مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾

তরজমা

(৩৬) আর (হে রসূল!) কাফেররা যখনই আপনাকে দেখতে পায় তখন আপনাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ব্যতীত তাদের কোন কাজ থাকেনা; তারা বলে, 'এ লোকটিই কি আমাদের দেব-দেবীর সমালোচনা করে'? অথচ তারাই রহমানের নাম অস্বীকার করে।

(৩৭) সৃষ্টিগত ভাবেই মানুষ ত্বরা-প্রবণ; অচিরেই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শন সমূহ দেখাবো, অতএব তোমরা তাড়া-হুড়া করোনা।

(৩৮) তারা আরো বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল এ প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে'?

(৩৯) হায়! যদি কাফেররা সেই সময়ের কথা জানতো, যখন তারা তাদের চেহারা এবং পিঠ থেকে (সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে) অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না, আর তাদেরকে সাহায্যও করা হবেনা।

(৪০) সেই সময়টি আসবে তাদের উপর অতর্কিতভাবে এবং তাদের হুঁশ-বুদ্ধি লোপ করে দেবে; ফলে তারা তা রোধ করতে পারবেনা, আর তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবেনা।

(৪১) (হে রসূল!) আপনার পূর্বে অনেক রসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছিল, পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো তা বিদ্রুপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।

তফসীরুল কোরআন

وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا

শানে নুযুল

এবনে আবি হাতেম সুদ্দী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু জেহেল এবং আবু সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে কোথাও গমন করছিলেন, আবু জেহেল তাঁকে দেখে বিদ্রুপের হাসি হাসলো এবং আবু সুফিয়ানকে বললো, 'ইনি হলেন বনী আবদে মনাফের 'নবী'। আবু জেহেলের এ বিদ্রুপাত্মক কথা শ্রবণ করে আবু সুফিয়ান রাগান্বিত হলো এবং বললো, 'বনী আবদে মনাফে নবী হওয়া তোমার এত অপছন্দ কেন'? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কথাগুলো শ্রবণ করলেন এবং আবু জেহেলকে সতর্ক করে দিয়ে এরশাদ করলেনঃ "মনে হয় তুমি সে পর্যন্ত বিরত হবেনা যে পর্যন্ত তোমার উপর সেই বিপদ আপতিত না হয় যা তোমার পিতৃব্যের উপর আপতিত হয়েছিল"। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

আবু জেহেল গয়রহ এবং মুশরেকরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিদ্রুপ করে বলে, "ইনিই কি তিনি, যিনি আমাদের দেব-দেবীকে মন্দ বলেন"? আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ

(অথচ তারা দয়াময় আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্মকে অস্বীকার করে) তারা একথা অস্বীকার করে যে, আল্লাহ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে তাঁর নবী প্রেরণ করেছেন, তাঁর মহান বাণী কোরআনে করীম নাযিল করেছেন। এ বিদ্রুপকারীরাই যে সত্যিকার অর্থে বিদ্রুপের যোগ্য, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা তাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ

"সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ ত্বরা-প্রবণ"।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক সব কিছুকে সৃষ্টি করার পর হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির কাজ শুরু করেন। সন্ধ্যার নিকটবর্তী সময়ে তাঁর দেহে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। মাথা, চক্ষু ও রসনায় যখন রুহ পৌছে তখন হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট আরজী পেশ করেন, "হে আল্লাহ! সন্ধ্যার পূর্বেই আমার সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করুন"।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সকল দিনের মধ্যে জুমআর দিন হলো উত্তম। এ দিনেই হযরত আদম (আঃ)-কে পয়দা করা হয়েছে,

---

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫০
· তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৭০
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৬৭

এ দিনেই তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেছেন, আর ঐ দিনই তিনি জান্নাত থেকে বের হয়েছেন, আর এ দিনেই কেয়ামত কায়েম হবে। আর ঐ জুমআর দিনেই একটি এমন সময় রয়েছে, এ সময় যে বন্দা নামাযে থাকে, আর আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুর আরজী পেশ করে, আল্লাহ পাক তা দান করেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর আঙ্গুল মোবারক দ্বারা ইঙ্গিত করেন, সে সময়টি অত্যন্ত সামান্য। হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার জানা আছে সেই সময়টি কখন হয়, তা হলো জুমআর দিনের শেষ সময়টি, ঐ সময়ই আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন। এর পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের বদ-নসিবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরই এ আয়াতে "মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা-প্রবণ" বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে এ হেকমত রয়েছে, কাফেরদের এ পথভ্রষ্টতা, অবাধ্যতার কথা শ্রবণ করা মাত্রই মুসলমানদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা সৃষ্টি হয়, অতি সত্বর তাদের থেকে বদলা নিতে চায় কেননা, মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই ত্বরা-প্রবণ। কিন্তু আল্লাহ পাকের চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি জালেমদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, তবে যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। এজন্যেই পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শন সমূহ দেখাবো। অবাধ্য কাফেরদের শাস্তি কেমন হয় তা তোমরা দেখে নেবে তবে তাড়াহুড়া করোনা।[১]

'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা-প্রবণ', একথার প্রমাণ স্বরূপ সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) ও সুদ্দী (রঃ) হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হযরত আদম (আঃ)-এর মাথায় ও নয়ন যুগলে যখন রুহ প্রবেশ করে তখন তিনি জান্নাতের ফল সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এরপর যখন তাঁর উদর পর্যন্ত রুহ পৌঁছে যায় তখন তাঁর এ ফল খাওয়ার ইচ্ছা হয়, আর পা পর্যন্ত রুহ পৌঁছার পূর্বেই তিনি ঐ ফল নেয়ার জন্যে উঠতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উঠতে পারেননি, বরং পড়ে যান। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

"সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ ত্বরা-প্রবণ"।

এ আয়াতে الانسان শব্দ দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-কে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তাঁর ত্বরা-প্রবণতা ওয়ারিশ সূত্রে আদম সন্তানগণ পেয়েছে। আর ত্বরা-প্রবণতার একটি প্রমাণ এই যে, মানুষ ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা না করে কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, যখন তাকে শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেখতে চায়।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ পাক অতি সামান্য সময়েই হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি অতি অল্প সময়েই হয়েছে। তাঁকে শুক্রবার দিনের শেষ অংশে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর দিন শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁর সৃষ্টির কাজ শেষ হয়েছে। তাঁর সৃষ্টির পূর্বের দিনের শেষ অংশ পর্যন্ত অন্য সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন রূহ তাঁর মাথায় প্রবেশ করে তখন তিনি আরজী পেশ করেন, হে আল্লাহ! দিন শেষ হওয়ার পূর্বেই আমার সৃষ্টির কাজ সুসম্পন্ন করুন। এ কথাটি বলেছেন মুজাহেদ (রঃ)।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-১২

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর ব্যাখ্যা এইঃ আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে অতি অল্প সময়ে একবারেই সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য মানুষের সৃষ্টির যেমন ধারাবাহিকতা রয়েছে, এতে সময় লাগে কিন্তু হযরত আদম (আঃ)-এর ব্যাপারে তা নয়; তাঁকে অল্প সময়ের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

"অতি সত্বর আমি তোমাদেরকে (আযাবের) নিদর্শন সমূহ দেখাবো; অতএব তোমরা তাড়াহুড়া করোনা"।

আলোচ্য আয়াতের آيَاتِي বা নিদর্শন সমূহের অর্থ হলো দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের আযাব। যেমন বদরের যুদ্ধের ঘটনায় দূরাত্মা কাফেরদের শাস্তি হয়েছে; আর দোযখের আযাব তাদের জন্যে অবধারিত হয়েছে।

فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

অর্থাৎ আযাবের সময় তথা নিদর্শন প্রকাশের সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। সেই সময়ের পূর্বে তোমরা তার জন্যে তাড়াহুড়া করোনা; নির্ধারিত সময়ে নিদর্শন অবশ্যই আসবে। কিন্তু কাফেররা বিদ্রুপ করে বলতো, আমরা যদি ভুল পথে থাকি তবে আল্লাহর আযাব এখনই কেন আসেনা। তারই জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ নির্দিষ্ট সময়ে অচিরেই আযাব আসবে, অতএব তাড়াহুড়া করোনা।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে নজর এবনে হারেস সম্পর্কে; সে বিদ্রুপ করে বলতো, "হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যা বলে তা যদি সত্য হয় আর তোমার তরফ থেকে হয় (আর আমরা তা অস্বীকার করি) তবে আমাদের উপর আসমান থেকে এখনই প্রস্তর বর্ষণ কর"।[১]

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

আর কাফেররা একথা বলে, "তোমাদের কথা যদি সত্য হয় যে আযাব আসবে, কেয়ামত হবে, তবে তা কখন আসবে"?

কাফেরদের ধৃষ্টতা কত বেশী ছিল তা তাদের একথা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলতো, 'তোমরা যে আযাবের ভয় দেখাও বা কেয়ামতের ব্যাপারে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ কর তা কখন আসবে'? আল্লাহ পাক তারই জবাবে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

বস্তুতঃ কাফেররা আল্লাহ পাকের আযাবের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারেনি। যদি তারা প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারতো তবে এমন সব কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতো না। দোযখের আগুন যখন তাদের সম্মুখ এবং পশ্চাত থেকে আক্রমণ করবে আর সে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৭০

আগুনকে তারা তাদের চেহারার দিক থেকে এবং পেছন থেকে কোনভাবেই প্রতিরোধ করতে পারবে না, তখন তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্যও করা হবেনা। যদি তারা এ সত্য উপলব্ধি করতো তবে কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত থাকতো না, আর আযাবের জন্যে তাড়াহুড়াও করতো না।

দোযখ থেকে আত্মরক্ষা কর

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সয়ুতী (রঃ) হযরত আদি এবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণিত এবং বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলবেন। তাঁর মধ্যে এবং বন্দার মধ্যে কোন আড়াল থাকবেনা এবং কোন ব্যাখ্যাদাতা ব্যাখ্যাও করবে না। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, "আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি"? বন্দা বলবে, জ্বী-হ্যাঁ। পুনরায় আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, "আমি কি তোমার নিকট রসূল প্রেরণ করিনি"? সে বলবে, জ্বী-হ্যাঁ। এরপর সে ডানদিকে দেখবে কিন্তু অগ্নি ছাড়া কিছুই দেখতে পাবেনা। বাম দিকে দেখবে, কিন্তু অগ্নি ছাড়া সেখানেও কিছু দেখতে পাবেনা। এরপর সে সম্মুখের দিকে তাকাবে, অগ্নি ছাড়া সেখানেও কিছু দেখতে পাবেনা। অতএব, তোমাদের প্রত্যেকের দোযখের অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা কর্তব্য, যদিও একটি খেজুর দ্বারা হোক, আর যদি খেজুর না থাকে তবে একটি ভাল কথা দ্বারা হোক। অর্থাৎ আল্লাহর রাহে একটি খেজুর দান করেও দোযখ থেকে নাজাত পাওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। এমনকি, যদি খেজুর দান করার মত সাধ্য না থাকে, তবে মানুষকে ভাল কথা বলে নেকী হাসিল করা কর্তব্য, যাতে করে দোযখের আযাব থেকে নাজাত পাওয়া সম্ভব হয়।[১]

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ

আযাবের সে মুহূর্তটি অতর্কিত ভাবেই তাদের নিকট আসবে; যার আক্রমণের পূর্বে তারা কোন ধারণাও করতে পারবে না এবং হঠাৎ আক্রমণের কারণে তাদের বুদ্ধি-জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে। তারা এ আযাবকে ঠেকাতে পারবে না। আর তাদেরকে দুনিয়াতে তখন কোন অবকাশও দেয়া হবেনা এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। দোযখের আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করবে। তখন তাদের পোষাক হবে গন্ধকের; যাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এ ভয়াবহ অবস্থা হবে কাফেরদের। গুনাহগার মোমেনদের এ অবস্থা হবে না। কেননা তাদের জন্যে আম্বিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়াগণ এবং ফেরেশতাগণের সুপারিশ সাহায্যকারী হবে এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে এবং তাদের মাগফেরাত দান করা হবে।[২]

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ

"আর (হে রসূল!) আপনার পূর্বে অনেক রসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছিল, পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো, তা বিদ্রুপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল"।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫০

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৭১

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর জন্যে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা রয়েছে এ মর্মে যে, দূরাত্মা কাফেররা যে আপনাকে বিদ্রুপ করে তা নতুন কিছু নয়; বরং আপনার পূর্বে যে নবী রসূলগণ পৃথিবীতে প্রেরীত হয়েছেন তাদের যুগের কাফেররাও তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। অতএব এতে মনক্ষুন্ন হওয়া কিছু নেই। অবশেষে যে আযাবকে তারা অস্বীকার করতো এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপের বিষয় মনে করতো তা তাদের উপর আপতিত হয়েছে। এভাবে আল্লাহ পাক বিদ্রুপকারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ আয়াতে একদিকে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা, আর অন্যদিকে কাফেরদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে কঠোর সতর্কবাণী।[১]

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ
وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ۭ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾
اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ۭ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ
اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَاۗءِ وَ
اٰبَاۗءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۭ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي
الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۭ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ اِنَّمَآ
اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۡ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاۗءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

তরজমা

(৪২) (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে রহমান থেকে দিনে ও রাতে? তবুও তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়।

(৪৩) আমি ব্যতীত তাদের কি আরো উপাস্য রয়েছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারাতো নিজেদেরই সাহায্য করতে পারেনা, আর আমার বিরুদ্ধে তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা- ১৭৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৭১
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৫০

(৪৪) মূলতঃ আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ পুরুষদেরকে ভোগ-সম্পদ দান করেছিলাম, তাদের জীবনের মেয়াদও বেড়ে যায়। তারা কি দেখেনা? যে আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে এনেছি, তবুও কি তারা বিজয়ী হবে?

(৪৫) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমিতো শুধু প্রত্যাদেশ দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু যারা বধির, তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা সতর্কবাণী শ্রবণ করেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আখেরাতে যখন তাদের চতুর্দিকে দোযখের অগ্নি থাকবে তখন তারা সেই কঠিন শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবেনা। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে শুধু আখেরাতে নয়, যদি দুনিয়াতেও আল্লাহ পাক তাদেরকে শাস্তি দিতে চান, দিনে বা রাতে যদি তাদের উপর আযাব আপতিত হয় তবে কে তাদেরকে রক্ষা করবে? তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ

অর্থাৎ (হে রসূল!) যারা আপনাকে বিদ্রুপ করে বা পবিত্র কোরআনকে বিদ্রুপ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যদি দয়াময় আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তবে কে সেই শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি রহমান তোমাদেরকে আযাব দেয়ার ইচ্ছা করেন তবে তাঁর আক্রোশ থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তোমাদের দেব-দেবীরা কি এ পর্যায়ে কোন প্রকার উপকার করতে পারবে? কখনও নয়; বরং রহমান রহীম আল্লাহ পাকই তাঁর অনন্ত অসীম রহমতের কারণে তাদেরকে রক্ষা করছেন। অথচ কাফেররা এ সত্য উপলব্ধি করেনা। তারা দয়াময় আল্লাহ পাকের নেয়ামত নিয়ে মত্ত রয়েছে, আর যিনি তাদেরকে সব কিছু দান করেছেন সেই মহান দাতাকে তারা ভুলে রয়েছে, আর যখন তাদের প্রতি তাঁর আযাব আসবে তখন তিনি ব্যতীত কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবেনা।

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ

"বরং যখন তাদেরকে তাঁর তরফ থেকে উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়"।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ এ কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক যদি দুনিয়াতে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন অথবা আখেরাতে তাদের প্রাপ্য শাস্তি প্রদান করেন, অথবা তাদেরকে মুসলমানদের দ্বারা হত্যা বা বন্দী করানো হয়, তবে এসব বিপদময় মুহূর্তে কে তাদেরকে রক্ষা করবে? আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ তাদের রক্ষাকারী নেই।

আলোচ্য আয়াতে 'রহমান' শব্দটি এজন্যে ব্যবহার করা হয়েছে, যেন তারা আল্লাহ পাকের দয়া মায়ার কথা স্মরণ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনে, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ

অর্থাৎ "হে মানুষ! তোর উদার দানশীল প্রতিপালক থেকে কে তোকে বিভ্রান্ত করেছিল"।

বর্ণনার এ ভঙ্গী পাঠক-শ্রোতাকে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে।[১]

এতে এ বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে যে, রহমান রহীম আল্লাহ পাকের দয়া ব্যতীত তোমাদের রক্ষা পাওয়ার কোন গতি নেই।[২]

এবনে জরীর তবরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) যারা আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে এবং কখন আযাব আসবে জানতে চায়, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, দিনে বা রাতে কখনও যদি আযাব আপতিত হয় তবে কে সেই আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে?

এবনে জোরায়েয (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[৩]

মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আল্লাহ পাকের আযাব থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে মোমেন ও কাফের উভয়ই অসহায়। আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ রক্ষা করতে পারেনা। তবে মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, মোমেন আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করে এবং আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ করতে থাকে, আল্লাহ পাক মোমেনের হেফাজত করে থাকেন, পক্ষান্তরে কাফেররা আল্লাহ পাকের দরবারে কোন আশাও করেনা এবং তাঁর কোন সাহায্যও পায়না।

দ্বিতীয়তঃ কাফের এ দুনিয়ার লাভে-লোভে সর্বক্ষণ মেতে থাকে, আর প্রকৃত মোমেনের পেছনে থাকে এ দুনিয়ার সব কিছু।

اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا

"আমি ব্যতীত তাদের কি আরো উপাস্য রয়েছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে"?

কাফেররা কি মনে করে যে, তাদের মিথ্যা উপাস্যরা তাদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে? অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাদের দেব-দেবীরা ভক্তদের রক্ষা করা তো দূরের কথা নিজেদেরকেও রক্ষা করতে সক্ষম নয়, যদি কেউ কাফেরদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলতে চায় তবে আত্মরক্ষার তো প্রশ্নই ওঠে না, ঐ বিপদ-মুহূর্তে আত্মরক্ষার জন্যে ফরিয়াদ করার শক্তিও তাদের নেই, এমনকি কারো সাহায্য লাভের চেষ্টা করার সাধ্যও তাদের নেই।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৭৪

২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৫১

৩। তফসীরে তাবারী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-২২

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এর অর্থ হলো কাফেরদের দেব-দেবীরা তাদের পূজারীদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়, এমনকি তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতাও তাদের নেই, যে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনা, সে কিভাবে অন্যকে রক্ষা করবে?

وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ

অর্থাৎ তাদের সাথে আমার সাহায্য থাকবেনা, গুনাহগার মোমেনদের জন্যে নবী রসূলগণ, ওলী আল্লাহগণ ও ফেরেশতাগণ সুপারিশ করবে, ফলে আল্লাহ পাকের সাহায্য তারা লাভ করবে। কিন্তু এ মিথ্যা উপাস্যদের পূজারীদের ঐ সাহায্য লাভের কোন আশা নেই; বরং এ মূর্তিগুলো এবং তাদের পূজারীদেরকে দোযখের ইন্ধন হতে হবে। যেমন, অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

"নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর, সকলেই হবে দোযখের ইন্ধন"।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) يصحبون শব্দের তরজমা করেছেন ينصرون অর্থাৎ তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।

আর তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের প্রতি কোন রকম সুপারিশ বা সাহায্য করা হবেনা।

بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

"মূলতঃ আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে ভোগ-সম্পদ দান করেছিলাম এমনকি, তাদের জীবনের মেয়াদ বেড়ে যায়"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেরদের গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতার কারণ বর্ণিত হয়েছে এ আয়াতে, এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ পাক তাদেরকে আহার্য বস্তু এবং সুদীর্ঘ বয়স দিয়েছেন, তাতে তারা মনে করেছে আমরা যা কিছু করছি আল্লাহ পাক সবই পছন্দ করছেন, অথচ অবস্থা তা নয়। যেহেতু কাফেরদের অর্থ-সম্পদ রয়েছে, সুদীর্ঘ বয়সও পাচ্ছে তাই এ ভুল ধারণা করছে যে, তাদের বাতিল উপাস্যদের কারণেই এসব পেয়েছে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ তাদেরকে এবং তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে আমিই দান করেছি জীবন-উপকরণ। আর তারা এ ভুল ধারণাও করছে যে, তাদের প্রাপ্ত নেয়ামত সমূহ সর্বদা থাকবে। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছেঃ

اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ

'তারা কি দেখেনা? যে আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে এনেছি, তবুও কি তারা বিজয়ী হবে'?

অর্থাৎ এ নির্বোধেরা লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ পাক দিনের পর দিন ইসলামকে শক্তিশালী করে তুলছেন, ইসলামের প্রভাব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কুফর ও নাফরমানীর আয়তন প্রত্যহ সংকীর্ণ হয়ে আসছে, এরপরও তারা বিজয় লাভের স্বপ্ন দেখে? যদি তাদের বুদ্ধি থাকতো, যদি তারা বাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন হতো, তবে তারা অবশ্যই দেখতে পেত যে, তাদের আশপাশের লোকেরা কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ কিভাবে ধ্বংস হয়েছে, আল্লাহ পাকের নাফরমানীর শাস্তি কত ভয়ংকর হয়েছে।

قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তো শুধু প্রত্যাদেশ দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি'।

অর্থাৎ আমি আমার নিজের তরফ থেকে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি না; বরং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে মহান বাণী আমার প্রতি নাযিল হয়েছে, তাতে আল্লাহ পাক অবাধ্য কাফেরদের আযাবের কথা জানিয়ে দিয়েছেন, আর এ মহান গ্রন্থে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাও নেই। এজন্যে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর।

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ

'কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা সতর্কবাণী শ্রবণ করেনা'।

এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, আল্লাহ পাকের আদেশ মোতাবেক তাঁর বিধি-নিষেধ মানুষকে জানিয়ে দেয়াই আপনার কাজ। যারা বধির তারা কারো কথা শুনতে পায়না। এ কাফেররা যেন বধির, তাই তারা আপনার নসিহত শ্রবণ করেনা, মানেনা আপনার নির্দেশ; তাতে আপনার কোন দোষ নেই, তাদের পথভ্রষ্টতা এবং এ বধিরতার নির্মম শাস্তি তারা অবশ্যই ভোগ করবে।

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ
اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ
فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۭ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ
خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۭ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا
مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاۗءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾
الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ
مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۭ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ
مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

তরজমা

(৪৬) (হে রসূল!) আর যদি আপনার প্রতিপালকের আযাবের কিছুমাত্র তাপ তাদেরকে স্পর্শ করে তবে তারা অবশ্যই বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, নিশ্চয় আমরাই ছিলাম সীমা লঙ্ঘনকারী।

(৪৭) আর কেয়ামতের দিন আমি স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের পাল্লা; ফলে কারো প্রতি এতটুকুও অবিচার হবেনা এবং কোন কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও থাকে তবে তা আমি নিয়ে আসবো; আর হিসাবের জন্যে আমিই যথেষ্ট।

(৪৮) আর নিশ্চয় আমি মূসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফুরকান, আলো, সেই মুত্তাকীদের জন্যে উপদেশ–

(৪৯) যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং যারা কেয়ামত সম্পর্কে থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত।

(৫০) আর এটি একটি বরকতময় নসিহত, তা আমিই নাযিল করেছি, তবুও কি তোমরা তা অস্বীকার কর?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন যে, আমার নিকট আল্লাহ পাকের নিকট থেকে যে ওহী আসে তার আলোকেই তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু মক্কার কাফেররা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত করেনা। আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে (হে রসূল!) এরা প্রকৃতপক্ষে বধির, তাই তারা আপনার আহ্বানে সাড়া দেয়না এবং আপনার ভয় প্রদর্শনে তারা সতর্ক হয়না। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) যদি আপনার প্রতিপালকের আযাবের বিন্দুমাত্র তাপ তাদেরকে স্পর্শ করে তবে তাদের বধিরতা, অবচেতনতা, গাফলত ও অবহেলা সবই দূরীভূত হয়ে যাবে। তখন তারা কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হবে। তাদের বন্ধ চোখ কান খুলে যাবে। তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। তারা বলবে, হায় আক্ষেপ! আমরা হতভাগা, নিশ্চয় আমরা জালেম, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আল্লাহ পাকের সাথে অন্যকে শরীক করে আমরা সীমা লঙ্ঘন করেছি। আমরা আল্লাহকে ভয় করিনি, তাই আমাদের পরিণাম এত ভয়াবহ হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের نفحة শব্দটির তরজমা করেছেন 'একপার্শ্ব'।

আর কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো 'সামান্য'।

এবনে জোরায়েয বলেছেন, শব্দটির অর্থ হলো একাংশ।

আয়াতের মর্মকথা

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাফেররা বলতো, আমাদেরকে আযাবের ব্যাপারে যে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে তা এখনই আসে না কেন? তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক

এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) পূর্ণ আযাব তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; যদি তারা সামান্যতম আযাব স্পর্শ করে তবে তাদের বন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হবে, তাদের হুঁশ বহাল হয়ে যাবে এবং তাদের সকল গাফলত, অবচেতনা এবং অহংকার সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়ে যাবে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে বলবে, 'আমরা ছিলাম অপরাধী'।

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ

"আর কেয়ামতের দিন আমি স্থাপন করবো ন্যায়-বিচারের পাল্লা"।

সমগ্র মানব জাতির বিচার হবে কেয়ামতের দিন। আর প্রত্যেকের আমলকে সঠিকভাবে বিচার করার নিমিত্ত দাড়ি-পাল্লার ব্যবস্থা থাকবে। কারো প্রতি সামান্যতম জুলুমও করা হবেনা। কারো যদি তিলমাত্র আমলও কোথাও থাকে তবে আল্লাহ পাক তা হাযির করবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এবনে মরদবিয়া তাঁর তফসীরে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমি প্রিয়নবী আল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ পাক আসমান যমীনের ন্যায় দু'টি পাল্লা সৃষ্টি করবেন।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে হযরত ওমর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। জিব্রাঈল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! ঈমান কি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'ঈমান হলো এই যে, তুমি আল্লাহ পাককে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর পয়গম্বরগণকে, জান্নাত এবং দোযখকে এবং (ন্যায় বিচারের জন্যে) পাল্লাকে মানবে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখবে এবং ভাল-মন্দ তকদীরকেও মেনে চলবে'। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, 'যদি আমি তা করি (এসব কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি) তবে কি আমি মোমেন হয়ে যাবো'? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'হ্যাঁ'। তখন জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন'।[১]

তিরমিজী এবং বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজী পেশ করলাম হুজুর, কেয়ামতের দিন আমার জন্যে শাফায়াত করুন। তিনি এরশাদ করলেন, আমি তা করবো। তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে কোথায় খুঁজবো? তিনি এরশাদ করলেন, সর্ব প্রথম আমাকে পুলসিরাতে খোঁজ কর, আমি আরজ করলাম, যদি আমি আপনাকে সেখানে না পাই? তিনি এরশাদ করলেন, তবে আমাকে মিজানের (পাল্লা) নিকট খোঁজ কর। আমি আরজ করলাম, যদি আমি হুজুরকে সেখানেও না পাই? তখন তিনি এরশাদ করলেন, তাহলে আমাকে তুমি হাউজের নিকট তালাশ করবে, এমন হবেনা যে এসব স্থানের কোন একটিতে না পাও।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৭৪

হাকেম ও বায়হাকী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলাম; আপনারা (অর্থাৎ স্বামী তাদের) স্ত্রীগণকে কি কেয়ামতের দিন স্মরণ করবেন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেলেন, তিনটি স্থান এমন যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ করবে না।

১. সে স্থান, যেখানে মিযান কায়েম করা হবে (নেক আমল বদ আমল পরিমাপ করা হবে) যে পর্যন্ত না এ বিষয়ে জ্ঞাত হয় যে, তার নেক আমলের পাল্লা ভারি হয়েছে কি হালকা?

২. সে স্থান যেখানে পুলসিরাত কায়েম হবে, যে পর্যন্ত না সে একথা জানতে পারে যে, পুলসিরাত পার হতে পারবে কি-না?

৩. সে স্থান, যেখানে মানুষের হাতে তার আমলনামা উড়ে আসবে, যে পর্যন্ত না সে জানতে পারে যে তার আমলনামা ডান হাতে আসবে, না পেছন দিক থেকে বাম হাতে আসবে? মিজান সম্পর্কে বহু হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ○ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

'অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন'।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরজী পেশ করেছিলেন, কেয়ামতের দিন যে পাল্লায় আমলনামা পরিমাপ করা হবে, তা আমাকে দেখিয়ে দেয়া হোক। আল্লাহ পাক তাঁকে মিজান দেখিয়ে দিলেন, যার একটি অংশ প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। হযরত দাউদ (আঃ) ঐ দৃশ্য দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, যখন জ্ঞান ফিরে আসলো তখন আরজ করলেন, হে আল্লাহ! এমন কে আছে, যে তার নেকী দ্বারা এত বড় পাল্লাকে ভারী করতে পারে? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হে দাউদ! যখন আমি আমার বন্দার প্রতি রাজী থাকবো তখন একটি খেজুর দান করলেও তার নেক আমলের পাল্লাকে ভারী করে দেব।[১]

فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

'কারো প্রতি এতটুকু অবিচার করা হবেনা'।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যে আযাবের যোগ্য নয় আল্লাহ পাক তাকে কোন প্রকার আযাব দেবেন না এবং কারো নেকী কম করা হবেনা, আর কারো গুনাহও বৃদ্ধি করা হবেনা তথা প্রত্যেকের প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে।[২]

আলোচ্য আয়াতের এ কথাটি অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

"আল্লাহ পাক কণা মাত্রও জুলুম করেন না; বরং নেক আমলের সওয়াব বৃদ্ধি করেন"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৭৪

২। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৭৭

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا

"এবং কোন কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও থাকে তবে তা আমি নিয়ে আসবো"।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন মানুষের হিসাব নিকাশ হবে, যার বদ আমলের চেয়ে নেক আমলের সংখ্যা বেশী হবে সে বেহেশতে যাবে, আর যার একটি বদ আমল নেক আমলের চেয়ে বেশী হবে সে দোযখে যাবে। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেছেন, একটি শষ্যের দানার পরিমাণ বস্তুর কারণেও পাল্লা হালকা বা ভারী হবে। আর যার নেক আমল ও বদ আমল সমান হবে সে আরাফ নামক স্থানের অধিবাসী হবে, আর তাকে পুলসেরাতেই আটকে রাখা হবে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ

"দু'টি বাক্য আল্লাহ পাকের নিকট অত্যন্ত প্রিয়, যা পাল্লাকে ভারি করে দেবে, অথচ বলতে তা অত্যন্ত হালকা এবং সহজ"।

মুসনাদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক সকলের সম্মুখে হাযির করবেন। আর তার গুনাহর বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিতই ৯৯টি দফতর তার সামনে খুলে দেয়া হবে। দৃষ্টিশক্তি যতখানি যায় ততখানি বড় হবে এক একটি দফতর। আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার কৃত গুনাহগুলোর মধ্যে কোনটি কি তুমি অস্বীকার কর? আমার তরফ থেকে যে সব ফেরেশতা তোমার কৃতকর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করছিল, তারা কি তোমার প্রতি কোন জুলুম করেছে? সে জবাব দেবে হে আল্লাহ! কোন অপরাধ অস্বীকার করার জো নেই, আর জুলুম করে লেখা হয়েছে একথাও বলতে পারবো না। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ তোমার কর্মের ব্যাপারে তোমার কোন ওজর-আপত্তি আছে? অথবা কোন নেকী আছে? সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বলবে, না কোন ওজরও নেই এবং কোন নেকীও নেই। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ কেন নেই? তোমার একটি নেকী আমার নিকট আছে, আজ তোমার প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা। এরপর একটি ছোট্ট কাগজের টুকরা বের করা হবে, তাতে লিপিবদ্ধ থাকবে কলেমায়ে শাহাদাত–

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله

আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, এটি পেশ কর। সে ব্যক্তি বলবে, হে পরওয়ারদেগার! গুনাহর ঐ বড় বড় দফতরের মোকাবেলায় এ ছোট্ট কাগজ দ্বারা আর কি হবে? আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তোমার প্রতি জুলুম করা হবেনা। তখন ঐ কাগজের টুকরাটিকে এ পাল্লায় রাখা হবে, আর অন্য পাল্লায় রাখা হবে গুনাহর বিবরণ সমৃদ্ধ দফতরগুলোকে। তখন দেখা যাবে, কাগজের টুকরাটি যে পাল্লায় রাখা হবে তা ভারী হয়ে যাবে, আর গুনাহর দফতর যে পাল্লায় রাখা হবে তা হালকা হবে। মূলতঃ আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের ওজন হবে সর্বাধিক, তার চেয়ে ওজনদার কোন বস্তু হবে না।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৭৫

মুসনাদে আহমদে সংকলিত আরও একখানি হাদীসে রয়েছে, একজন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে বসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার গোলাম রয়েছে, যারা আমার নিকট মিথ্যা কথা বলে, আমার অর্থ-সম্পদ খেয়ানত করে এবং আমার নির্দেশও অমান্য করে, আমি তাদেরকে মারপিট করি এবং গালমন্দ দেই, এ পরিস্থিতিতে আমার এবং তাদের কি পরিণতি হবে? তিনি এরশাদ করলেন, তাদের খেয়ানত অবাধ্যতা যাবতীয় অন্যায় একত্রিত করা হবে এবং তোমার গালমন্দ মারপিট একত্রিত করা হবে, যদি তাদের অন্যায়ের সমান হয়ে যায় তোমার শাস্তি. তবে তুমি নাজাত পেয়ে যাবে, তোমার কোন সওয়াবও হবেনা আযাবও হবেনা। আর যদি তাদের অন্যায় বেশী হয় আর তোমার শাস্তি সে অনুপাতে কম হয় তবে আল্লাহ পাক তোমার প্রতি দয়া করবেন। আর যদি তাদের অন্যায় কম হয় তোমার শাস্তি বেশী হয় তবে তোমার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। একথা শ্রবণ করে ঐ সাহাবী চিৎকার দিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এ ব্যক্তির কি হয়েছে, সে কি কোরআনে করীমের এ আয়াত পাঠ করেনি? তখন তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করলেনঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ

একথা শ্রবণ করে ঐ সাহাবী আরজ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার ইচ্ছা হয়, আমি আমার সমস্ত গোলামদেরকে আযাদ করে দেই, আপনি সাক্ষী থাকুন এসব আল্লাহর রাহে আযাদ, তারা সকলেই মুক্ত।[১]

وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ

'আর হিসাবের জন্যে আমিই যথেষ্ট'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি বন্দাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং তিনি ন্যায়-বিচারক। প্রত্যেকের জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাবের জন্যে তিনিই যথেষ্ট কেননা, তিনি সকলের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আর তিনি ন্যায় বিচার করে থাকেন, সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন, আয়ত্বাধীন। কোন কিছুই তাঁর এলম বা আয়ত্বের বাইরে নেই। অতএব, তাঁর পক্ষে কারো হিসাব নেয়া কঠিন নয়। আর কারো হিসাবের ব্যাপারে ন্যায় বিচার না হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। আর হিসাব গ্রহণে কিছুমাত্র বিলম্বও হবেনা। তাই এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাকের হিসাবই যথেষ্ট।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ

'আর নিশ্চয় আমি মূসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফুরকান, আলো, মুত্তাকীদের জন্যে উপদেশ'।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-১৪-১৫
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫১

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত প্রথমে তৌহীদ ও রেসালতের বর্ণনা ছিল। এরপর যারা নবুওয়্যত ও আখেরাতকে অস্বীকার করে, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাদের শাস্তির কথা ছিল। আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত বিষয়ের সমর্থনে পূর্বকালের নবীগণের ঘটনাবলীর বিবরণ স্থান পেয়েছে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

মানুষকে তার পরকালীন জীবন সম্পর্কে সতর্ক করার লক্ষ্যে এবং এ জীবনকে সরল সঠিকভাবে যাপনের পন্থা শিক্ষা দেয়ার জন্যে যেভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাক ইতিপূর্বেও যুগে যুগে মানুষের কল্যাণের জন্যে অনেক নবী রসূল প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ)-কে আল্লাহ পাক তৌরাতের ন্যায় জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ দান করেছেন, যা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে ছিল পার্থক্যকারী, জীবন-সমস্যার সমাধানে, গোমরাহীর অন্ধকারে আলো পরিবেশনে এবং উপদেশ ও নসিহত বিতরণে তৌরাতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে তৌরাতের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছেঃ

১. الفرقان হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।

২. ضياء গোমরাহীর অন্ধকারে যাদের মন আচ্ছন্ন, তাদের জন্যে ছিল তৌরাত আলো পরিবেশনকারী।

৩. ذكر তথা উপদেশ, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, যারা মোত্তাকী পরহেযগার, যারা পরিণামদর্শী, তাদের জন্যে তৌরাত হলো উপদেশ। হযরত মূসা (আঃ) তৌরাতের আলোকে মানুষকে উপদেশ দিতেন। অবশ্য এ নসিহত তারাই লাভ করতে পারতো যারা আল্লাহ পাককে ভয় করতো। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ

"যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং যারা কেয়ামত সম্পর্কে থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত"।

যাদের অন্তরে থাকে আখেরাতের ভয়, পরকালের চিন্তা, পরিণামের আশঙ্কা তাদের জন্যে এ নসিহত উপকারী হয়। যারা পরহেযগার নয়, তারা আল্লাহকে ভয় করেনা, আখেরাতের চিন্তাও করেনা তাই নসিহত গ্রহণ করেনা।

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۭ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ

"আর এটি একটি বরকতময় নসিহত, তা আমিই নাযিল করেছি, তবুও কি তোমরা তা অস্বীকার কর"?

পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য

অর্থাৎ তৌরাতের পর এ কোরআন হলো অত্যন্ত বরকতময়, বিস্ময়কর, অদ্বিতীয়, মহান, জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ, তৌরাত ও অন্যান্য সমস্ত আসমানী গ্রন্থ থেকে সারগর্ভ।

أَنزَلْنَٰهُ

এটি আমিই নাযিল করেছি, আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি। মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের পথ-নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এ মহান গ্রন্থে। এর বরকত সীমাহীন, এর ভাষা প্রাঞ্জল, এর বক্তব্য সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। এই কিতাব হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজে রচনা করেননি; বরং আমিই তা তাঁর নিকট নাযিল করেছি।

أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ

انتم শব্দ দ্বারা মক্কাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতবড় উপকারী, আলোকময়, বরকতময় মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন পাওয়ার পরও তোমরা তা অস্বীকার কর? তার প্রতি বিশ্বাস করনা? অবশ্য এর দ্বারা তারাই উপকৃত হতে পারে যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, যারা কল্যাণকামী, বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَ
كُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ
الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا
عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾
قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ
فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَ
تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

তরজমা

(৫১) আর নিশ্চয় আমি ইতিপূর্বে ইব্রাহীমকে সুপথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তাকে ভালভাবে জানতাম।

(৫২) যখন তিনি তার পিতা এবং জাতিকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ মূর্তিগুলি কী, তোমরা যার পূজায় রত রয়েছ'?

(৫৩) তারা বললো, 'আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের এগুলোর পূজা করতে দেখেছি'।

(৫৪) ইব্রাহীম বললেন, 'তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে'।

(৫৫) তারা বললো, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছ, না তুমি কৌতুক করছো'?

(৫৬) ইব্রাহীম বললেন, 'আসমান যমীনকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, আসমান যমীনের সেই প্রতিপালকই প্রকৃতপক্ষে তোমাদের প্রতিপালক; আর আমি এ বিষয়ে অন্যতম সাক্ষী'।

(৫৭) 'আর আল্লাহ পাকের শপথ! তোমরা যখন চলে যাবে তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো'।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-এর বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াত থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছিলেন সমগ্র আরব জাহানে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর শৈশব থেকেই তিনি তৌহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। শেরক ও মূর্তি পূজাকে তিনি ঘৃণা করতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন 'খলীলুল্লাহ' বা আল্লাহর বন্ধু এবং বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন নবী রসূলগণের অন্যতম। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ

'আর নিশ্চয় আমি ইতিপূর্বে ইব্রাহীমকে সুপথের জ্ঞান দান করেছিলাম'।

অর্থাৎ মূসা ও হারুন (আঃ)-এর পূর্বে অথবা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বে ইব্রাহীম (আঃ)-কে যথাযোগ্য মর্যাদা, সুপথ, হেদায়েত এবং জ্ঞান দান করেছিলাম।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের رشد শব্দটির অর্থ হলো তৌহীদে বিশ্বাস অর্জন এবং শেরক ও মূর্তিপূজা বর্জন। আয়াতের অর্থ হলো, আমি যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী অবতরণ করেছি এবং মানব জাতির হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পণ করেছি, এটি কোন নতুন ঘটনা বা নতুন কথা নয়; কেননা ইতিপূর্বে যুগে যুগে মানব জাতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে বহু নবী রসূল প্রেরিত হয়েছেন। যেমন ইতিপূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) এবনে আবি শায়বা, আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেমের সূত্রের উল্লেখ করে তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলোঃ

فی صغرہ

অর্থাৎ আমি ইব্রাহীমকে তাঁর বাল্যকালেই হেদায়েত দান করেছি।

অথবা এর অর্থ হলো, নবী মনোনীত করার পূর্বেই আমি ইব্রাহীমকে হেদায়েত দান করেছি।

وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ

আর আমি ইব্রাহীম সম্পর্কে পূর্বেই জানতাম যে, সে হেদায়েত ও নবুওয়্যতের যোগ্য।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ

যখন তিনি তাঁর পিতা ও জাতিকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ মূর্তিগুলি কী, তোমরা যার পূজায় রত রয়েছো'?

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভাষায় তাঁর সম্প্রদায়ের হাতে বানানো মূর্তিগুলোর প্রতি ঘৃণার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তারা ঐ মূর্তিগুলোর সম্মান করতো এবং রাত দিন সেগুলোর পূজা করতো। যে মূর্তিগুলো তাদের কোন উপকার করতে পারেনা, কোন ক্ষতিও করতে পারেনা, এতদসত্ত্বেও তোমরা কোন্ যুক্তিতে এ প্রাণহীন জড় পদার্থের সম্মুখে মাথা নত কর?

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ

তারা বললো, 'আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এগুলোর পূজা করতে দেখেছি'।

অর্থাৎ এদের পূজা করার কোন যৌক্তিকতা বা এর পক্ষে কোন দলিল-প্রমাণ না থাকলেও আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে আমরা এ কাজ করতে দেখেছি। তাই আমরা তাদের অনুসরণেই আমাদের নিজেদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোকে সম্মান দিচ্ছি। এটি কোন যুক্তি বুদ্ধির কাজ নয়; বরং যুগ যুগ ধরে আমাদের পূর্ব পুরুষরা যা করেছে, আমরা তাই করছি।

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

'ইব্রাহীম বললেন, 'তোমরা নিজে এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে'।

অর্থাৎ তোমরা যেমন পথভ্রষ্ট রয়েছ ঠিক তেমনি তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় আচ্ছন্ন ছিল। তোমরা তাদের অন্ধ অনুকরণ করে চলেছ।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের বক্তব্যের কোন যৌক্তিকতা না থাকার কারণে বললেন, আমার যে প্রশ্ন তোমাদের ব্যাপারে রয়েছে, অনুরূপ প্রশ্ন তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ব্যাপারেও। কেননা যা কোনভাবেই কোন উপকার করতে পারেনা এবং কোন ক্ষতিও করতে পারেনা, এমন কিছুর সম্মুখে মাথা নত করার কোন যুক্তিই নেই। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর একথা তাদের নিকট অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়। কেননা, পূর্ব পুরুষকে পথভ্রষ্ট বলা তাদের নিকট বিস্ময়কর ছিল। তাই তারা জিজ্ঞাসা করলোঃ

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ

"তারা বললো, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছো, না তুমি কৌতুক করছো'?

বস্তুতঃ যে বিষয়ের উপর তারা যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করে আসছে তার বিরুদ্ধে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জোরালো বক্তব্যে তারা অত্যন্ত বিব্রতবোধ করে। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে তারা নিঃসন্দেহ হওয়ার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করে, 'হে ইব্রাহীম! তুমি কি সত্যি সত্যিই একথা বলছো, না এমনিতেই কৌতুক করছো'?

ইব্রাহীম বললেন, 'আসমান জমীনকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, আসমান জমিনের সেই প্রতিপালকই প্রকৃতপক্ষে তোমাদের প্রতিপালক, আর আমি এ বিষয়ে অন্যতম সাক্ষী'।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পূর্বের চেয়েও আরও স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করলেন, 'এসব জড় পদার্থ তোমাদের প্রতিপালক নয়; তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, যিনি বিশ্ব সৃষ্টির অধিপতি প্রতিপালক, যিনি সব কিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন'।

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ

অর্থাৎ কোন প্রকার দৃষ্টান্ত ব্যতীত যিনি বিশ্ব জগতকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন, তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, আর সমগ্র সৃষ্টি জগত তার স্রষ্টার অস্তিত্বের ও একত্ববাদের বাস্তব প্রমাণ, জীবন্ত নিদর্শন। এটিই আমার বিশ্বাস, এটিই আমার আকীদা; তিনি মহান, তাঁর কোন শরীক নেই, কোন সমকক্ষ নেই। তাই তিনিই একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য, তিনি এক অদ্বিতীয়, আমি এ সত্যের অন্যতম সাক্ষী।

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ

'আর আল্লাহ পাকের শপথ! তোমরা যখন চলে যাবে তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো'।

كَيْد শব্দটির অর্থ কৌশল। আয়াতের অর্থ হল, তোমরা যখন চলে যাবে তখন আমি তোমাদের এই হাতে বানানো মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবো। যেহেতু সমগ্র জাতি মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল, তাই মূর্তি ভেঙে ফেলা সহজ কাজ ছিল না। এজন্যে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় আল্লাহ পাকের শপথ করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর এ সংকল্প প্রকাশ করেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) মুজাহেদ (রঃ) ও কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ কথাটি অতি সংগোপনেই বলেছিলেন, শুধু এক ব্যক্তিই কথাটি শুনেছিল এবং সে পরে ঐ কথাটি প্রচার করে দেয়, আর সে-ই বলেছিল, 'এক নওজোয়ান, যার নাম ইব্রাহীম, সে-ই মূর্তির উল্লেখ করেছিল, আমি নিজে শুনেছি'।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, নমরুদ সম্প্রদায়ের বাৎসরিক মেলা হত, লোকেরা মেলা থেকে প্রত্যাবর্তন করে সরাসরি মূর্তির নিকট হাযির হত এবং মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করে বাড়ি ফিরে যেত। যখন মেলার সময় হল তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা তাঁকে বললো, তুমিও যদি আমাদের সাথে মেলায় চল তবে তা হবে উত্তম, আমাদের ধর্ম, কৃষ্টি সম্পর্কে তুমি অবগত হতে পারবে। পিতার কথার কারণে তিনি রওয়ানা হলেন, কিছু দূর চলার পর তিনি নিজেকে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং বললেন, আমার শরীর ভাল নয়, যখন সব লোক চলে গেল তখন তিনি আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি প্রকাশ করলেন। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ফিরে এলেন। যে ঘরে তাদের মূর্তিগুলো রাখা ছিল, সে ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন একটার পর একটার মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের সম্মুখে রাখা আছে রকমারি খাবার। তারা এ বিশ্বাসে খাবার রেখে দিয়েছে যে, মূর্তির সম্মুখে রাখায় তাতে বরকত হবে এবং মেলা থেকে ফিরে তারা সে খাবার গ্রহণ করবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিদ্রুপ করে মূর্তিদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা এসব খাবার কেন গ্রহণ কর-না'? এরপর তিনি ইতিপূর্বে মূর্তি ভেঙে ফেলার যে শপথ গ্রহণ করেছেন তা স্মরণ করে সেগুলোর উপর আঘাত করেন এবং বড় মূর্তিটি বাদ দিয়ে ছোট ছোট সব মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলেন।

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾
قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا
سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرٰهِيمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا
فَأْتُوا بِهِ عَلٰى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا
ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِآلِهَتِنَا يٰٓإِبْرٰهِيمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ
كَبِيرُهُمْ هٰذَا فَاسْـَٔلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلٰى
أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلٰى
رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾

তরজমা

(৫৮) এরপর তিনি মূর্তিগুলোর মধ্যে একটি বৃহত্তম মূর্তি বাদ দিয়ে সবগুলোকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন; যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।

(৫৯) তারা বলে আমাদের দেবতাদের সঙ্গে কে এমন ব্যবহার করলো? নিশ্চয় সে হবে কোন জালেম ব্যক্তি।

(৬০) তাদের কেউ কেউ বললো, এক যুবককে দেবতাদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইব্রাহীম বলা হয়।

(৬১) তারা বলে তাকে জন-সমক্ষে হাযির কর, যাতে সকলে দেখতে পায়।

(৬২) তারা জিজ্ঞাসা করে, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের উপাস্যদের প্রতি এমন ব্যবহার করেছ?

(৬৩) ইব্রাহীম বলেন, বরং তাদের বড়টি তা করেছে; যদি তারা কথা বলতে পারে তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

(৬৪) তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং পরস্পরকে বলতে লাগলো, নিশ্চয় তোমরাই সীমা লঙ্ঘনকারী।

(৬৫) এরপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং তারা বললো, তুমি তো জান যে, এ দেবতারা কথা বলে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের উপাস্য মূর্তিগুলো সম্পর্কে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর একটি উক্তির উল্লেখ রয়েছে। তিনি আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলেছিলেন, আমি এগুলোর একটা ব্যবস্থা করবো তথা এগুলোকে ভেঙে ফেলবো। আলোচ্য আয়াতে মুশরেকদের দেব-দেবী মূর্তিগুলোর ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কার্যক্রমের বিবরণ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ

একদিন যখন মুশরেকরা তাদের কোন উৎসব বা মেলায় অংশ নিতে শহরের বাইরে চলে যায়, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন তাদের মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে সংরক্ষিত মূর্তিগুলোকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন, শুধু আকারে এবং আয়তনে যে মূর্তিটি সবচেয়ে বড় তাকে রেখে দিলেন। আর যে কুড়াল দিয়ে তিনি মূর্তিগুলি ভেঙেছিলেন ঐ কুড়ালটিকে বড় মূর্তিটির ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলেন।

لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ

'যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে'।

অর্থাৎ কাফেররা যখন তাদের তথাকথিত উপাস্যদের ধ্বংসাবশেষ দেখবে তখন যেন তারা মূর্তিগুলোর এ দুর্গতির কারণ জিজ্ঞাসা করার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে ফিরে আসে। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মূর্তি পূজার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করেছেন যখন তারা আমার নিকট আসবে তখন আমি তাদেরকে বলবো, যে মূর্তি গুলোর তোমরা পূজা-অর্চনা কর, তারা একজন মানুষের মোকাবেলা করতেও সক্ষম নয়। অতএব তোমরা কোন্ যুক্তিতে এ জড় পদার্থের সম্মুখে মাথা নত কর? এ অর্থ তখন হবে, যখন اِلَيْهِ শব্দটির সর্বনাম দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এই সর্বনাম দ্বারা كَبِيْرًا অর্থাৎ বড় মূর্তিটিকে উদ্দেশ্য করা হতে পারে, তখন অর্থ হবে মূর্তিপূজকরা যখন মেলা থেকে ফিরে বড় মূর্তিটির নিকট আসবে তখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, ছোট মূর্তিগুলোর এ দশা কেন হয়েছে আর কে এগুলোকে ভেঙেছে। সে যেহেতু বড় মূর্তি, তার জবাব দেওয়া উচিৎ। যখন জবাব দিতে পারবে না তখন তার দূর্বলতা, অসহায়ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে। আর তারা জবাব না পেয়ে অপমানিত হবে।[১]

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, اِلَيْهِ শব্দের সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ পাককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে যে, হয়তো তারা তাদের মূর্তিগুলোর অক্ষমতা, অসহায়ত্ব, অপমান ও লাঞ্ছনা দেখে আল্লাহ পাকের তৌহীদ বা একত্ববাদের দিকে ফিরে আসবে। মোটকথা, মূর্তিগুলো অসার হওয়ার ব্যাপারে দু' ধরণের যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ কথার দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ কর্মের দ্বারা। প্রথমে তিনি মৌখিকভাবে মূর্তিগুলোর অক্ষমতা প্রমাণিত করেছেন; কিন্তু যখন তারা তা মেনে নিতে রাজি হলোনা, তখন তিনি মৌখিক পন্থা পরিত্যাগ করে কর্মের দ্বারা মূর্তিগুলোর অক্ষমতা প্রমাণ করেছেন যে, তারা নিজেদের প্রতিরক্ষায়ও অক্ষম। এভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কথা এবং কাজ উভয় পন্থায় তৌহীদের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন এবং মূর্তি পূজার অসারতা প্রমাণ করেছেন।[২]

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

"তারা বলে, আমাদের দেবতাদের সঙ্গে কে এমন ব্যবহার করলো? নিশ্চয় সে হবে কোন জালেম ব্যক্তি"।

মুশরেকরা মেলা থেকে ফিরে এসে যখন তাদের দেবতাদের দুর্গতি দেখতে পায় তখন তারা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলে, কোন্ জালেম আমাদের দেবতাদের এ দুরবস্থা করলো।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৮০

২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৪৬
তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৮৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬২

তফসীরকারগণ বলেছেন, একথাটি হয়তো তাদের, যারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূর্বোক্ত উক্তি لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ (আমি অবশ্যই তোমাদের দেবতাদের সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবো) শ্রবণ করেনি। কিন্তু যারা সে-কথা শ্রবণ করেছিল তাদের কথা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

"তাদের কেউ কেউ বললো, এক যুবককে দেবতাদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়"।

এই খবর যখন জালেম নমরুদ এবং তার লোকদের নিকট পৌঁছে তখন তারা বলেঃ

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ

(যদি সে এ কাজ করে থাকে তবে) তাকে জন-সমক্ষে হাযির কর এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণ কর এবং তার অপরাধের কোন প্রমাণ হাযির কর; যাতে করে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে আমরা শাস্তি প্রদানে অন্যায় না করি।

ইমাম কাতাদা, হাসান বসরী এবং সুদ্দী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اعين الناس শব্দের অর্থ হলো, সরকারী কর্মকর্তাদের সম্মুখে তাকে হাযির কর।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের لعلهم يشهدون বাক্যটির অর্থ হলো, লোকেরা যেন আসে এবং দেখে যে আমরা তাকে কত কঠোর এবং নির্মম শাস্তি দেই।[১]

قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ

তারা জিজ্ঞাসা করলো, "হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের উপাস্যদের প্রতি এমন ব্যবহার করেছ"?

নমরূদের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য মুশরেকরা জন সমক্ষে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সদম্ভে জিজ্ঞাসা করলো, হে ইব্রাহীম! আমাদের উপাস্যদের সাথে কে এই আচরণ করেছে? কার এমন দুঃসাহস?

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ

ইব্রাহীম বললেন, "বরং তাদের বড়টি তা করেছে; যদি তারা কথা বলতে পারে তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ"।

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের জবাবে বললেনঃ তোমরা এ সম্পর্কে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছো? এই যে বড় মূর্তিটি কাঁধে কুড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যদি বলি এ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৮১

কান্ডটি সে-ই ঘটিয়েছে তবে কি তা নিতান্ত অসত্য হবে? আমি এ অভিযোগ তার বিরুদ্ধে করছি। আমার এ অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে তোমাদের কথাকথিত দেব-দেবীকে জিজ্ঞাসা কর, তারা যদি কথা বলতে পারে।

. হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তিনবার ব্যতীত কখনও প্রকাশ্য অর্থেও অসত্য কথা বলেননি।

১. انى سقيم বলেছিলেন, (আমি অসুস্থ)

২. بل فعله كبير (বরং বড় মূর্তিটি এ কাজ করেছে)

৩. এ সম্পর্কে একটি ঘটনা রয়েছেঃ

বিস্ময়কর ঘটনা

একবার হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী সারাকে নিয়ে এক জালেম রাজার দেশ অতিক্রম করছিলেন। ঐ জালেম রাজাকে এই খবর দেয়া হয় যে, এই আগন্তুক ব্যক্তির সঙ্গে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক রয়েছেন। জালেম রাজা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তার দরবারে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সঙ্গে স্ত্রীলোকটি কে? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, তিনি আমার ভগ্নি, এরপর ফিরে এসে তিনি হযরত সারাকে বললেন, যদি রাজা জানতে পারতো যে তুমি আমার স্ত্রী, তবে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিত, এখন যদি সে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তবে তুমি একথাই বলবে যে আমি ইব্রাহীমের ভগ্নি। বাস্তব অবস্থা এই ইসলামের ভিত্তিতে তুমি আমার ভগ্নি কেননা, সারা পৃথিবীতে বর্তমানে তুমি এবং আমি ব্যতীত কোন মোমেন নেই। এরপর জালেম রাজা হযরত সারাকে তার নিকট হাযির করে এবং ঐ সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নামাযে দন্ডায়মান হলেন। জালেম রাজা হযরত সারার দিকে হাত বাড়াতে চাইলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পাকড়াও করা হল এমনকি, তার হাত পা অবশ হয়ে গেলো। তখন ঐ জালেম রাজা হযরত সারার নিকট দরখাস্ত করলো যে, আমার জন্যে দোয়া করুন, আমি ভাল হয়ে আপনাকে কোন কষ্ট দেবনা। হযরত সারা আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ পাক তার বিপদ দূর করলেন। কিন্তু সে পুনরায় তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইলো। তখন পূর্বের ন্যায় অথবা তার চেয়ে বেশী কঠোরভাবে তাকে পাকড়াও করা হল। জালেম রাজা পুনরায় তার নিকট দরখাস্ত করলো। হযরত সারা দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ পাক নাজাত দিলেন। এরপর রাজা তার দারোয়ানকে ডাক দিয়ে বললো, তুমি আমার নিকট কোন মানুষ নয়, জ্বীন নিয়ে এসেছ। এরপর রাজা হাজেরা নামক একজন খাদেমা হযরত সারাকে দিল। যখন হযরত সারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট আসলেন তখন দেখলেন তিনি নামাযে দন্ডায়মান রয়েছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হাতের ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন খবর কি? সারা বললেন, আল্লাহ পাক কাফেরের ধোকাকে তার দিকেই ঘুরিয়ে দিয়েছেন, আর রাজা আমার খেদমতের জন্যে হাজেরাকে দান করেছেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৮১-৮২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-১৮

তর্ক শাস্ত্রের কৌশল

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এই উক্তি যে, "আমি নই; বরং তোমাদের বড় উপাস্যটি এ ঘটনা ঘটিয়েছে" অসত্য নয়। সকল তত্ত্বজ্ঞানী এ সম্পর্কে একমত, আর এ মন্তব্যটি নিন্দনীয় বা আশোভন নয়, কেননা সত্যকে প্রকাশ করার জন্যে সত্যের স্বীকারেক্তিতে জালেম দুশমনদেরকে বাধ্য করার লক্ষ্যে তর্কশাস্ত্রের কৌশল হিসেবেই তিনি বক্তব্যের এ পন্থা গ্রহণ করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যখন কাফেররা জিজ্ঞাসা করে "আমাদের দেবতার সাথে এ আচরণ কে করেছে, কে এগুলো ভেঙে দিয়েছে"? তিনি একথা বলেননি, "মূর্তিগুলোকে আমি ভাঙিনি, কে ভেঙেছে তা আমি জানিনা"। মূর্তিগুলোকে ভেঙে দেয়ার ব্যাপারে তিনি স্বীকারও করেননি বা অস্বীকারও করেননি; বরং এমন বক্তব্য রেখেছেন যার দ্বারা একথা প্রকাশ পায় যে, কে মূর্তিগুলো ভেঙে দিয়েছে। যেমন কোন একটি কক্ষে যদি একই ব্যক্তি থাকে, সে যায়েদ নামক এক ব্যক্তিকে ডাকে। ঐ ব্যক্তি হাযির হয়ে বলে, আমাকে কে ডেকেছে? আহ্বানকারী বলে, ঘরের দেয়ালটি তোমাকে ডেকেছে। একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে দেয়াল কখনও ডাকতে পারেনা বরং আমিই ডেকেছি, ঠিক এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সত্যের দিকে মুশরেকদেরকে আকৃষ্ট করতে এবং তাদের মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা প্রকাশার্থে বক্তব্যের এ পন্থা অবলম্বন করেন। তারা যেন তাদের সত্যিকার দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং সত্য গ্রহণে অনুপ্রাণিত হতে পারে। তাই তিনি বলেছেন, এ মূর্তিগুলোকে জিজ্ঞাসা কর, তারাই বলুক কে তাদেরকে ভেঙেছে? যখন তারা কথা বলতে অক্ষম হল আর তাই স্বাভাবিক, তখন বুদ্ধিমান মাত্রেরই মনে এ প্রশ্নের উদয় হবে যে, এ অসহায় জড় পদার্থের সম্মুখে আমরা কেন মাথা নত করি? মুশরেকদের মনে যেন এ প্রশ্ন উত্থিত হয়, এজন্যেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এভাবে কাফেরদের জবাব দিয়েছেন। তাই তাঁর জবাব মিথ্যার মত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মোটেই মিথ্যা নয়; বরং এর দ্বারা চির সত্যের বহিঃপ্রকাশই হয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১]

এভাবে তিনি হযরত সারা সম্পর্কে বলেছেনঃ তিনি আমার দ্বীনি ভগ্নি, আর এতে কোন সন্দেহ নেই। মূলতঃ প্রত্যেকটি শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি সহজবোধ্য, অন্যটি সহজবোধ্য নয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দ্বিতীয় অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ কথাটির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধির জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। দারুল উলুম দেওবেন্দর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রঃ) অত্যন্ত বড় ওলী আল্লাহ ছিলেন। ইংরেজরা মুসলমানদের থেকে উপমহাদেশের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল বলে তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদে রত ছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করার আদেশ দেয়। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন, সকলের সাথে মিলেমিশে চলতেন। ইংরেজ সরকারের

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৮৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৪৭

লোকেরা তাঁকে গ্রেফতার করতে গেল। যে এ দায়িত্ব নিয়ে তাঁর নিকট হাযির হয় সে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে চেনেনা। তাই তাঁর নিকট সে জিজ্ঞাসা করলো, মওলানা মোহাম্মদ কাসেম কোথায়? তিনি যে স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে কয়েক হাত সরে গিয়ে বললেন, "একটু আগে তিনি এখানেই ছিলেন"। এ জবাব পেয়ে তারা এদিক সেদিক খুঁজতে চলে গেল। তিনিও তাঁর গন্তব্যস্থলে চলে গেলেন। দুশমন থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এমন কথা বলা মোটেই অন্যায় নয়। ঠিক এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.) বলেছেন, হয়তো বড় মূর্তিটি ভেঙেছে, তোমরা মূর্তিটিকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে ভেঙেছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ জবাবের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তা পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখলো এবং পরস্পরকে বলতে লাগলো, নিশ্চয় তোমরাই সীমা লঙ্ঘনকারী"।

তোমরা এমন জড় পদার্থের পূজা কর, যারা তোমাদের কোনই উপকার করতে পারেনা এবং নিজেদেরকে রক্ষাও করতে পারেনা এবং তারা এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, এ প্রতিমাগুলো মোটেই মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য নয়; তাদের পূজা-অর্চনা করে আমরা অপরাধ করেছি। তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতের আরও একটি অর্থ হতে পারে যে, তারা চিন্তা করতে লাগলো, ইব্রাহীম যখন আমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করছিল, তখন যদি আমরা সতর্ক হতাম এবং নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা নিতাম তবে আমাদের দেবতাদের এ দুরবস্থা হতো না, আর এ যুবকের নিকট সকলের সম্মুখে আমরা অপমানিত হতাম না।

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ

"এরপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং তারা বললো, তুমিতো জানই যে এ দেবতারা কথা বলেনা"।

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুক্তিপূর্ণ জোরালো বক্তব্য শ্রবণ করে লজ্জায় মাথানত করে ফেললো এবং বললো, তুমিতো ভাল করেই জান যে, তারা কথা বলতে পারেনা।

তফসীরকারগণ বলেছেন, ক্ষণিকের জন্যে তারা যেন যুক্তি বুদ্ধিতে ফিরে আসলো এবং তাদের মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার প্রতি লক্ষ্য করে লজ্জিত হল এবং একে অন্যকে বলতে লাগলো যে, আমরা নিজেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি, আমরা এমন অসহায় জড় পদার্থকে নিজেদের উপাস্য মেনে নিয়েছি, মূর্তি পূজা করে সত্যিই নিজের প্রতি জুলুম করেছি। কিন্তু এ সত্য উপলব্ধি ছিল তাদের ক্ষণিকের অবস্থা। পুনরায় তারা গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার দিকে ফিরে গেল।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৮৩

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أُفٍّ
لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾
قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾
قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا
بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا
إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ
إِسْحَاقَ ۖ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

তরজমা

(৬৬) ইব্রাহীম বলেনঃ তবে কি তোমরা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করছো যারা তোমাদের ভাল-মন্দ কিছুই করতে পারেনা।

(৬৭) ধিক তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্ পাক ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসান কর তাদের প্রতি, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

(৬৮) তারা বলে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও তবে তাকে পুড়িয়ে ফেল এবং নিজেদের দেবতাদেরকে সাহায্য কর।

(৬৯) আমি বললাম, "হে অগ্নি! ইব্রাহীমের জন্যে শীতল এবং আরামপ্রদ হয়ে যাও"।

(৭০) তারা ইব্রাহীমের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে করেছি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

(৭১) আর আমি তাকে ও লুতকে উদ্ধার করে নিয়ে যাই সেদেশে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে।

(৭২) এবং আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং উপহার স্বরূপ ইয়াকুব। আর তাদের প্রত্যেককেই করেছিলাম সৌভাগ্যবান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুক্তিপূর্ণ কথা-বার্তা শ্রবণ করে কাফের-মুশরেকরা লজ্জায় মাথা নত করে ফেলে। তাদের উপাস্য বা দেবতারা তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না দেখে তারাও নিরুত্তর হয়ে যায়। এই সুযোগে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শেরক ও কুফরের বাতুলতা ঘোষণা করে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বানের লক্ষ্যে যা বলেছিলেন তা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ

"ইব্রাহীম বলেনঃ তবে কি তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করছো যারা তোমাদের ভাল-মন্দ কিছুই করতে পারে না"।

অর্থাৎ একথা জানার পর যে, তোমাদের উপাস্যরা কোন কথা বলতে পারে না, তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না, এমনকি আত্মরক্ষাও করতে পারে না, যে তাদেরকে ধ্বংস করলো তার বিরুদ্ধে অভিযোগও করতে পারে না এবং সে অপরাধীর সন্ধানও দিতে পারে না; এরপরও তোমরা কোন্ যুক্তিতে তাদের উপাসনা কর? ধিক! তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের বাতিল উপাস্যদের প্রতি। তোমরা এসব অসহায় জড় পদার্থের উপাসনা করে নিজেদেরকে অপমানিত করছো এবং আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হচ্ছো।

তবুও কি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি কর-না যে, এসব জড় পদার্থ আদৌ মানুষের এবাদতের যোগ্য নয়, মানব জাতির এবাদতের যোগ্য একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই, আর কেউ নয়।

আলোচ্য আয়াতের اف শব্দটি কোন বিষয়ের উপর ঘৃণা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। কোন বস্তুকে ক্ষুদ্র করতে অথবা কোন দুর্গন্ধ উপলব্ধি করলেও এ শব্দটি বিরক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন একবার হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুর্গন্ধ উপলব্ধি করে اف اف বলেছেন এবং তাঁর নাক মোবারকে কাপড় ব্যবহার করেছেন। সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পর তথা প্রতিমা পূজার বাতুলতা দিবালোকের মত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও যেহেতু তারা এ অন্যায় ও ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ছিল, তাই এ পর্যায়ে নিন্দা প্রকাশার্থে اف শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

আল্লামা বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, যখন তারা তাদের অন্যায় আচরণের পক্ষে কোন যুক্তি বা দলিল-প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হলো, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুক্তির কাছে হেরে গেল, তখন তারা শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নিল যা সাধারণতঃ মূর্খ লোকেরা করে থাকে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিদগ্ধ করে শেষ করার ইচ্ছা করলো। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৮৩

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ

"তারা বলে, তোমরা যদি কিছু করতে চাও তবে তাকে পুড়িয়ে ফেল এবং তোমাদের দেবতাদের সাহায্য কর"।

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথার জবাব দিতে ব্যর্থ হয়ে তারা তাদের দেবতাদের সাহায্য করার জিগির তুললো। যেহেতু তারা উপলব্ধি করেছিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ই তাদের মূর্তিগুলো ভেঙে দিয়েছেন তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিদগ্ধ করে তাদের মনের জ্বালা জুড়াবে।

ইব্রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার প্রস্তাব কে দিয়েছিল?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, সর্বপ্রথম এ প্রস্তাবটি দিয়েছিল 'হনূন' নামক এক ব্যক্তি। আল্লাহ পাক তাকে জমীনে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত তার এ শাস্তি অব্যাহত থাকবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ প্রস্তাবটি সর্বপ্রথম নমরুদই দিয়েছিল। নমরুদ তখন ঐ এলাকার রাজা ছিল। বর্তমান বাগদাদ থেকে প্রায় ৪২ মাইল দূরে অবস্থিত স্থানে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এই এলাকায় জালেম নমরূদ রাজত্ব করতো। নমরূদ এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তাঁকে বন্দী করে একটি ঘরে আবদ্ধ রাখা হলো এবং জাতীয় ভিত্তিতে জ্বালানি সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হলো। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অগ্নিকুন্ডের জন্যে জ্বালানি সংগ্রহে অংশ গ্রহণ করলো। এ উদ্দেশ্যে একটি বিরাট গর্ত খোঁড়া হলো এবং তাতেই জ্বালানিগুলো একত্রিত করা হলো।

বিরাট অগ্নিকুন্ড তৈরী করা হলো

এবনে এসহাক বর্ণনা করেন যে, সুদীর্ঘ এক মাস যাবত জ্বালানি সংগ্রহ করা হলো এবং এরপর চতুর্দিক থেকে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। এক বিরাট অগ্নিকুন্ড তৈরী করা হলো। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, ১৬ মাইল এলাকা পর্যন্ত তার উপর দিয়ে কোন পাখীও উড়তে পারতো না। ঐ অবস্থায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাতে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু কিভাবে নিক্ষেপ করবে, তার সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারছিল না। তখন ইবলিস এসে তাদেরকে 'মেনজানিক' যা আধুনিক কালের ক্রেন, ব্যবহারের পরামর্শ দিল। অবশেষে তাই করা হলো।

এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আসমান জমীন ফেরেশতা (জ্বীন ও মানুষ ব্যতীত) সমস্ত সৃষ্টি জগত চিৎকার করতে লাগলো এবং আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলো, হে আমাদের প্রতিপালক! ইব্রাহীম তোমার বন্ধু। অথচ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। তিনি ব্যতীত পৃথিবীতে তোমার কোন এবাদতকারী নেই। অনুমতি হলে আমরা তাঁকে সাহায্য করি। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ ইব্রাহীম আমার বন্ধু। সে ব্যতীত আমার কোন বন্ধু নেই। আমি তার মা'বুদ; আমি ব্যতীত তার কোন মা'বুদ নেই। যদি সে তোমাদের কারো নিকট সাহায্য চায় তবে সে তাকে সাহায্য করতে পারে। আমার তরফ থেকে অনুমতি

রয়েছে। আর যদি সে আমার নিকট ব্যতীত আর কারো সাহায্য প্রার্থী না হয় তবে তার অবস্থা আমি খুব ভালভাবেই জানি। আমি তার জন্য সব কিছু করবো। তোমরা আমার ও তার মাঝে আড়াল হয়োনা। নমরুদের লোকেরা যখন হযরত ইব্রাহীমকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করতে ইচ্ছা করে, তখন যে ফেরেশতা সারা পৃথিবীর পানি সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন, তিনি হাযির হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বলেন, আপনার ইচ্ছা হলে আমি এই অগ্নিকে নির্বাপিত করে দেই। এমনিভাবে বাতাসের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাও এসে তাঁকে বলেন, আপনার ইচ্ছা হলে আমি এই অগ্নি বাতাস দ্বারা উড়িয়ে নিয়ে যাই। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের উভয়কে বলেন, তোমাদের সাহায্যের আমার কোন প্রয়োজন নেই, আমার জন্যে আল্লাহ পাক যথেষ্ট, তিনিই আমার জন্যে সব কিছু করেন।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, লোকেরা যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিকুন্ডে ফেলবার জন্যে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেলল, তখন তিনি বলেছেনঃ

لا اله الا انت سبحانك لك الحمد ولك الملك لاشريك لك

এরপর তাকে 'মেনজানিক' বা ক্রেনে উঠিয়ে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়। নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) বললেন, হে ইব্রাহীম! আমি কি আপনাকে এ মুহূর্তে সাহায্য করবো? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, আপনার সাহায্যের আমার কোন প্রয়োজন নেই। তখন জীব্রাঈল (আঃ) বলেন, তাহলে আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দরখাস্ত করুন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, আমার দরখাস্ত করারও কোন প্রয়োজন নেই, আল্লাহ পাক আমার অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, আর আমার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট।

কা'বে আহবার (রঃ) বর্ণনা করেন, প্রত্যেকটি বস্তুই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ অগ্নিনির্বাপনে অংশ নিয়েছে। কিন্তু গিরগিটি নামক প্রাণীটি অগ্নিতে ফুঁ দিয়ে তা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছে।

গিরগিটিকে হত্যা কর

আল্লামা বগভী (রঃ) সাঈদ এবনে মোসাইয়্যেব (রঃ)-এর সূত্রে হযরত উম্মে শোরাইক (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গিরগিটিকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং আরো এরশাদ করেছেনঃ গিরগিটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অগ্নিকে বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে ফুঁক দিয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ মর্মের হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। তাতে একথাও রয়েছে, গিরগিটিকে (টিক্‌টিকির চেয়ে বড় এক প্রকার বিষাক্ত প্রাণী) হত্যা কর যদি তা কা'বা শরীফের ভেতরেও থাকে। হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকেও এ মর্মের হাদীস বর্ণিত আছে যা মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি গিরগিটিকে বর্ষার প্রথম আঘাতে হত্যা করে, তার জন্যে

একশ'টি নেকী লিপিবদ্ধ হবে। আর যে দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করে, তার জন্যে আরো কম নেকী লিপিবদ্ধ হবে। আর যে তৃতীয় আঘাতে হত্যা করে, তার জন্যে আরো কম নেকী লিপিবদ্ধ হবে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সাহায্য করার জন্যে পানির দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতার এবং হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর প্রস্তাবের উল্লেখ করেছেন।

এ পর্যায়ে তিনি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পানির দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা আল্লাহ পাকের হুকুমের অপেক্ষায় ছিল, যে হুকুম পেলেই পানি দ্বারা ঐ অগ্নিকে নির্বাপিত করবেন। কিন্তু আল্লাহ পাক সরাসরি অগ্নিকেই আদেশ দিয়েছেনঃ

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

"আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের জন্যে শীতল এবং আরামপ্রদ হয়ে যাও"।

সারা পৃথিবীতে আগুন তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ যদি আল্লাহ পাক عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ শব্দটি ব্যবহার না করতেন, তবে সর্বকালের জন্য পৃথিবী থেকে অগ্নি বিদায় নিত।

হযরত কা'ব আহবার (রঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাকের এ আদেশের কারণে সেদিন সারা পৃথিবীর অগ্নি নির্বাপিত হয়ে যায়। কেউ অগ্নি দ্বারা সেদিন কোন কাজ করতে পারেনি।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যে রশি দ্বারা বাঁধা হয়েছিল, সে রশিগুলো ঐ অগ্নি দ্বারা পুড়ে যায়। কিন্তু অগ্নি তাঁর একটি পশমও স্পর্শ করেনি।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, অগ্নিকে এ আদেশ দেয়া হয়েছিল যেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কোন প্রকার ক্ষতি না হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক যদি অগ্নিকে শুধু শীতল হওয়ার আদেশ দিতেন, তবে ঐ শৈত্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে ক্ষতিকর হতো। সেজন্যে আল্লাহ পাক অগ্নিকে তাঁর জন্যে আরামদায়ক হবার আদেশ দিয়েছেন।

হযরত শোয়ায়েব যোবায়ী (রঃ) বর্ণনা করেন, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর।[২]

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) লিখেছেনঃ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবার পর ফেরেশতাগণ তাঁকে জমীনে বসিয়ে দেন। তিনি সেখানে দেখেন মিষ্টি পানির ঝরণা এবং লাল গোলাপ ফুল ফুটে আছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৮৪-৮৫
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-১৯-২০

অগ্নিতে কতদিন ছিলেন?

একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি অগ্নিতে সাতদিন ছিলেন। আর আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) অন্য একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ দিন ছিলেন।

মেনহাল এবনে আমর বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, যত আরাম-আয়েশে আমি অগ্নিতে ছিলাম, এত আরাম জীবনে কখনো ভোগ করিনি।

এবনে ইয়াসার বলেছেনঃ আল্লাহ পাক ছায়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আকৃতি দিয়ে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন যেন তিনি নিঃসঙ্গ বোধ না করেন।

আল্লাহ পাকের নির্দেশ-ক্রমে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) জান্নাত থেকে একটি জামা এবং মসনদ নিয়ে আসেন। জামাটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পরিধান করান এবং তাঁকে মসনদে বসিয়ে দেন। আর নিজেও মসনদে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। তাঁকে এই বাণী পৌছান যে, আপনার পরওয়ারদেগার বলেছেন, তোমরা জাননা যে অগ্নি আল্লাহর বন্ধুদের ক্ষতি করতে পারেনা।

কিছুদিন পর নমরুদ একটি উঁচু ইমারতের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখলো, তিনি ফুলের বাগানে বসে আছেন এবং একজন ফেরেশতা (মানবাকৃতিতে) তাঁর পার্শ্বে বসে রয়েছেন। তাঁর চারিদিকে অগ্নি আর অগ্নি রয়েছে এবং ঐ অগ্নি দ্বারা কাষ্ঠখন্ড গুলো জ্বলছিল। এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে নমরুদ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে ডাক দিয়ে বলল, হে ইব্রাহীম! তোমার মা'বুদ অত্যন্ত বড়। যাঁর শক্তি এত বেশী যে তা তোমার এবং অগ্নির মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আমি স্বচক্ষে দেখছি। এরপর নমরুদ বলে, হে ইব্রাহীম! আপনি কি অগ্নি থেকে বের হতে পারেন? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, হ্যাঁ। নমরুদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, যদি আপনি সেখানে থাকেন তবে দগ্ধ হওয়ার ভয় আছে কি? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, না। নমরুদ বলে, তাহলে সেখান থেকে বের হয়ে আসুন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে বের হয়ে আসলেন। নমরুদ বলল, যে ব্যক্তি আপনার পাশে বসেছিলেন তিনি কে? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, আমার প্রতিপালক আমার নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যে ছায়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নমরুদ বলল, আমি আপনার মা'বুদের জন্যে কিছু কোরবানী পেশ করতে চাই। কেননা আমি দেখেছি তাঁর বিস্ময়কর কুদরত এবং অসাধারণ শক্তি। যখন আপনি তাঁর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন, তখন তিনি আপনার জন্যে কি করেছিলেন, তা-ও আমি দেখেছি। আমি তাঁর নামে চার হাজার গাভী কোরবানী করব। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেনঃ যে পর্যন্ত তুমি তোমার বর্তমান ধর্ম পরিত্যাগ না করবে এবং আমার দ্বীন গ্রহণ না করবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ পাক তোমার কোরবানী কবুল করবেন না।

নমরুদ বললোঃ তা করতে হলে আমাকে রাজত্ব হারাতে হয়, আমি রাজত্ব হারাতে পারিনা, তবে তাঁর নামে আমি অবশ্যই কোরবানী পেশ করব। এরপর নমরুদ চার হাজার

গাভী কোরবানী দেয়। পরে সে আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেনি, আল্লাহ পাক তাঁর হেফাজত করেন।[১]

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

"তারা ইব্রাহীমের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আমি তাদেরকেই করেছি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত"।

আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে অগ্নিকুন্ডকে ফুলের বাগানে পরিণত করে দেন এবং কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন। আল্লাহ পাক অগ্নির আলোটি রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার তাপ বন্ধ করে দিয়ে শীতল করে দিয়েছিলেন, কেননা অগ্নির তাপ আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, সেই তাপ মূলতবী করে দেয়া তাঁর ইচ্ছাধীন বিষয়, যেমন দোযখের ব্যবস্থাপনায় যে সব ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছে দোযখের অগ্নি তাদেরকে স্পর্শ করেনা এবং তারা দোযখের অগ্নির তাপ উপলব্ধি করেনা। এমনকি দুনিয়াতেও আমরা দেখি, কারাগারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত থাকে তারা কখনও শাস্তি উপলব্ধি করেনা। ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাক অগ্নির তাপ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। অগ্নিকুন্ডকে ফুলের বাগানে রূপান্তরিত করেছেন, আর এটি তাঁর জন্যে কঠিন কিছুই নয়।

নমরুদ ধ্বংস হলো

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ক্ষতি সাধনের যে চেষ্টা করেছে, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক নমরূদ ও তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্যে এক বিশাল মশক বাহিনী প্রেরণ করেন যারা তাদের দেহের গোশ্ত খেয়ে ফেলে। আর একটি মশা নমরূদের নাকের ছিদ্র দিয়ে মাথায় প্রবেশ করে এবং তাকে দংশন করতে থাকে। আর এভাবে সে ধ্বংস হয়ে যায়। অগ্নিকুন্ড গুলবাগে পরিণত হওয়া এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দুশমনদের নিপাত যাওয়া সবই ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মোজেযা। আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁর যে অসাধারণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল তারই ফলশ্রুতি। আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা করেন তখন তাঁর আপন প্রিয় বন্দাকে এভাবেই সাহায্য করেন এবং তাঁর দুশমনদেরকে করেন অপমানিত।[২]

আল্লামা ইকবাল এজন্যেই বলেছেন,

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا = آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

"আজও যদি ইব্রাহীমের ঈমান সৃষ্টি হয়, তবে অগ্নিকুন্ড গুলবাগে পরিণত হতে পারে"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৮৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৬৭-৬৯
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫৩
তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৮৭

২। তফসীরে গরায়েবুল কোরআন খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৩৫
তফসীরে কুরতবী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৪৯

آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے = کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے

"কুফর ও শেরকের অগ্নি আজও রয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরও আছে এবং নমরূদও রয়েছে বর্তমান। কেউ কি কারো ঈমানের পরীক্ষা করতে চায়? তা আজও হতে পারে"।

যাহোক, অগ্নিকে আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে জ্বালাবার ক্ষমতাও আল্লাহ পাকই দিয়েছেন। যখন ইচ্ছা তিনি সেই ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে বিরতও রাখতে পারেন। মওলানা রুমী (রঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, পূর্বকালে একজন মূর্তিপূজক রাজা ছিল, সে মানুষকে মূর্তিপূজায় বাধ্য করতো। সে অগ্নি প্রজ্বলিত করলো এবং তার পাশে একটি মূর্তি রেখে দিল। রাজকীয় ফরমান জারি হল, যে এই মূর্তি পূজা করবে সে এই অগ্নি থেকে নাজাত পাবে। এই সময় একজন মহিলাকে হাযির করা হল। তার কোলে ছিল একটি শিশু। সেই মহিলাকে বলা হল, এ মূর্তিকে সেজদা কর। কিন্তু মহিলা ছিলেন মোমেন। তাই তিনি মূর্তিকে সেজদা করতে অস্বীকৃত জানালেন। তখন তার কোলের শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হল এ আশায় যে, হয়তো স্ত্রীলোকটি তার পুত্রের প্রাণ রক্ষার্থে মূর্তিকে সেজদা করবে, কিন্তু সে তা করেনি। শিশুটিকে এরই মধ্যে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। মাতা অস্থির হয়ে পড়ে। ঠিক ঐ মুহূর্তে শিশুটি অগ্নিকুন্ড থেকে তার মাকে ডেকে বললো, হে মা! তুমিও এখানে চলে আস, বাইরে থেকে অগ্নিকুন্ড মনে হলেও এটি হল আরাম-আয়েশের স্থান। এখানে আল্লাহর রহমত প্রকাশিত হচ্ছে। ভেতরে এসে দেখ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনার রহস্য উদঘাটিত হবে। যিনি নমরুদের প্রজ্বলিত অগ্নিতে গোলাপ ফুলের বাগান পেয়েছিলেন, আমি তোমাকে আমার মাতৃত্বের দাবীতে বলছিঃ ভেতরে এসে দেখ, করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণা-ধারা কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। হে মুসলমানগণ! যেভাবেই হোক এই অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়। পুত্রের কথা শুনে মা-ও অবিলম্বে অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং চিৎকার দিয়ে বললেন, হে মুসলমানগণ! তোমরাও এ বাগানে চলে আস। একথা শ্রবণ করে মুসলমানগণ দলে দলে অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিতে শুরু করে। অবশেষে এমন অবস্থা হয় যে, প্রহরারত সৈন্যরা মানুষকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়। রাজা এ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত লজ্জিত, অপমানিত ও বিস্মিত হয়। তার ইচ্ছা ছিল যে অগ্নির ভয় দেখিয়ে মানুষকে মূর্তি পূজায় বাধ্য করবে। কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই যে সর্বত্র কার্যকর হয়, তিনি তার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিলেন, তখন সে রাগান্বিত হয়ে অগ্নিকে সম্বোধন করে বললো, হে অগ্নি! তোমার তো জ্বালাবার ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতা কোথায় গেল? হে অগ্নি! তোমাকে কেউ যাদু করেছে? আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে ঐ অগ্নি ভাষা পেল এবং আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে জালেমদেরকে জবাব দিল। মওলানা রুমীর ভাষায়ঃ

گفت آتش من ہانم آتشم = اندر آتا بہ مبنی تابشم

অগ্নি আল্লাহ পাকের হুকুমে জবাব দিল, আমি সেই অগ্নিই, আমার কোন বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়নি; তুমি ভেতরে এসে দেখ এবং আমার তাপ-মাত্রার স্বাদ গ্রহণ কর।

طبع من دیگر نگشت و عنصرم = تیغ حکم ہم بدستوری برم

আমার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাতে আদৌ কোন পরিবর্তন হয়নি, তবে আমি আল্লাহর তরবারি। যেভাবে তরবারি নিজে চলে না, বরং যার হাতে তরবারি থাকে তার তাবেদারী করে।

خاک و باد و آب آتش بندہ اند = با من و تو مردہ با حق زندہ اند

অর্থাৎ মাটি, বাতাস, পানি, আগুন সবই আল্লাহর বন্দা, আমাদের নিকট এসব মৃত, কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে জীবিত। আল্লাহ পাক অগ্নিকে আদেশ দিয়েছেন, এরশাদ হয়েছেঃ

يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

'হে অগ্নি! ইব্রাহীমের জন্যে শীতল ও আরামপ্রদ হও'।

অগ্নি আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করেছে এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে শীতল ও আরামপ্রদ হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনায় আসমান ও জমিনকে হুকুম দিয়েছেনঃ

يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ

"হে জমিন! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে লও, হে আসমান! তুমি ক্ষান্ত হও"।

আর হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনায় আল্লাহ পাক পাহাড় ও পাখিদেরকে আদেশ দিয়েছেন। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ

"হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পাখি গুলোকেও"।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, এসব বস্তু জীবিত, আল্লাহ পাকের হুকুম শ্রবণ করে এবং মেনে চলে।

হযরত মূসা (আঃ)-এর যে লাঠি ছিল, যা ফেরাউনের মোকাবেলায় বিরাট অজগরে পরিণত হয়েছিল, প্রকৃত অবস্থায় তা তো একটি কাষ্ঠখন্ডই ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তার মধ্যেই এ বিস্ময়কর পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। আজ যদি সেই লাঠিটি পাওয়া যায় তবে কি তার সে অবস্থা হবে যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর হাতে হয়েছিল? তা তো কখনও নয়। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, সৃষ্টি জগতের সমস্ত অণু-পরমাণু আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হয় সমগ্র বিশ্ব জগতে। এখানে আরো একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে অগ্নি-কুন্ডটি আল্লাহ পাকের হুকুমে গুল-বাগে পরিণত হয়েছে। এটিই ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মোজেযা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ)-এর জীবনে এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল। এটি ছিল তাঁর কারামত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে কয়েকজন মিথ্যুক লোক নবুওয়্যতের মিথ্যাদাবী করে, তন্মধ্যে অন্যতম ছিল আসওয়াদ আনাসী। সে-ও মুসায়লামাতুল কাজ্জাব গয়রহদের ন্যায় নবুওয়্যতের মিথ্যা দাবী করে। তার পথভ্রষ্ট অনুসারীরা সাহাবী হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ)-কে তার নিকট নিয়ে যায়। সে তাঁকে বলে, "তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রসূল?" তিনি বলেন, "আমি শুনি না"। অর্থাৎ আমি এ সাক্ষ্য দেই না।

আসওয়াদ আনাসী তখন রাগান্বিত হয়ে আদেশ দিল, "আগুন জ্বালাও এবং এই ব্যক্তিকে তাতে নিক্ষেপ কর"। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি-কুন্ড তৈরী করা হলো এবং হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ)-কে তাতে নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু আল্লাহ পাকের হুকুমে অগ্নি তাঁর কোন ক্ষতিই করেনি। তিনি ঐ অগ্নিকুন্ডের মধ্যে থেকেই নামায আদায় করছিলেন। এ ঘটনা দেখে আসওয়াদ আনাসী ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিল। কেননা, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই সাহাবীর জন্যে অগ্নিকে সুশীতল এবং আরামপ্রদ করে দিয়েছিলেন। হযরত আবু মুসলিম খাওলামী (রাঃ) সেখান থেকে মদীনা মোনাওয়্যারায় আগমন করেন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফাতুল মুসলেমীন ছিলেন। তিনি এমন সময় খলীফাতুল মুসলেমীনের খেদমতে উপস্থিত হলেন যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পার্শ্বে হযরত ওমর (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মুসলিম (রাঃ)-কে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং 'মারহাবা' বলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। আর তাঁর এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মধ্যে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ! মৃত্যুর পূর্বে উম্মতে মোহাম্মদিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাক এমন লোককে দেখার তৌফিক দিয়েছেন যাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হয়েছে যা' হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর সঙ্গে করা হয়েছিল"।[১]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর হিজরত

নমরুদের ঐ ঘটনার পর আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর ভ্রাতঃষ্পুত্র হযরত লুত (আঃ)-কে কাফেরদের জুলুম থেকে নাজাত দিলেন। তিনি ছিলেন তখন ইরাকে। নমরুদ ইরাকেই রাজত্ব করতো। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইরাক থেকে সিরিয়ার দিকে হিজরত করলেন। যাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাঁরাও তাঁর সাথে হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী হযরত সারা এবং ভ্রাতঃষ্পুত্র হযরত লূত (আঃ)-ও ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মোমেনদের এই দল নিয়ে ইরাক থেকে হাররানে এসে অবস্থান করলেন। কিছুদিন পর তিনি মিশর গমন করলেন। সেখান থেকে তিনি সিরিয়া গমণ করলেন এবং ফিলিস্তিনের এলাকায় বসবাস করা পছন্দ করলেন। হযরত লূত

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৫৫-৫৭

(আঃ) 'মোতাফেকা' নামক স্থানে অবস্থান করলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সেই এলাকার নবী মনোনীত করেছেন। যাহোক, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক ইরাক থেকে সিরিয়া হিজরত করেছিলেন। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর হিজরতের কথা এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

"আর আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে যাই সে-দেশে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি সমগ্র বিশ্ব-বাসীর জন্যে"।

অর্থাৎ যে জমীনে রয়েছে শস্য-শ্যামলিমা, যেখানে রয়েছে বাগ-বাগিচা, অনেক ফল-ফলারি।

জমীনকে বরকতময় আখ্যায়িত করার আরেকটি কারণ হলো সে জমীনে আল্লাহ পাক অনেক নবী প্রেরণ করেছেন।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বলেছেন, বরকতময় জমীন বলার কারণ হলো সেখানে মিষ্ট পানি পাওয়া যায় অধিক পরিমাণে।

আল্লামা বগভী (রঃ) কাতাদা (রঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)-কে বলেছিলেন, "তুমি মদীনা শরীফ কেন আস না? এটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের স্থান, আর রওজা পাকও রয়েছে এখানেই"।

হযরত কা'ব (রাঃ) বললেন, "আমীরুল মোমেনীন! আমি আল্লাহর কেতাব তৌরাতে পড়েছি সারা পৃথিবীর মধ্যে সিরিয়াতে রয়েছে আল্লাহ পাকের ভান্ডার, আর সেখানেই রয়েছে আল্লাহ পাকের বিশেষ বন্দাদের ভান্ডার"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আ'স (রা.) বলেছেন, "আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, ভবিষ্যতে হিজরত হবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর হিজরতের স্থানের দিকে"।[১]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, যারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর হিজরতের স্থানে দ্বীন আঁকড়ে ধরে রাখবে তারা পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে মর্যাদাসম্পন্ন লোক হবে (আবু দাউদ শরীফ)।

হযরত যায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'সিরিয়ার জন্যে আনন্দ'। আমি আরজ করলাম, 'কী কারণে'? তিনি এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ্‌র রহমতের ফেরেশতাগণ সেখানে ছায়া ফেলবেন' (তিরমিযী, আহমদ)।

১। তফসীরে তাবারী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৩৫

শুরাইহ এবনে ওবায়েদ বর্ণনা করেনঃ হযরত আলী (রাঃ)-এর সম্মুখে সিরিয়ার কথা উল্লেখ করা হলো এবং লোকেরা বললো, 'হে আমীরুল মোমেনীন সিরিয়ার উপর লা'নত করুন'। তিনি বললেন, 'না, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি যে সিরিয়াতে আবদালগণ থাকবেন, তাঁরা চল্লিশ জন হবেন, তাঁদের মধ্যে কারো ইন্তেকাল হলে আল্লাহ পাক তাঁর স্থলে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন। তাঁদের বরকতে বৃষ্টি হবে, আর তাঁদের কারণে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন এবং তাঁদের কারণেই আল্লাহ পাক সিরিয়াবাসীদের থেকে আযাব সরিয়ে দেবেন' (আহমদ)।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً

"আর আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক (পুত্র) এবং উপহার স্বরূপ দান করেছিলাম ইয়াকুব (পৌত্র) কে"।

বার্ধক্যাবস্থায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র সন্তানের জন্যে দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর স্ত্রী হযরত সারার বার্ধক্যাবস্থায় হযরত এছহাক (আঃ)-কে দান করেন। যে বয়সে সাধারণতঃ সন্তান হয়না সে বয়সে আল্লাহ পাক তাঁকে পুত্র সন্তান দান করলেন। এটি ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের দান, আর বাড়তি উপহার হিসাবে পেয়েছেন পৌত্র হযরত ইয়াকূব (আঃ)-কে কেননা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শুধু পুত্রই চেয়েছিলেন, আল্লাহ পাক তাঁকে পুত্রের পর পুত্রের ঔরষে পৌত্রও দান করেছেন। আর যেহেতু পৌত্রের জন্যে তিনি দোয়া করেননি, সেই জন্যে نَافِلَة (বাড়তি দান) বলা হয়েছে।

হাসান বসরী (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) এ ব্যাখ্যা করেছেন। আর তফসীরকার আতা ও মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন نَافِلَة অর্থ 'দান'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বলেছেন, نَافِلَةً হলো শুধু হযরত ইয়াকুব (আঃ)।

وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ

"আর আমি তাদের প্রত্যেককেই করেছিলাম সৌভাগ্যবান"।

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ), লূত (আঃ), এসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ)। তাঁরা সকলেই ছিলেন সৌভাগ্যবান। আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন কিছুর সঙ্গে তাঁদের মনের সম্পর্ক ছিল না, তাঁদের প্রত্যেকে যাবতীয় নৈতিক গুণে ছিলেন গুণান্বিত, তাঁরা ছিলেন পবিত্র এবং আল্লাহ পাকের জিকরে তাঁরা থাকতেন সর্বদা মুগ্ধ। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বয়স হয়েছিল ১৪৫ বছর। তিনি তাঁর পৌত্র ইয়াকুব (আঃ)-

কে দেখে গেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর পুত্র এবং পৌত্রকে নবী মনোনীত করেছেন। এসবই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের দান।[১]

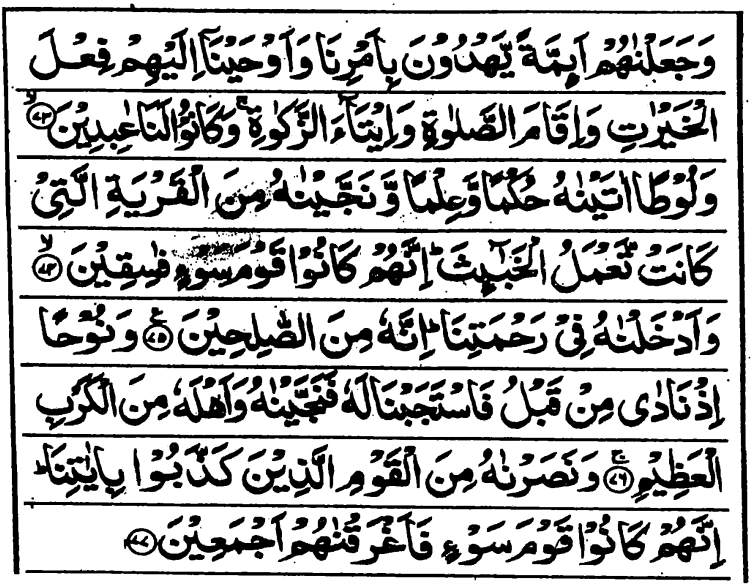

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾
وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ
كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾
وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَنُوْحًا
اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾

তরজমা

(৭৩) এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশ মোতাবেক মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো। আমি তাদেরকে সৎ কাজ করার, নামায আদায়ের এবং যাকাত প্রদান করার নির্দেশ প্রেরণ করি, তারা আমারই এবাদত করতো।

(৭৪) আর লুতকেও আমি দান করেছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে নাজাত দিয়েছিলাম এমন এক জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা অশ্লীল কর্মে লিপ্ত ছিল। ঐ জনপদবাসীরা ছিল অত্যন্ত বড় নাফরমান।

(৭৫) এবং তাকে আমি আমার রহমতের কোলে তুলে নেই। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।

(৭৬) আর স্মরণ কর নূহকে, ইতিপূর্বে যখন তিনি আমাকে ডাকেন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম (তার দোয়া কবুল করেছিলাম)। ফলে তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে আমি মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

(৭৭) এবং যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলতো, আমি তাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করি। নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত মন্দ সম্প্রদায়। এজন্যে আমি তাদের সকলকেই ডুবিয়ে মেরেছিলাম।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৮৮-৮৯
তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৯০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৫৬
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৭০-৭১

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র এসহাক (আঃ) এবং তাঁর পৌত্র ইয়াকুব (আঃ)-এর সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, তাঁদেরকে আল্লাহ পাক সৌভাগ্যবান বানিয়েছেন। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আমি তাদেরকে জাতির অগ্রনায়ক এবং নেতা মনোনীত করি এবং মানুষকে তারা আমার নির্দেশ মোতাবেক হেদায়েত করতেন। সরল সঠিক পূণ্য পন্থার পথ-নির্দেশ করতেন। সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করতেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

তাঁরা ছিলেন জাতির নেতা

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا

"এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশ মোতাবেক মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো"।

কোন কোন তফসীরকার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাঁরা শুধু যে নিজেরা আধ্যাত্মিক সাধনার সকল মঞ্জিল অতিক্রম করেছেন তাই নয়, বরং তাঁরা আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক অন্য মানুষকেও হেদায়েত করতেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার পথ অতিক্রম করতে সাহায্য করতেন অর্থাৎ তাঁরা শুধু হেদায়েত প্রাপ্ত ছিলেন না; বরং অন্যের জন্যেও ছিলেন পথ প্রদর্শক।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে ইমামতের কথা রয়েছে তার তাৎপর্য হল নবুওয়্যত, অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নবুওয়্যত দান করেছেন। ইমাম রাজী (রঃ) একথাও লিখেছেন, এ আয়াতের আরও একটি কথা হল, সত্যের প্রতি আহ্বান এবং বাতিল থেকে বিরত থাকার কাজ আল্লাহ পাকের আদেশ ব্যতীত বৈধ নয়। এজন্যে بامرنا শব্দটি সংযোজিত হয়েছে।[২]

وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ

"আমি তাদেরকে সৎ কাজ করার, নামায আদায়ের এবং যাকাত প্রদান করার নির্দেশ প্রেরণ করি আর তারা আমারই এবাদত করতো"।

এ আয়াতেও তাঁদেরকে যে নবুওয়্যত দান করা হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে। এরপর নামায কায়েম করার নির্দেশ হয়েছে। নামায হল, শারীরিক এবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম এবাদত। আল্লাহ পাকের জিকরের লক্ষ্যেই এর বিধান দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে যাকাত হল, আর্থিক এবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম। তাই যাকাত আদায়েরও নির্দেশ রয়েছে। নামায ও যাকাত উভয় এবাদতের লক্ষ্য হল, আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং আল্লাহ পাকের বন্দাদের প্রতি এহসান করা। এর দ্বারা হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল এবাদ আদায়ের তাগিদ রয়েছে।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৬৬৮

২। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৯১

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হল, তারা নেককার। বস্তুতঃ এটি হল আল্লাহ পাকের পথের সাধকদের প্রথম গুণ। এরপর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এরপর নবুওয়্যত ও রেসালত প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ

"আর তারা আমারই এবাদত করতো"।

অর্থাৎ তাঁরা শুধু আমারই বন্দেগী করতো, আর কারো নয়। আমার বন্দেগীর যে অঙ্গীকার তারা করেছিল তা তারা পূর্ণ করেছে। অথবা এর অর্থ হল, তাঁরা ছিল খাঁটি তৌহীদবাদী। আর আল্লাহ পাকের এবাদতে তারা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), তাঁর পুত্র, পৌত্র ইতিপূর্বে যাদের উল্লেখ রয়েছে তারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতেন। তাঁরা যাবতীয় গুণাবলী অর্জন করেছিলেন। তাঁরা যেমন ছিলেন এলমের ব্যাপারে পরিপূর্ণ তেমনি আমলের ব্যাপারেও ছিলেন পরিপূর্ণ আন্তরিক।[১]

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ

"আর লূতকেও আমি দান করেছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে নাজাত দিয়েছিলাম এমন এক জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা অশ্লীল কার্যে লিপ্ত ছিল। ঐ জনপদবাসীরা ছিল অত্যন্ত নাফরমান"।

হযরত লূত (আঃ)-সম্পর্কীয় বর্ণনা এ পর্যায়ের তৃতীয় ঘটনা। এরশাদ হয়েছেঃ আমি লূতকে দান করেছি জ্ঞান-মনীষা, বিচার-বুদ্ধি তথা এল্‌ম এবং হেকমত।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এর তাৎপর্য হলো 'নবুওয়্যত'; অর্থাৎ আমি তাকে নবুওয়্যত দান করেছি এবং তাকে নাজাত দিয়েছি সেই জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা অশ্লীল অপকর্মে লিপ্ত ছিল। আলোচ্য আয়াতের قرية (জনপদ) দ্বারা 'সাদুম' নামক বস্তি এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[২]

লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাদের অশ্লীল অপকর্ম সমকামিতা ছাড়াও আরো অনেক অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত ছিল। যেমনঃ ডাকাতি, রাহজানি, কবুতর-বাজি, গান-বাজনা, মদ্যপান, দাড়ি কামানো, মোচ বাড়ানো, তালি বাজানো, রেশমী কাপড় পরিধান করা প্রভৃতি।

১। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৬৪৫

২। হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের অশ্লীল অপকর্মের বিবরণ জানার জন্যে তফসীরে নূরুল কোরআনের ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১৩-১৪ দ্রষ্টব্য।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় সমকামিতার ন্যায় অশ্লীল কু-কর্ম সহ এই সব অন্যায়-অনাচারের কারণে ধ্বংস হয়েছে।[১]

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَٰسِقِينَ

"নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত নাফরমান সম্প্রদায়"।

وَأَدْخَلْنَٰهُ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

"আর আমি লূতকে আমার রহমতের কোলে আশ্রয় দিয়েছি। নিশ্চয় সে ছিল সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত"।

অর্থাৎ যখন হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাদের জঘন্য আচরণের শাস্তি স্বরূপ ধ্বংস হয়, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে রক্ষা করেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো হযরত লূত (আঃ) সে সব ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের তকদীরে আল্লাহ পাক কল্যাণ লিখে দিয়েছেন, তাই তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে রহমত এর তাৎপর্য হলো 'নবুওয়্যত' অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁকে নবুওয়্যত দান করেছেন এবং স্বীয় রহমতের কোলে স্থান দিয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'রহমত' অর্থ হলো 'সওয়াব' অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁকে সওয়াব দান করেছেন–তথা উচ্চ মরতবায় ভূষিত করেছেন।[৩]

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ

আর স্মরণ কর নূহকে, ইতিপূর্বে যখন তিনি আমাকে ডাকেন, আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম (তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম)। ফলে তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আমি মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

অর্থাৎ হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! নূহ (আঃ)-এর ঘটনা স্মরণ করুন। উপরোল্লিখিত নবী রসূলগণের পূর্বে আমি নূহকে জ্ঞান ও মনীষা, এলম ও হেকমত-তথা নবুওয়্যত দান করেছিলাম। কিন্তু যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করলো এবং তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করলো তখন সে আমাকে ডাকলো, আমার নিকট দোয়া করলো। আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং তাঁকে ও তাঁর সাথী মোমেনদেরকে নাজাত দিলাম মহা বিপদ থেকে।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৫৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৭২

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৯০

৩। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৯২

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এই "মহা বিপদ" এর ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর সম্প্রদায়ের নির্যাতন থেকে আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ প্রলয়ংকরী বন্যা থেকে আল্লাহ পাক তাঁকে এবং তাঁর মোমেন সাথীদেরকে রক্ষা করেছেন।

হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি যে নির্যাতন হয়েছিল

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাধিক বয়স পেয়েছিলেন হযরত নূহ (আঃ) (১০৫০ বছর)। আর তিনি অনেক কষ্টও ভোগ করেছেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি যে অকথ্য নির্যাতন করা হত তার বিবরণ দিয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)। হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় শুধু যে তাঁকে অমান্য করতো এবং মিথ্যাজ্ঞান করতো তাই নয়; বরং তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতনও করতো। তাঁকে প্রহার করতো। আর এত বেশী প্রহার করতো যে, তারা তাঁকে মৃত মনে করে ফেলে দিয়ে চলে যেত। কিন্তু দ্বিতীয় দিন তিনি পুনরায় বের হতেন এবং মানুষকে এক আল্লাহ পাকের বন্দেগীর জন্যে আহ্বান করতেন। মোহাম্মদ এবনে এসহাক বর্ণনা করেন, ওবায়দ এবনে ওমর লাইসী বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি যে, দূরাত্মা কাফেররা হযরত নূহ (আঃ)-এর গলা টিপে তাঁকে শ্বাস রুদ্ধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করতো। তিনি ঐ অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসতো তখন তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন, তারা জানেনা"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, ইতিপূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছিলেন আরব জাতির পিতা। এরপর আলোচ্য আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-এর কথার উল্লেখ রয়েছে। তিনি ছিলেন মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা। কেননা, আদি পিতা হলেন হযরত আদম (আঃ)। হযরত নূহ (আঃ)-এর বদ দোয়ার কারণে আল্লাহ পাক তদানীন্তন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ধ্বংস করেন, শুধু তাদেরকে রক্ষা করেন যারা হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ পাকের হুকুমে তিনি যে তরী নির্মাণ করেন তাতে যারা আরোহণ করে। পরে তারাই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। তাই হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধরগণই ছিলেন তখন পৃথিবীর অধিবাসী। আর তাদের থেকেই মানব বংশ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।[১]

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ

إِذْ نَادٰى

যখন নূহ (আঃ) আল্লাহ পাককে ডাক দিয়েছিলেন, অর্থাৎ যখন তাঁর জাতির বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেছিলেন বা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে আরজী পেশ করেছিলেন যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

'হে প্রতিপালক! আমি আর পারিনা, আমাকে সাহায্য কর'।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৭২-৭৩

আর অন্য আয়াতে তাঁর দোয়ার উল্লেখ এভাবে রয়েছেঃ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

'হে প্রতিপালক! পৃথিবীতে একটি কাফেরকেও বাকি রেখোনা'।

আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-এর দোয়া কবুল করেছেন। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ

"আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, ফলে তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে আমি মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম"।

আর পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ

"এবং যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলতো আমি তাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করি, নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত মন্দ সম্প্রদায়, এজন্যে আমি তাদের সকলকেই ডুবিয়ে মারি"।

আল্লামা বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন। কেননা, তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছিল এবং সর্বদা মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল। পৃথিবীতে যে জাতির মধ্যে এহেন দোষ পাওয়া যায় আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেন।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমেই তাঁর জাতির বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন।

আবু উমামা (রাঃ) বলেছেন, হযরত আদম (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ) যে আক্ষেপ এবং দুঃখ করেছেন, পৃথিবীতে আর কেউ তা করেনি। হযরত আদম (আঃ)-এর আক্ষেপ ছিল, ইবলিসের প্ররোচনায় পড়ার জন্য। আর হযরত নূহ (আঃ) আক্ষেপ করেছিলেন তাঁর জাতির বিরুদ্ধে বদদোয়া করার কারণে। আল্লাহ পাক তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে, আক্ষেপ করোনা, তোমার বদদোয়া আমার নির্ধারিত তকদীর মোতাবেকই হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৯১

وَدَاوٗدَ
وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ
الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ
وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۚ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ
يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ
لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ
شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖٓ
اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾

তরজমা

(৭৮) আর স্মরণ কর দাউদ এবং সুলায়মানের কথা যখন তারা বিচার করছিল একটি শস্য-ক্ষেত্র সম্পর্কে যাতে রাত্রিকালে অন্য সম্প্রদায়ের ছাগল প্রবেশ করেছিল, আমি তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম।

(৭৯) তখন আমি সুলায়মানকে ঐ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আর তাদের প্রত্যেককে আমি দান করেছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং পাহাড় আর পক্ষীগুলোকে আমি দাউদের বশ করে দেই যেন তারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর আমিই ছিলাম এসব কিছুর কর্তা।

(৮০) আর আমি তাকে (দাউদকে) তোমাদের জন্যে বর্ম তৈরী করা শিক্ষা দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে রণাঙ্গনে রক্ষা করতে পারে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?

(৮১) আর সবেগে প্রবাহিত বাতাসকে আমি সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম; তা তার আদেশক্রমে সে-দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যেখানে আমি বরকত রেখেছি, আর আমি সব বিষয়ের খবর রাখি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ পর্যায়ের পঞ্চম ঘটনার বিবরণ রয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ)-এর পুত্র ছিলেন হযরত সুলায়মান (আঃ)। তাঁরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। নবুওয়্যত

এবং বাদশাহাত উভয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক তাঁদেরকে দান করেছিলেন। আমিরী এবং ফকিরী একত্রিত হয়েছিল তাঁদের মাঝে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর বাদশাহাতের একটি নমুনা ছিল। হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সুলায়মান (আঃ) নবী ছিলেন এবং আল্লাহ পাকের খলীফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। আর হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) নবী ছিলেন না, তবে শীর্ষ স্থানীয় ওলী ছিলেন এবং খাতেমুন্নাবিয়্যীন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খলীফা ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁদের উভয়কে অসাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেছিলেন। বিশেষতঃ হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে অতি শৈশবেই যে সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা দান করেছেন তা তখনই মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করতো। আলোচ্য আয়াত সমূহে এ ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ

"আর স্মরণ কর দাউদ এবং সুলায়মানের কথা যখন তারা বিচার করছিল একটি শস্য-ক্ষেত্র সম্পর্কে"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অধিকাংশ তফসীরকারগণের মত হলোঃ ঐ ক্ষেত্রটি ছিল আঙ্গুরের। আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, তা ছিল শস্যক্ষেত্র।

একটি ঘটনা

আল্লামা বগভী (রঃ) এ ঘটনার বিবরণ এভাবে দিয়েছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা (রঃ) এবং জুহরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, দু' ব্যক্তি হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট হাযির হলো। একজন শস্য ক্ষেত্রের মালিক, আর একজন বকরীর মালিক। হযরত দাউদ (আঃ)-এর আদালতে শস্যক্ষেত্রের মালিক এ মামলা দায়ের করে যে, রাত্রিকালে এ ব্যক্তির ছাগল আমার ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ) লক্ষ্য করলেন, যে ফসল বিনষ্ট হয়েছে আর যে ছাগল বিনষ্ট করেছে উভয়ের মূল্য সমান সমান। তখন হযরত দাউদ (আঃ) ঐ মামলায় রায় দিলেনঃ ফসলের মালিককে ক্ষতি-পূরণ দিতে হবে। ফসল বিনষ্টকারী ছাগলগুলো ফসলের মালিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে লাভ করবে। তাই হযরত দাউদ (আঃ) আদেশ জারি করলেন যে, ফসলের মালিককে বকরীগুলো দিয়ে দেয়া হোক।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট থেকে তারা উভয়ে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর নিকট আসলো। হযরত সুলায়মান (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের বিচারের ফয়সালা কি হলো"? হযরত দাউদ (আঃ)-এর ফয়সালা তারা বর্ণনা করলো। হযরত সুলায়মান (আঃ) বললেন, "যদি তোমাদের বিচারের দায়িত্ব আমার উপর দেয়া হতো তবে ফয়সালা অন্য রকম হতো"।

একটি বর্ণনা এমন পাওয়া যায় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) একথাও বলেছিলেনঃ 'আমার ফয়সালা উভয়ের জন্যে উপকারী হতো'। হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর একথা হযরত দাউদ (আঃ) জানতে পারলেন। তখন হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে তিনি বললেন, তুমি মীমাংসা কর।

আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর নবুওয়্যত ও পিতৃত্বের দাবীর কথা উল্লেখ করে বললেন, আমাকে বল, সেই সিদ্ধান্ত কি? যা উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হবে। হযরত সুলায়মান (আঃ) বললেন, বকরীগুলো শস্য ক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। আর শস্য ক্ষেত্রটি বকরীর মালিককে সোপর্দ করুন। জমিনের মালিক বকরীর দুধ, পশম এবং তার বংশ দ্বারা ততদিন পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকুক যতদিন শস্য ক্ষেত্রটি বকরীর মালিকের নিকট থাকে। আর বকরীর মালিক শস্য ক্ষেত্রটিকে তৈরী করে সেখানে বীজ বপন করুক। যখন ফসল তৈরী হয়ে প্রকৃত অবস্থায় ফিরে আসবে তখন শস্য ক্ষেত্রটি তার মালিককে ফেরত দেয়া হবে। আর বকরীর মালিক তার বকরী ফেরত নেবে। হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, এটিই সঠিক সিদ্ধান্ত যা তুমি করেছ।[১]

বর্ণিত আছে যে, এই মীমাংসা করার সময় হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর বয়স ছিল মাত্র এগার বছর। এবনে আবি শায়বা, এবনুল মুনজের এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সিদ্ধান্ত ছিল পারস্পরিক মীমাংসার ভিত্তিতে। আর হযরত দাউদ (আঃ)-এর মীমাংসা ছিল আদেশ। পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা আদেশের চেয়ে উত্তম।

আর একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলায়মান (আঃ) উভয়ের সিদ্ধান্তই ওহীর ভিত্তিতে করা হয়েছে। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সিদ্ধান্ত ছিল রহিতকারী, যার দ্বারা হযরত দাউদ (আঃ)-এর সিদ্ধান্তকে রহিত করা হয়েছে। এই মত তাদের যারা বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্য এজতেহাদের মাধ্যমে কোন আদেশ দেয়া বৈধ নয়। কেননা তাঁদের নিকট ওহী আসে। তাদের এজতেহাদের কোন প্রয়োজনই নেই। কেননা, এজতেহাদে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর আম্বিয়ায়ে কেরাম দ্বারা ভুল হওয়া সম্ভব নয়।

তবে প্রকাশ্য মত হল এই, হযরত দাউদ (আঃ) ও সুলায়মান (আঃ) উভয়ের সিদ্ধান্তই এজতেহাদের ভিত্তিতে ছিল। হযরত দাউদ (আঃ)-এর এজতেহাদ নির্ভুল ছিলনা। আর হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর এজতেহাদ সঠিক ছিল। কেননা, আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন। আর আম্বিয়ায়ে কেরামের এজতেহাদে ভুল হতে পারে, কিন্তু তাঁরা সেই ভুলের উপর কায়েম থাকেন না; বরং ভুল সম্পর্কে যখন তাঁরা অবগত হন তখন তাঁরা সঠিক মত গ্রহণ করেন এবং পূর্ববর্তী মত বর্জন করেন।

وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا

"আর আমি প্রত্যেককে হেকমত এবং এলম দান করেছি"। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, পিতা হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর পুত্র হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর রায়কে মেনে নিলেন। আর উভয়ের রায় আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য ছিল। তবে তিনি হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর প্রশংসা করেন এই কথা বলে,

---

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৯৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৯৬
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৭৪

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ

অর্থাৎ 'আমি সুলায়মানকে উক্ত ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছি'। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا

'আমি উভয়কে জ্ঞান এবং মনীষা দান করেছি'।

আল্লাহ পাক এভাবে তাদের উভয়ের প্রশংসা করেছেন। হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি, কোন বিচারক এজতেহাদ করার পর যখন সিদ্ধান্ত করে, আর সিদ্ধান্ত বরহক হয়, তখন তার দ্বিগুণ সওয়াব হয়। পক্ষান্তরে, যদি এজতেহাদে ভুল হয়, তবে একটি সওয়াব হয়। (বোখারী, মুসলিম)

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মুজতাহেদের দ্বারা কখনও ভুল হয়, আর কখনও সিদ্ধান্ত সঠিকও হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত না হলেও তার সওয়াব এজন্যে হয় যে তিনি সত্য উদঘাটনের জন্যে সাধনা করেছেন এবং বিষয়টির উপর গবেষণা করেছেন। আর ইসলামী শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে এজতেহাদ তথা সত্যের অনুসন্ধানে সাধনা এবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর বিচার

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ দুজন স্ত্রীলোক ছিল, তাদের প্রত্যেকের একটি করে শিশু ছিল। হঠাৎ বাঘ এসে একটি শিশুকে নিয়ে যায়। তখন একটি স্ত্রীলোক দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে বলে, বাঘ তোমার শিশুটিকে নিয়ে গেছে, আমার শিশু নিরাপদ রয়েছে। এটি আমার। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিও বলে, এটি আমার। এ মোকদ্দমা নিয়ে হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট উভয়ে হাযির হল। তিনি উভয়ের মধ্যে যে বড় ছিল তাকে শিশুটি দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন। আর যে ছোট ছিল সে হেরে গেল। এরপর তারা হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলো। তিনি তৎক্ষণাত একটি ছুরি আনয়নের আদেশ দিলেন এবং বললেন, আমি শিশুটিকে সমান ভাগ করে তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দেব। একথা শ্রবণ করা মাত্রই যে স্ত্রীলোকটি হেরে গিয়েছিল সে বললো, 'শিশুটি আপনি তাকেই দিয়ে দিন, সে জীবিত থাকলে আমি তাকে অন্ততঃ দেখতে পাব। আল্লাহ পাক আপনার প্রতি রহমত নাযিল করুন'। হযরত সুলায়মান (আঃ) শিশুটি ছোট স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে দিলেন।[১]

وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৯২-৯৭
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-২২-২৩

পাহাড় এবং পাখীরাও আল্লাহর জিকর করতো

"এবং পাহাড় আর পাখিগুলোকে আমি দাউদের বশ করে দেই, যেন তারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর জিকর করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন। তাঁর দেহে যে ক্লান্তি অনুভব করতেন তা দূরীভূত করার জন্যে আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা করেছিলেন যে, তাঁর জিকরের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়- পর্বত এমনকি আকাশে উড়ন্ত পাখীরাও তাঁর জিকরের সঙ্গে আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল হতো। তাদের জিকর শ্রবণ করলে তাঁর ক্লান্তি দূর হয়ে যেতো। তিনিও পূর্ণোদ্যমে পুনরায় জিকর শুরু করতেন। তফসীরকারগণ বলেছেন, পাখীদের রসনা আছে তাই তাদের জিকর করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রকাশ্যে পাহাড়ের কোন রসনা নেই, তাই পাহাড়ের জিকর সত্যিই বিস্ময়কর। আর এজন্যে আলোচ্য আয়াতে الطَّيْرَ বা পাখীর পূর্বে الْجِبَالَ বা পাহাড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াহাব (রঃ) বলেছেন, হযরত দাউদ (আঃ) যখন আল্লাহ পাকের নামের তসবীহ পাঠ করতেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ও আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করতো, আর পাখীদেরও একই অবস্থা ছিল।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো হযরত দাউদ (আঃ) যখন নামায আদায় করতেন তখন পাহাড়ও তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করতো।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত দাউদ (আঃ) বৃক্ষরাজি এবং পাথর সমূহের তসবীহ বুঝতেন। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ হযরত দাউদ (আঃ) যখন চলতেন তখন পাহাড়ও তাঁর সাথে চলমান হতো।

এসব কিছু নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত দাউদ (আঃ) এবং সুলায়মান (আঃ)-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কথা একত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত দাউদ (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ তিনি যখন আল্লাহর জিকর করতেন তখন জমিনে স্থাপিত পাহাড় ও আকাশে উড়ন্ত পাখীরা তাঁর সঙ্গে আল্লাহ পাকের নামের তসবীহ পাঠ করতো। এর দৃষ্টান্ত হলো এই, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতের মুঠোয় সংরক্ষিত পাথর খন্ড আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করেছিল, আর উপস্থিত লোকেরা তাদের তসবীহ শ্রবণ করেছিল। অবশ্য ইয়াইয়া এবনে সালাম বলেছেন যে, এ তসবীহ শুধু হযরত দাউদ (আঃ)-ই শ্রবণ করতেন। আর কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে সকলেই শ্রবণ করতো।[১]

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যেহেতু আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে অত্যন্ত মধুর কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন এজন্যে যখন তিনি মনের প্রেরণায় যবুর কিতাব পাঠ করতেন অথবা আল্লাহ পাকের নামের তসবীহ পাঠ করতেন তখন পাহাড়-পর্বত এমনকি, আকাশের পাখীগুলো পর্যন্ত সমস্বরে তাঁর সঙ্গে

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৭৬

সঙ্গে তসবীহ পাঠে রত হতো। আর এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই এজন্যে যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর হোক অথবা পাহাড়-পর্বতের তসবীহ পাঠ করা হোক সবই আল্লাহ পাকের অপূর্ব কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন এবং তাঁর মর্জির বহিঃপ্রকাশ।[১]

আল্লাহ পাক পাহাড়-পর্বতকে হযরত দাউদ (আঃ)-এর বশীভূত করে দিয়েছিলেন এবং তারা হযরত দাউদ (আঃ)-এর সাথে তসবীহ পাঠ করতো। এমনিভাবে পাখীদেরকেও হযরত দাউদ (আঃ)-এর অনুগত করে দিয়েছিলেন। তারাও সরবে তাঁর সাথে তসবীহ পাঠ করতো। এসব ছিলো হযরত দাউদ (আঃ)-এর মোজেযা। তাঁকে আল্লাহ পাক অসাধারণ মধুর স্বর দিয়েছিলেন, এটি ছিল তাঁর অন্যতম মোজেযা। তিনি যখন যবুর পাঠ করতেন তখন পশু-পক্ষী, মানব-দানব, জীব-জন্তু সবই একত্রিত হতো তাঁর কণ্ঠে যবুর শ্রবণের জন্যে, এটিও ছিল তাঁর মোজেযা। আর এসবই আল্লাহ পাকের হুকুমে এবং তাঁর কুদরতে হতো।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মোজেযা নবীর কাজ নয়; বরং আল্লাহ পাকের কাজ। আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করতে পারেন। নবীর মাধ্যমে যখন কোন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তাকে মোজেযা বলা হয়। আর এমনিভাবে কোন ওলী আল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত অলৌকিকভাবে প্রকাশিত হলে তাকে কারামত বলা হয়।[২]

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ

'আর আমি তাকে (দাউদকে) বর্ম তৈরী করা শিক্ষা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে রণাঙ্গনে রক্ষা করতে পারে'।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে এমন অলৌকিক শক্তি দান করেছিলেন যে লোহা তাঁর হাতে মোমের মত নরম হয়ে যেতো। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতের কামাই খেতেন অর্থাৎ তাঁর কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে যা রোজগার করতেন তা দ্বারাই তাঁর আহার্য সংগ্রহ করা হতো। তিনি স্বহস্তে লৌহ বর্ম তৈরী করতেন; যা দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হতো। বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি এমনি লৌহ-বর্ম তৈরী করেছিলেন। লোহা নরম হওয়া অর্থাৎ এমনি আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এটিও ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর মোজেযা। আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতিকে আত্মরক্ষা করার এ শিক্ষা দিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ। তাই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। এজন্যেই এরশাদ হয়েছেঃ

فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ

'তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে না'?

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৪৫০

২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৬১

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا

"আর সবেগে প্রবাহিত বাতাসকে আমি সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তাঁর আদেশক্রমে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যেখানে আমি বরকত দান করেছিলাম"।

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত দাউদ (আঃ)-এর মোজেযা সম্পর্কে উল্লেখ ছিলো। আর এ আয়াতে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর মোজেযার বর্ণনা রয়েছে। হযরত সুলায়মান (আঃ) মহান আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়া করেছিলেনঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমাকে এমন রাজত্ব দান কর যেন আমার পর কেউ এমন রাজত্ব লাভ করতে না পারে'। আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর এ দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে এমনি রাজত্ব দান করলেন। মানুষের উপর তাঁর রাজত্ব ছিল, এতদ্ব্যতীত আল্লাহ পাক বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। জ্বীন জাতিকেও আল্লাহ পাক তাঁর বশীভূত করে দিয়েছিলেন।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন যে পাহাড়-পর্বত এবং পাখিরা যা হযরত দাউদ (আঃ)-এর সঙ্গে তসবীহ পাঠ করতো তা হযরত দাউদ (আঃ)-এর আদেশক্রমে করতো না, বরং সরাসরি আল্লাহ পাকের নির্দেশ-ক্রমেই করতো। এজন্যে وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ বলা হয়েছে।

অর্থাৎ مَعَ শব্দটি সংযোজিত হয়েছে কিন্তু বাতাস হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর নির্দেশ মেনে চলতো, সেজন্যে সুলায়মান শব্দটির পূর্বে "লাম" অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পাক বাতাসের উপর ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক বাতাস সবেগে বা ধীরে ধীরে চলতো। হযরত সুলায়মান (আঃ) একটি বিরাট সিংহাসন তৈরী করেছিলেন। এ সিংহাসনে তাঁর সঙ্গে তাঁর সভাসদগণও বসতেন এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সঙ্গে রাখতেন। বাতাস এ সিংহাসনটিকে ইয়ামন থেকে সিরিয়া পৌঁছে দিতো। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, এতে ব্যয় হতো মাত্র দু' ঘন্টা সময়।

এ যুগের মানুষ উড়োজাহাজে বিশ্বময় ঘুরে বেড়ায়। তাই হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ পাক যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

আলোচ্য আয়াতে যে বরকতময় জমীনের কথা বলা হয়েছে তা হলো সিরিয়া। হযরত সুলায়মান (আঃ) স্বদেশ থেকে সিরিয়া রওয়ানা হতেন সকালে আর বিকালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতেন। তাঁর এই উড়োজাহাজে কোন জ্বালানীর প্রয়োজন হতো না, দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার আশঙ্কা থাকতো না, এমনকি যে কোন স্থানে অবতরণ করতে পারতো। এসবই ছিলো হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৯৮

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ

'আর আমি এসব বিষয়ের খবর রাখি'।

অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আঃ) যে এসব নেয়ামতের যোগ্য একথা আল্লাহ পাক জানতেন। এসব বিশেষ দান এবং অলৌকিক ক্ষমতা পেয়ে তিনি যে অহংকারী হবেন না, বরং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞ থাকবেন একথা আল্লাহ পাকের জানাই ছিল। আর কাকে কোন্ বৈশিষ্ট্য দান করবেন, আর কে কোন্ দানের যোগ্য এসব বিষয় আল্লাহ পাক উত্তমভাবে অবগত।

তফসীরকারগণ বলেছেন, বাতাসকে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর অনুগত করার উদ্দেশ্য ছিলো তিনি যেন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মাথা নত করে রাখেন এবং সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞ থাকেন। ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (র.) বলেছেন, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর মজলিসে পাখীরা ছড়িয়ে থাকতো, জ্বীনেরা কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর ঐ শান-শওকতের মধ্যে তিনি আগমন করতেন এবং তাঁর সিংহাসনে আসন গ্রহণ করতেন। হযরত সুলায়মান (আঃ) বীর মুজাহেদ ব্যক্তি ছিলেন। পৃথিবীর কোন অংশে যদি কোন রাজা-বাদশাহ্র অস্তিত্বের খবর পৌঁছতো, তখন তিনি সেখানে পৌঁছে যেতেন এবং সেই রাজাকে তাঁর প্রতি অনুগত হতে বাধ্য করতেন।

হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর আকাশ ভ্রমণ

বর্ণিত আছে, তিনি যখন জেহাদের ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর সিংহাসন সুসজ্জিত করা হতো। তার উপর তাঁবু টানানো হত। এরপর সৈন্য-সামন্ত, খাদেম-খেদমতগার এবং প্রয়োজনীয় জীব-জন্তু, যুদ্ধাস্ত্র সব সঙ্গে নেয়া হতো। এরপর বাতাস সব কিছুকে উপরে উঠিয়ে নিত এবং তাঁর সিংহাসনকে উড়িয়ে নিয়ে যেতো। আর ঐ বাতাসের কারণে বালু উড়তো না, বৃক্ষের পাতাও নড়তো না, কোন পাখীরও কষ্ট হতো না। অথচ তাঁর এ সফর এত দ্রুত হতো যে, সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করা হতো।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে জ্বীনেরা স্বর্ণ ও রেশমের তার দিয়ে একটি অতি সুন্দর ফরাশ তৈরী করেছিল, যার দৈর্ঘ এক মাইল ও প্রস্থ এক মাইল ছিল। তার মধ্যস্থলে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে সোনালী সিংহাসন স্থাপন করা হতো, তিনি তার উপর আসন গ্রহণ করতেন। ঐ সিংহাসনের চার পার্শ্বে রূপালী চেয়ার থাকতো। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) সোনালী চেয়ারের উপর, আর ওলামায়ে কেরাম রূপালী চেয়ারের উপর উপবিষ্ট হতেন। তাঁদের উপরে পাখীরা ডানা মেলে ছায়া দিত, যেন রৌদ্রের তাপ কারো কষ্টের কারণ না হয়। আলেমদের আসনের পর অন্য লোকেরা বসতো এবং মানুষের পর জ্বীন জাতি কাতার বন্দী হয়ে দন্ডায়মান থাকতো, বাতাস ঐ ফরাসকে এবং ফরাসের উপর যারা থাকতো সকলকে উপরে উঠিয়ে নিত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এক এক মাসের পথ অতিক্রম করতো।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে ছয় লক্ষ চেয়ার রাখা হত। প্রথম কাতারে মানুষ বসতো, আর মানুষের পেছনে বসতো জ্বীনেরা, আর পাখীরা উপরে ছায়া করে রাখতো, আর বাতাস সকলকে উঠিয়ে নিত।

হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেন, একবার হযরত সুলায়মান (আঃ) অশ্বগুলো পরিদর্শন করছিলেন যে কারণে আসরের নামায বিনষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়ে সমস্ত ঘোড়া হত্যা করেছিলেন। এরপর আল্লাহ পাক তাঁকে ঐ ঘোঁড়াগুলোর বদলে তার চেয়ে উত্তম ঘোড়া দান করেছিলেন। তাঁর আদেশ মোতাবেক বাতাস তার গতি বাড়াতো বা কম করতো। সকালে তিনি "এলইয়া" নামক স্থান থেকে রওয়ানা হতেন। "এসতাখার" নামক স্থানে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। বিকালে এসতাখার থেকে তিনি সিরিয়া পৌছতেন। এবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন, তাঁর সিংহাসনটির এক হাজার পায়া ছিল। তাঁর সাথে জ্বীন ও মানুষ আরোহণ করতো। আর প্রত্যেক পায়া একটি জ্বীন বহন করতো। বাতাস ঐ সিংহাসনটি উড়িয়ে নিয়ে যেত। তিনি তাঁর সৈন্য-সামন্তের দল নিয়ে হঠাৎ করে কোন স্থানে উপস্থিত হতেন। লোকেরা এ সম্পর্কে কিছুই জানত না।

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত সুলায়মান (আঃ) ইরাক থেকে সকালে রওয়ানা হন, দ্বিপ্রহরে মরওয়া নামক স্থানে পৌছেন। এরপর আসরের নামায পড়েন বলখে। বলখ থেকে রওয়ানা হয়ে তুর্কস্থানে পৌছেন। তুর্কস্থান থেকে সফর করে চীনে উপস্থিত হন। এ সুদীর্ঘ সফর বাতাসের কাঁধে আরোহণ করে সম্পূর্ণ করেন। ঐ সময় পাখিগুলো তাঁর উপর ছায়া করতে থাকে। সকালে এক মাসের সফর এবং বিকালে অনুরূপ দূরত্ব অতিক্রম করতেন। এভাবে তিনি একবার পূর্ব দিকে সফর আরম্ভ করে, কান্দাহার (আফগানিস্তান), মোকরান ও কারমান পৌছেন। কারমান থেকে পারশ্য দেশে পৌছেন। সেখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি সিরিয়ায় পৌছেন। তাঁর অবস্থান ছিল তাদাম্মর নামক শহরে। সিরিয়া থেকে ইরাকের দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তিনি জ্বীনদেরকে একটি ইমারত নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। জ্বীনেরা পাথর দ্বারা ঐ ইমারত নির্মাণ করেছিল।[১]

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا
دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى
رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾
فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَ
مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾
وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۭ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾
وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৬২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-২৪-২৫
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫৮

তরজমা

(৮২) আর শয়তানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তার জন্যে ডুবুরীর কাজ করতো, এতদ্ব্যতীত আরও বহু কাজ করতো। আমি তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।

(৮৩) আর স্মরণ কর আইয়ুবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর তুমি দয়ালুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(৮৪) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম। আর তাকে তার পরিবার-পরিজন ফেরত দিয়েছিলাম এবং তাদের সাথে অনুরূপ আরও অনুগ্রহ করেছিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ, যারা বন্দেগী করে তাদের জন্যে এটি হল নসিহত।

(৮৫) আর স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদ্রিস এবং জুলকিফলের কথা। তাদের প্রত্যেকেই ছিল সবর অবলম্বনকারী।

(৮৬) আর আমি তাদেরকে আমার রহমতের কোলে গ্রহণ করি, নিশ্চয় তারা ছিল সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর বিশেষ কয়েকটি মোজেযার উল্লেখ ছিল। যেমন বাতাসকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়েছিল এবং পাখিগুলোও তাঁর অনুগত ছিল। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, জ্বীন জাতিকেও আল্লাহ পাক তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি জ্বীনদের দ্বারা অনেক কাজ নিতেন। তারা হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক ডুবুরীর কাজ করতো। তারা সমুদ্র-গর্ভ থেকে তাঁর জন্যে মনি-মুক্তা আহরণ করে আনতো। তামা দ্বারা বড় বড় ডেকচি তৈরী করে দিত এবং এই জ্বীনদের দ্বারাই তিনি বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করতেন। তাঁর নির্দেশ-ক্রমে জ্বীনেরা ভারী আসবাব পত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতো। এ যুগে বস্তুগত শক্তি দ্বারা যা করা হচ্ছে আল্লাহ পাক সে যুগে আধ্যাত্মিক শক্তি বলে জ্বীনদের দ্বারা তাই করিয়ে দিতেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ

'আর শয়তানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তার জন্যে ডুবুরীর কাজ করতো। এতদ্ব্যতীত আরও বহু কাজ করতো'।

আলোচ্য আয়াতে الشَّيٰطِيْنِ শব্দ দ্বারা উদ্ধত প্রকৃতির জ্বীন সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। জ্বীন সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে দুর্ধর্ষ সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদেরকে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর অনুগত করে দিয়েছেন। আকাশচুম্বি ইমারত সমূহ নির্মাণে তাদেরকে ব্যবহার করা হতো।

وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ

"আমি তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম", যেন তারা অবাধ্য না হয়।

জুযায (রঃ) বলেছেন, আমি তাদের উপর সতর্ক সৃষ্টি রাখতাম যেন তারা নির্মিত বস্তু সমূহ ধ্বংস না করতে পারে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত সুলায়মান (আঃ) যখন কোন জ্বীনকে কোন কোন মানুষের কাছে প্রেরণ করতেন তখন মানুষকে বলতেন, যখন জ্বীন সেই কাজ শেষ করে ফেলবে, তখন তুমি তাকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখবে, এমন যেন না হয় যে সে যা কাজ করে তা ধ্বংস না করে বসে। কেননা, জ্বীনদের এ অভ্যাস ছিল যে যখন কোন কাজ থেকে অবসর হত, তখন যদি অন্য কাজে মশগুল না হয় তবে যে কাজটি করেছিল তা-ই ধ্বংস করে দেয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলোচ্য বাক্যাংশের এ অর্থ লিখেছেন, "আমি জ্বীনদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম", যেন তারা সুলায়মান (আঃ)-এর ক্ষতি না করতে পারে, এজন্যে আমি তাদের থেকে সুলায়মানকে রক্ষা করতাম এবং জ্বীনদেরকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম। কোন দুর্ধর্ষ জ্বীন তাঁর কাছেও আসতে পারতো না। অথচ তাঁর রাজত্ব ছিল জ্বীনদের উপর, যাকে ইচ্ছা তাকে বন্দী করতেন যাকে ইচ্ছা তাকে মুক্ত করতেন।

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

"আর স্মরণ কর আইয়ুবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলেছিল, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে, আর তুমি দয়ালুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর মোজেযা সমূহের উল্লেখ ছিল। এ আয়াত থেকে হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আইয়ূব (আঃ)-কে আল্লাহ পাক কঠিন বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। এ পরীক্ষা ছিল সবরের, আর এ সবরই ছিল তাঁর মোজেযা।

তফসীরকারগণ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, যাতে করে তাঁর সবরের মহান শিক্ষা গ্রহণ ও বরণ করা সম্ভব হয়।

হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর বংশ পরিচয়

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, তিনি ছিলেন আইয়ুব এবনে আহরাম এবনে রাজেখ এবনে রূম এবনে আইস এবনে ইসহাক এবনে ইব্রাহীম (আঃ)।

হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর ঘটনা

হযরত আইয়ুব (আঃ) আল্লাহ পাকের অত্যন্ত প্রিয় বন্দা এবং আল্লাহর নবী ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে অনেক নেয়ামত দান করেছিলেন। তাঁর সহধর্মিনী, সন্তান-সন্ততি, চাকর-বাকর, দাস-দাসী সবই ছিল। আল্লাহ পাক তাঁকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ-

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫০১

সম্পদ দান করেছিলেন। তাঁর সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও ছিল অনেক। তাঁর অনেক গৃহ-পালিত পশুও ছিল, তিনি গরীব দুঃখীর প্রতি অত্যন্ত দয়া করতেন। অনাথ, বিপদগ্রস্ত, এতীম মিসকিনকে সাহায্য করতেন। বিধবাদের মদদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ। মেহমানদারী ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পথিক মুসাফিরকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদেরকে স্বদেশে প্রেরণ করতেন। সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকর ও শোকরে মশগুল থাকতেন। আল্লাহ পাক অভিশপ্ত শয়তান থেকে তাঁকে হেফাজত করেছেন। ইবলিস শয়তান সম্পদশালী লোকদেরকে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল করে রাখতো। কিন্তু হযরত আইয়ুব (আঃ) এত বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কখনও আল্লাহ পাকের জিকর থেকে গাফেল হননি। শয়তান তাঁর উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। তখন তিন ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। একজন ছিল ইয়েমেনের অধিবাসী, তার নাম ছিল আল ইয়াকান। আর দুজন ছিল তাঁর এলাকার অধিবাসী। একজনের নাম ছিল ইয়ালদ। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল সাফের।

সে যুগে অভিশপ্ত ইবলিস আসমানে যাতায়াত করতে পারতো, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতের পর চার আসমানে যাতায়াত তার জন্যে বন্ধ করে দেয়া হল, এরপর যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হল, তখন আসমানে যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ করা হল।

হযরত আইয়ুব (আঃ) সর্বদা আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকতেন। একবার যখন তিনি আল্লাহ পাকের জিকর করলেন এবং তাঁর শানে হামদ পেশ করলেন, তখন ফেরেশতাগণও তাঁর জন্যে রহমতের দোয়া করলেন। ফেরেশতাদের দোয়া শ্রবণ করে ইবলিস হিংসানলে আক্রান্ত হল। সে আসমানে পৌঁছে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করলোঃ হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার বন্দা আইয়ুবের ব্যাপারে চিন্তা করেছি, আমি দেখলাম তুমি তাঁকে অনেক নেয়ামত দান করেছ, এজন্য তিনি তোমার শোকর আদায় করছেন, তুমি তাকে বিপদমুক্ত রেখেছ, তাই তিনি তোমার হামদ করছেন, তুমি যদি তোমার এসব নেয়ামত ছিনিয়ে নাও এবং তাঁকে বিপদগ্রস্ত কর তবে ঐ বিপদ তাঁর বন্দেগী থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহ পাক ইবলিসের কথা শ্রবণ করে বললেন, "যা, আমি তোকে তাঁর সম্পদের উপর ক্ষমতা দান করলাম"। অভিশপ্ত ইবলিস এ ক্ষমতা নিয়ে আসমান থেকে জমীনে আসলো এবং শয়তানদেরকে বললো, আমাকে আইয়ুব (আঃ)-এর সম্পদের উপর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, আর এটি এমন বিপদ যার উপর সকলে সবর করতে পারেনা, তোমরা বল, তোমাদের নিকট কি শক্তি আছে, এ পর্যায়ে তোমরা কি করতে পার? তখন এক শয়তান বললো, আমাকে এমন শক্তি দেয়া হয়েছে যে আমি অগ্নি গোলায় পরিণত হয়ে যেতে পারি এবং যে বস্তুর উপর আমি অতিক্রম করি তাকে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলি। তখন ইবলিস বললো ঠিক আছে, যখন আইয়ুব (আঃ)-এর উষ্ট্রগুলো চারণ-ক্ষেত্রে একত্রিত হয় তখন উষ্ট্রগুলোর নিকট তুমি যাও, সেগুলোকে ভস্ম করে দাও। এ কথার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটি অগ্নিগোলা জমিনের অভ্যন্তর থেকে উঠলো এবং হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর উট সহ যাবতীয় জন্তুকে ভস্ম করে ফেললো। এমনকি উটের রাখালরা পর্যন্ত রক্ষা পেলনা। তখন ইবলিস উষ্ট্রের রাখালের আকৃতি ধারণ করে একটি উষ্ট্রের উপর আরোহন করে হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর নিকট হাযির হলো। তখন তিনি নামাযে রত ছিলেন। রাখালের আকৃতি ধারণকারী ইবলিস বললো, হঠাৎ একটি অগ্নি আসলো, আপনার সমস্ত উষ্ট্রগুলোকে ঘেরাও করে ফেললো এবং রাখালদের সহ সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে গেল।

হযরত আইয়ুব (আঃ) এসব কথা শ্রবণ করে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! যিনি দিয়েছেন, তিনিই নিয়েছেন; আমিতো সর্বদা আমার জান এবং অর্থ-সম্পদকে ধ্বংসোন্মুখ মনে করি'। ইবলিস বললো, আপনার প্রতিপালক আসমান থেকে অগ্নি প্রেরণ করেছেন, যে কারণে সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ ঘটনায় লোকেরা অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত হল। কেউ মন্তব্য করলো, আইয়ুব কারো বন্দেগী করতেন, সবই ধোকা ছিল'। আর কেউ বললো, 'আইয়ুব আল্লাহর বন্দেগী করতো কিন্তু আল্লাহই এ কাজ করেছেন যাতে করে আইয়ুবের শত্রুরা খুশি হয় এবং বন্ধুরা দুঃখী হয়'। এমনি আরও কথা। হযরত আইয়ুব (আঃ) এসব কথা শ্রবণ করে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! যিনি দিয়েছেন তিনিই নিয়েছেন আর সকল অবস্থায় সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, আমিতো মায়ের উদর থেকে নগ্ন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলাম, আর নগ্ন অবস্থায়ই মাটিতে ফিরে যাবো, আর নগ্ন অবস্থায়ই উঠে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবো। আর আল্লাহ পাক যখন কাউকে কোন বস্তু দান করেন তখন তার জন্য দম্ভ প্রকাশ করার কোন অধিকার নেই, আর যখন আল্লাহ পাকের প্রদত্ত কোন বস্তু তিনি ফেরত নেন তাতে ব্যথিত ও মর্মাহত হওয়া উচিত নয়। কেননা আল্লাহ পাকই ঐ বস্তুর মালিক, তিনি তোমার মালিক, তোমার অধিকর্তা। হে ব্যক্তি! যদি আল্লাহ পাক তোমার মধ্যে কোন কল্যাণ লক্ষ্য করতেন তবে তুমিও শাহাদাত বরণ করতে, যারা শাহাদাত বরণ করেছে তাদের সাথে তোমার রূহ একত্রিত হতো। মনে হয়, আল্লাহ পাক তোমার মধ্যে কোন অকল্যাণ লক্ষ্য করেছেন, এজন্যে শহীদদের দল থেকে তোমাকে বের করে দিয়েছেন'।

হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর এসব কথা শ্রবণ করে অভিশপ্ত ইবলিস অত্যন্ত অপমানিত হলো এবং তার সঙ্গীদের কাছে এসে বললো, 'এখন তোমরা বল, তোমাদের কাছে কী শক্তি আছে, আমিতো আইয়ুবের মন আহত করতে পারলাম না'! তখন একটি শয়তান বললো, 'আমার নিকট এমন শক্তি আছে, যদি আমি চিৎকার দেই তখন প্রাণী মাত্রেরই প্রাণ বের হয়ে যাবে'। তখন ইবলিস বললো, 'তাহলে তুমি আইয়ুবের বকরীগুলো এবং সেগুলোর রাখালদেরকে শেষ করে দাও'। ইবলিসের আদেশ পেয়ে ঐ দানবটি এসে হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর বকরীর পালে এসে চিৎকার দিল। পরিণামে বকরী এবং রাখালগুলোর মৃত্যু হল। তখন ইবলিস রাখালদের তত্ত্বাবধায়কের বেশে হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর নিকট আসলো। আর তখন তিনি নামাযে ছিলেন। ইবলিস তাঁকে পূর্বের ন্যায় কথা বললো এবং হযরত আইয়ুব (আঃ) একই জবাব দিলেন। তখন ইবলিস তার বন্ধুদের নিকট এসে বললো, আমিতো আইয়ুবের মন আহত করতে পারলাম না, এখন তোমাদের নিকট কী তদবীর রয়েছে। তখন একটি খবীছ জ্বীন বললো, আমি ভয়ংকর ঝড় হতে পারি, যা সব কিছু উড়িয়ে নিতে পারে। ইবলীস বললো, তাহলে তুমি আইয়ুবের গরুগুলো এবং শষ্য ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস কর। ইবলিসের আদেশ মোতাবেক ঐ জ্বীনটি ঝড়ে রূপান্তরিত হল এবং হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর ক্ষেত খামার ও গরুগুলো ধ্বংস করে দিল। তখন ক্ষেত খামারের ব্যবস্থাপকের আকৃতি ধারণ করে ইবলিস হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর নিকট হাযির হল এবং সে সব কথাই বললো, যা পূর্বে বলেছিল। হযরত আইয়ুব (আঃ) তখন নামাযে দন্ডায়মান ছিলেন। তিনি ইবলিসকে সেই জবাবই দিলেন যা ইতিপূর্বে দিয়েছিলেন। আর তখন অবস্থা এই যে, তাঁর নিকট অর্থ-সম্পদ বলতে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি ধৈর্য-সহনশীলতা তথা সবরের প্রতীক হয়ে রইলেন।

এ অবস্থায় ইবলিস পুনরায় আসমানে হাযির হল এবং আল্লাহ পাকের দরবারে পুনরায় আরজী পেশ করলো, 'এলাহী! আইয়ুব জানে তুমি যখন তাঁকে সন্তান-সন্ততি দান করেছ তখন তাঁকে অর্থ-সম্পদ দান করবে, এজন্যে সে নিশ্চিন্ত। তুমি কি তাঁর সন্তান-সন্ততির উপর আমাকে ক্ষমতা দান করবে? কেননা এটি এমন বিপদ যার কারণে অনেক মানুষেরই মন ঠিক থাকতে পারেনা'। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন যা, আমি তোকে আইয়ুবের সন্তান-সন্ততির উপরও ক্ষমতা দিলাম'। এরপর আল্লাহর দুশমন ইবলিস প্রত্যাবর্তন করলো। হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি একটি মহলে ছিল। ইবলিস এসে সেই মহলটিকে ভেঙে চুরমার করে দিল। ফলে তাঁর সমস্ত সন্তান-সন্ততির মৃত্যু হয়ে গেল। এরপর ইবলিস নিজে আহত অবস্থায় হযরত আইউব (আঃ)-এর নিকট হাযির হল এবং এ ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলো এবং বললো, 'যদি আপনি সে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতেন যে কিভাবে আপনার সন্তান-সন্ততিরা বিপদগ্রস্ত হয়েছিল এবং তাদের দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল এবং তাদের নাড়ি-ভুড়িগুলো বের হয়ে পড়েছিল, এভাবে উঁচু ইমারতের নিচে চাপা পড়ে সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে'।

হযরত আইয়ুব (আঃ) ইবলিসের এসব কথা শ্রবণ করছিলেন। অবশেষে তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং এক মুষ্ঠি মাটি তিনি নিজের মাথার উপর রেখে দিলেন এবং আক্ষেপ করে বললেন, হায় আফসোস! যদি আমার জন্মই না হত। ইবলিস এ কথাটিকে তার সাফল্য মনে করলো এবং আইয়ুব (আঃ)-এর মনের এ অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে আসমানে চলে গেল।

এদিকে হযরত আইয়ুব (আঃ) তাঁর কথাগুলো পরিহার করলেন, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার করলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে ফেরেশতাগণ তাঁর তওবা এস্তেগফার পেশ করলেন। ইবলিসের পৌঁছার পূর্বেই হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর তওবার কথা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পেশ করা হল; যে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। ইবলিস তখন অপমানিত হল এবং বলল, 'এলাহী! তুমি আইয়ুবকে স্বাস্থ্য দান করেছ, শারীরিক বিপদাপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছ। সে জানে যখন তাঁর স্বাস্থ্য ভাল, আল্লাহ পাক অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সবই তাঁকে দান করবেন। এজন্যে তাঁর ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হওয়ার কারণে তাঁর উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। তুমি আইয়ুবের দেহের উপর আমাকে ক্ষমতা দান কর'। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, 'যা, আইয়ুবের দেহের উপর তোকে ক্ষমতা দান করলাম। কিন্তু তার রসনা এবং অন্তরের উপর তোর ক্ষমতা নেই। রসনা এবং অন্তর ব্যতীত অবশিষ্ট দেহের উপর তোকে ক্ষমতা দেয়া হলো'।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক ইবলিসকে ক্ষমতা এজন্যে দিয়েছেন যেন হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর সওয়াব বৃদ্ধি করা হয় এবং তিনি সবর অবলম্বনকারীদের দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিগণিত হন। আর সকল দুঃখের উপর সবর করার শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং সওয়াবের আশায় বিপদে সবর অবলম্বন করা সম্ভব হয়।

আল্লাহর দুশমন ইবলিস সঙ্গে সঙ্গে হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর নিকট হাযির হলো। তিনি তখন সেজদায় রত ছিলেন। সেজদা থেকে মাথা তোলার আগেই ইবলিস তাঁর নাকের ছিদ্র দিয়ে এক ফুঁক দিল, যার দ্বারা হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর দেহ থেকে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হতে লাগলো এবং মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত ফোঁড়া বের হলো। হযরত আইয়ুব (আঃ) নখ দ্বারা চুলকাতে লাগলেন। ফলে তাঁর নখগুলো পড়ে গেল। এরপর তিনি চট দিয়ে চুলকাতে লাগলেন। তখন চটটি খন্ড বিখন্ড হয়ে গেল।

এরপর তিনি পাথর খন্ড দ্বারা চুলকাতে লাগলেন এবং এত বেশী চুলকালেন যে, গোশ্‌ত শরীর থেকে খসে পড়লো এবং শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হতে লাগলো। সারা শরীর পঁচে গেল। তখন তাঁর জনপদবাসী তাঁকে জনপদ থেকে বের করে দিল। সকল আত্মীয়-স্বজন তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে গেল। শুধু তাঁর একজন স্ত্রী রহমত বিনতে আফরাসীন এবনে ইউসুফ এবনে ইয়াকুব সঙ্গে রইলেন।

কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন, রহমত নাম্নী তাঁর স্ত্রী হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কন্যা ছিলেন। তিনি তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতেন এবং তাঁর প্রয়োজনের আয়োজন করতেন। হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর তিনজন অনুসারী আল ইয়াকান, ইয়ালদুদ ও সাফের তাঁর এ দুর্গতি দেখে তাঁর নিকট থেকে সরে পড়ে। যখন তাঁর বিপদ আরও বৃদ্ধি পায় তখন তারা একদিন তাঁর নিকট হাযির হয় এবং বলে, আল্লাহ পাক আপনাকে আপনার কোন গুনাহর শাস্তি দিয়েছেন, আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করুন। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ তিন ব্যক্তির সাথে একজন মোমেন যুবকও ছিল। তিনি ঐ তিন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, "আপনারা বয়ঃবৃদ্ধ লোক, কথা বলার অধিকার আপনাদেরই রয়েছে। আপনারা যা বলেছেন বা যা ধারণা করেছেন, তার চেয়ে ভাল কথাও আপনারা বলতে পারতেন কিন্তু আপনারা তা করেননি। আপনাদের উপর হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর হক্ব রয়েছে, দায়িত্ব রয়েছে, আপনারা কি জানেন যে, আপনারা কাকে অপমানিত করলেন, তিনি কেমন ব্যক্তিত্ব আপনারা যাঁর দোষ বর্ণনা করলেন, আপনারা কি জানেন না যে তিনি আল্লাহর নবী, সারা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রিয় এবং পছন্দনীয় ব্যক্তি। আর আল্লাহ পাক আপনাদেরকে একথা বলেননি যে, আল্লাহ পাক হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর কোন কাজ অপছন্দ করেছেন এবং আল্লাহ পাক তাঁকে যে সম্মান দিয়েছেন তার কোন অংশ তাঁর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন, আর কখনও তিনি আল্লাহ পাকের সম্পর্কে কোন না-হক্ব কথা বলেননি। আর এ দুঃখ বেদনাকে যা আইয়ুব (আঃ)-কে দেয়া হয়েছে তা আপনাদের ধারণায় তাঁর জন্য অপমানজনক, প্রকৃত অবস্থায় তা নয়; বরং আল্লাহ পাক সর্বদা স্বীয় নবী, সিদ্দীক, নেককারগণকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু এ পরীক্ষা একথার প্রমাণ নয় যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট আর একথাও প্রমাণ হয়না যে, তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে অপমানিত; বরং তাঁর এই বর্তমান অবস্থা তাঁর মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধিরই কারণ হয়েছে"।

"যদি একথা ধরেও নেয়া যায় যে, আল্লাহ পাকের নিকট হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর সেই মর্তবা নেই তবুও একথা সত্য যে তিনি আপনাদের ভাই, আপনারা তাঁর সঙ্গে ভাই হিসাবে জীবন-যাপন করেছেন। অর্থাৎ এমন অবস্থায় কোন বুদ্ধিমানের জন্যে বৈধ নয় যে, সে তাঁর বন্ধুর বিপদের সময় তাঁর নিকট থেকে সরে যাবে অথবা তাঁর সমালোচনা করবে। সে-তো নিজেই বিপদগ্রস্ত, এমন অবস্থায় তাঁর সমালোচনা আদৌ সম্ভব নয়, বরং উচিত হলো তাঁর প্রতি সমবেদনা জানানো এবং তাঁর দুঃখে দুঃখী হওয়া এবং তাঁর জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা, আর যেসব তদবীর তাঁর অবস্থা ভাল করতে পারে, এমন পন্থা অবলম্বন করা। বুদ্ধিমানমাত্রই এ সম্পর্কে অবগত রয়েছে"।

"হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্বের উপলব্ধি এবং মৃত্যুর স্মরণ আপনাদের রসনাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অন্তরকে খন্ড-বিখন্ড করে। আপনারা কি জানেন? যে আল্লাহ পাকের কিছু বন্দা এমনও রয়েছেন যারা ভাষা-জ্ঞানে সমৃদ্ধ, যারা গুণী-জ্ঞানী এবং যারা আলেম, যারা বধির নন, কোন কিছু বর্ণনা করতে অক্ষমও নন, অথচ আল্লাহ পাকের ভয়ে তারা নীরব হয়ে আছেন"।

"যখন আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা তাঁরা করেন, তখন আল্লাহ ব্যতীত আর কোন বিষয়ের আলোচনা তাঁদের রসনায় থাকেনা। তাঁদের দেহের পশমগুলো আল্লাহর ভয়ের কারণে দাঁড়িয়ে যায়। অন্তর খন্ড-বিখন্ড হয়। জ্ঞান এবং অনুভূতি বিদায় নেয়। আর এসব কিছু আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্ম দেখার কারণে হয়। কিন্তু যখন তাঁদের জ্ঞান ফিরে আসে এবং অবস্থা সুদৃঢ় হয়, তখন স্বীয় আমল সমূহ নিয়ে আল্লাহ পাকের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। কিন্তু নিজেদেরকে গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। অথচ তাঁরা হয় নেককার এবং গুনাহ থেকে পবিত্র। এতদসত্ত্বেও নিজেদেরকে পাপী-তাপী মনে করে, এরাই সত্যিকার বুদ্ধিমান"।

হযরত আইয়ুব (আঃ) এই যুবকের কথা শ্রবণ করে বললেন, "আল্লাহ পাক ছোট বড় সকলের অন্তরে তাঁর রহমত, হেকমত এবং মনীষা সৃষ্টি করেন, তখন অন্তরের ভূমিতে জ্ঞান ও হেকমতের উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। এমন ব্যক্তির রসনায় আল্লাহ পাক তাঁর হেকমত প্রকাশ করে দেন। জ্ঞান, হেকমত বা প্রজ্ঞা বয়স বৃদ্ধির উপর নির্ভর করেনা এবং কারো অভিজ্ঞতার অপেক্ষাও করেনা। কোন কোন লোককে শৈশবেই আল্লাহ পাক প্রজ্ঞা দান করেন। তখন তার মর্যাদা অন্য প্রজ্ঞাবান লোকদের দৃষ্টিতে কম হয় না। জ্ঞানীরা ভালভাবেই জানেন, নূর বা আলো, সম্মান বা মর্যাদা আল্লাহ পাকেরই দান"।

এরপর হযরত আইয়ূব (আঃ) তাঁর সাথীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং স্বীয় প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করে কান্না-কাটায় মশগুল হলেন। তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এভাবে আরজী পেশ করলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাকে কেন সৃষ্টি করেছ? হায়! আক্ষেপ! যদি আমাকে সৃষ্টি না করতে, যদি আমি জানতে পারতাম, আমার দ্বারা কী গুনাহ হয়েছে? আমি এমন কি কাজ করেছি যার কারণে তুমি আমার তরফ থেকে বিমুখ হয়েছ? যদি আমি এমন কোন গুনাহ করে থাকি তাহলে তুমি আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত করতে, মৃত্যুই আমার জন্যে অধিকতর সমীচিন ছিল। আমি কি পথিক মুসাফির এবং মিসকীনদের জন্যে আশ্রয়স্থল ছিলাম না? আমি কি এতীম এবং বিধবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলাম না? হে আল্লাহ! আমি তোমার বন্দা, যদি তুমি আমাকে কল্যাণ দান কর তবে তা আমার প্রতি তোমার এহসান। আর যদি তুমি আমার অকল্যাণ কর তবে আমাকে শাস্তি প্রদানের অধিকার তোমার রয়েছে। আমি বিপদাপদের কেন্দ্র এবং দুঃখ-দুর্দশার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছি। আমার উপর এতবড় বিপদ এসেছে, যদি তুমি ঐ বিপদ পাহাড়ের উপর ফেলতে তবে পাহাড়ও তা বহন করতে সক্ষম হতো না। তোমার চূড়ান্ত আদেশ আমাকে অপমানিত করেছে, তোমার শাসন-ক্ষমতা আমাকে দুর্দশাগ্রস্ত করেছে এবং আমার দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছে। হে আমার প্রতিপালক! যদি তোমার ভয় বের করে দাও, যা আমার অন্তরে রয়েছে এবং আমার রসনাকে যদি তুমি জারী করে দাও যে আমি সঠিকভাবে কথা বলতে পারি, আর একথাও সমীচিন মনে করা হয় যে বান্দা তার নিজের তরফ থেকে বক্তব্য পেশ করতে পারে, তবে আশা করা যায় যে, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু আমার প্রতিপালকের শান অনেক উর্দ্ধে, তিনি আমাকে দেখেন, আমি তাঁকে দেখিনা, তিনি আমার কথা শ্রবণ করেন, কিন্তু আমি তাঁর আওয়াজ শ্রবণ করিনা, তাঁর দয়ার দৃষ্টি আমার দিকে নেই। তিনি আমার প্রতি দয়া করেন না, আর তিনি আমাকে নৈকট্য-ধন্যও করেন না, যাতে করে আমি তাঁর নিকট আমার ওজর পেশ করতে পারি এবং আমার পবিত্রতার কথা তাঁকে বলতে পারি, আর আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি'।

হযরত আইয়ুব (আঃ) এসব কথা বলছিলেন, তাঁর সাথীরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। ঠিক এমন সময়ে আকাশে মেঘমালা দেখা দিল, সাথীরা মনে করল হয়ত এই মেঘমালায় আযাব এসেছে। কিন্তু তার ভেতর থেকে আওয়াজ আসলো, হে আইয়ুব! আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমি তোমার নিকটেই রয়েছি, আর সর্বদা নিকটেই ছিলাম। ওঠ এবং নিজের ওজর পেশ কর এবং নিজের নিঃস্পাপ হওয়ার কথা বল এবং নিজের তরফ থেকে আত্মরক্ষার দলিল পেশ কর, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে এমন স্থানে দন্ডায়মান হও যেখানে একজন শক্তিশালী আর একজন শক্তিশালী থেকে আত্মরক্ষা করে। আমার সাথে সে-ই ঝগড়া করতে পারে যে আমার মত হয়। হে আইয়ুব! তোমার নফসের কারণে তোমার অন্তরে এ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে যে তুমি নিজের শক্তি দিয়ে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে যাবে। তুমি কোথায় ছিলে যেদিন আমি জমিনকে সৃষ্টি করেছিলাম, তুমি কি আমার সাথে জমিনকে সম্প্রসারণ করেছিলে, তুমি কি জান যে, আমি তাকে কোন্ পরিমাণে সৃষ্টি করেছি? কোন্ জিনিসের উপর তার প্রান্তগুলো কায়েম করেছি, পানি কি তোমার অনুগত হয়ে জমিনে উঠেছে, জমিন কি তোমার হেকমতে পানির উপর ঢাকনা হয়ে বসে আছে? তুমি সেদিন কোথায় ছিলে যখন আমি আসমানকে ছাদের ন্যায় মহাশুণ্যে স্থাপন করেছি, তার উপরেও কোন রশি নেই যা উপরের দিকে বাঁধা থাকবে, আর নিচেও কোন খুঁটি নেই যার উপর দাঁড়িয়ে থাকবে? তুমি কি তোমার হেকমতে সে স্থানে পৌঁছতে পারবে, যে আসমানের নূরকে ছড়িয়ে দেবে, অথবা নক্ষত্রপুঞ্জকে চলমান করে দেবে? তোমার আদেশেই কি রাত ও দিনের পরিবর্তন হয়? সেদিন তুমি কোথায় ছিলে, যেদিন আমি জমিন থেকে সমুদ্রের ফোয়ারা করেছিলাম এবং সমুদ্রগুলোকে তাদের নিদৃষ্ট সীমায় বন্ধ করেছিলাম, সমুদ্রের ঢেউগুলো কি তার নির্ধারিত সীমায় তোমার শক্তিতে আবদ্ধ থাকে? তুমি কি জান আমি পাহাড়গুলোকে কিভাবে দাঁড় করিয়েছি? তুমি কি জান আসমান থেকে আমি যে বারি বর্ষণ করি তা কোথা থেকে আসে? কি বস্তু দ্বারা মেঘমালা সৃষ্টি হয়? বরফের ভান্ডার কোথায়? দিনের সময় রাতের ভান্ডার কোথায় থাকে, আর রাত্রিবেলা দিন কোথায় থাকে, বাতাসের ভান্ডার কোথায়? বৃক্ষরাজি কোন্ ভাষায় কথা বলে? মানুষের মধ্যে বুদ্ধি কে দিয়েছেন, মানুষের কর্ণে এবং চোখে কে ছিদ্র করেছেন? ফেরেশতা কার অনুগত, কে সকল শক্তিশালীকে পরাজিত করে রেখেছেন? কে তাঁর হেকমতে রিয্ক বিতরণ করছেন'? এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতের কথা প্রকাশ করেছেন।

এরপর হযরত আইয়ুব (আঃ) আরজ করছেন, 'হে আল্লাহ! আপনি যা এরশাদ করেছেন, তা বুঝতে এবং তার জবাব দিতে আমি অক্ষম, আমার বাক-শক্তি খতম হয়ে গেছে, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি অকার্যকর হয়ে গেছে, আমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। হে আমার মা'বুদ! আপনি যা এরশাদ করেছেন, তা আপনারই কুদরত হেকমতের বিবরণ, হে আল্লাহ! আপনার নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, আমার উপর এমন বিপদ এসেছে যার কারণে আমি অসহায় হয়ে কথা বলে ফেলেছি, বিপদই আমার কথা বলার কারণ হয়েছে। হায় আক্ষেপ! যদি জমিন বিদীর্ণ হতো আর আমি তাতে প্রবেশ করতাম! আর এমন কথা আমার প্রতিপালকের শানে না বলতাম, যা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। হায়! যদি এমন হতো যে, বিপদের কারণে আমার মৃত্যু হয়ে যেতো। আমি কথা এজন্যে বলেছি যে, তুমি আমার ওজর কবুল কর, আর আমি এজন্যে নীরব রয়েছি যেন তুমি

আমার প্রতি দয়া কর। ভুলে আমার মুখ থেকে একটি কথা বের হয়ে গেছে, দ্বিতীয়বার কখনও এমন হবেনা, আমি হাত আমার মুখে রেখে দিয়েছি, দাঁত দ্বারা আমার রসনা চেপে ধরেছি, আমি আমার চেহারায় মাটি মিশ্রিত করেছি। আজ তোমার আযাব থেকে তোমারই নিকট আশ্রয় চাইছি, কঠিন বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, তোমার রহমত পাওয়ার জন্যে আরজী পেশ করছি। হে আল্লাহ! আমাকে আশ্রয় দাও, তোমার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আমি তোমারই নিকট ফরিয়াদ করছি। আমার ফরিয়াদ কবুল কর, আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছি, আমাকে সাহায্য কর, আমি তোমারই প্রতি ভরসা রেখেছি, আমার কাজ সুসম্পন্ন করে দাও, আমি তোমারই মাধ্যমে আত্মরক্ষার আবেদন করছি, তুমি আমাকে তোমার হেফাজতে নিয়ে নাও। আমি তোমার নিকট আমার দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, আমাকে ক্ষমা কর, আমি ভবিষ্যতে এমন কথা কখনও বলবোনা, যা তোমার মর্জির খেলাফ হয়'। আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ "তোমার ব্যাপারে আমার এলম পূর্বেই জারি হয়েছে, আমার রহমত আমার গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, আমি তোমার পরিবারবর্গ ও অর্থ-সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছি; বরং ইতোপূর্বে যা ধন-সম্পদ তোমার ছিল তার দ্বিগুণ দেয়ার আদেশ দিয়েছি, যাতে করে পরবর্তীতে যারা বিপদগ্রস্ত হবে, সে সব লোকদের জন্যে তা শিক্ষণীয় হয় এবং যারা সবর অবলম্বনকারী তাদের জন্যে সম্মানের কারণ হয়। হে আইয়ুব! তোমার গোড়ালী দ্বারা জমিনের উপর আঘাত কর, এই ঠান্ডা পানি তোমার পান করার জন্যে এবং গোসল করার জন্যে। আর এতেই রয়েছে তোমার রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা। তোমার সাথীদের তরফ থেকে কোরবানী পেশ কর এবং তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া কর। তারা তোমার ব্যাপারে আমার নাফরমানী করেছে এবং তোমার সম্পর্কে মন্দ ধারণা করেছে এবং তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে"।

আল্লাহ পাকের আদেশ মোতাবেক হযরত আইয়ুব (আঃ) জমিনে তাঁর গোড়ালী দিয়ে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানে একটি পানির ঝরণা বের হল। হযরত আইয়ুব (আঃ) তাতে গোসল করলেন, আল্লাহ পাক তাঁর সমস্ত রোগ-ব্যাধি দূর করে দিলেন। হযরত আইয়ুব (আঃ) এরপর একটি স্থানে বসলেন। এমন সময় আইয়ুব (আঃ)-এর স্ত্রী আসলেন এবং সেই নিদৃষ্ট স্থানে তাঁকে খুঁজলেন। কিন্তু সেই নিদৃষ্ট স্থানে না দেখে তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে এদিক সেদিক খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখে তাকে বললেন, হে আল্লাহর বন্দা! এখানে যে একজন রুগ্ন ব্যক্তি ছিল তিনি এখন কোথায়, তুমি কি তার সম্পর্কে কিছু জান? মূলতঃ হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর নিকটই তাঁর স্ত্রী এ প্রশ্ন করেছিলেন। তখন তিনি জবাব দিলেন জ্বী-হাঁ, আমি তাকে চিনি, আর না চেনার কোন কারণও নেই। এ কথা বলে হযরত আইয়ুব (আঃ) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমিইতো সেই রুগ্ন ব্যক্তি। হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর মুচকি হাসার কারণে তাঁর স্ত্রী তাঁকে চিনতে পারলেন এবং দৌড়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বিবরণ দিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি, যাঁর নিকট আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর প্রাণ রয়েছে, হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর স্ত্রী তাঁকে ততক্ষণ জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন যতক্ষণ না হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর পুত্র, জীব-জন্তু তাদেরকে অতিক্রম করেছে। আল্লাহ পাক সেই অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন আলোচ্য আয়াতেঃ

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আইয়ুব তার প্রতিপালকের নিকট ফরিয়াদ করেছিল, "হে আমার পরওয়ারদেগার! বড় কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে, আর তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান"।[১]

হযরত আইয়ুব (আঃ) কতদিন বিপদগ্রস্ত ছিলেন, কবে দোয়া করেছেন, কেন করেছেন? এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। আল্লামা বগভী লিখেছেন, ইমাম জহুরী হযরত আনাস (রাঃ)-এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আইয়ুব (আঃ) আঠারো বছর বিপদগ্রস্ত ছিলেন।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, হযরত আইয়ুব (আঃ) পূর্ণ তিন বছর বিপদাপন্ন ছিলেন, তা থেকে এক দিনও বেশী নয়।

কা'ব আহবার (রঃ) বলেছেন, তিনি সাত বছর বিপদে অতিবাহিত করেছেন। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি সাত বছর, সাত মাস, সাত দিন দুঃখ-কষ্টে জীবন-যাপন করেছেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, হযরত আইয়ুব (আঃ) সাত বছর ও কয়েক মাস বিপদগ্রস্ত ছিলেন। তাঁর দেহে পোকাগুলো ঘোরাফেরা করতো। একমাত্র রহমত নামক স্ত্রী ব্যতীত কেউ তাঁর নিকট ছিলনা। তিনিই শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি তাঁর খাবার সংগ্রহ করতেন। হযরত আইয়ুব (আঃ) যখন আল্লাহ পাকের হামদ করতেন তখন তাঁর স্ত্রী আল্লাহ পাকের হামদে অংশগ্রহণ করতেন। ঐ অবস্থায়ও তিনি আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকেন।

এ অবস্থা দেখে ইবলিস চিৎকার করতে লাগলো এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত শয়তানকে একত্রিত করলো এবং বললো, আমাকে আল্লাহর এই বান্দা সম্পূর্ণ অসহায় করে ফেলেছে, আমি তার অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সবই ছিনিয়ে নিয়েছি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে এর উপর সবর করেছে, বরং পূর্বের চেয়ে অধিক পরিমাণে সবর করেছে। এরপর তার শরীরের উপরে আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি তার সারা শরীরে ফোঁড়া বের করে দিয়েছি, সে গর্তের মধ্যে পড়ে থাকে, তার স্ত্রী ব্যতীত কেউ তার নিকট যায় না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে সবর অবলম্বন করে আছে, এখন আমি তোমাদের নিকট আবেদন করি তোমরাই বল আমার কী করণীয় আছে? ইবলিসের সাথীরা বললো, সেই তদবীরটি কি ছিল, যার দ্বারা আপনি পূর্ব কালের অনেক মানুষকে ধ্বংস করেছেন। ইবলিস বললো সব তদবীরই এক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, তোমরা আমাকে অন্য কোন পরামর্শ দাও। ইবলিসের সাথীরা বললো, আপনি আদম পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছেছিলেন যে, তাঁকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করিয়েছিলেন? ইবলিস বললো, আমি তার স্ত্রীকে মাধ্যম অবলম্বন করেছিলাম। তখন ইবলিসের সাথীরা বললো, তাহলে এখন তার স্ত্রীর মাধ্যমে কিছু করুন, আর আইয়ুব তার স্ত্রীর বরখেলাফ হয়না, কেননা এখন স্ত্রী ব্যতীত কেউ তার নিকট যায় না। ইবলিস বললো, তোমাদের পরামর্শই ঠিক।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৮০-৮১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫০১-০৮
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬০-৬১

এরপর সে তাঁর স্ত্রীর নিকট পৌঁছলো এবং একজন পুরুষের আকৃতি ধরলো এবং আইয়ুবের স্ত্রীকে বললো, হে আল্লাহর বান্দী! তোমার স্বামী কোথায়? আইয়ুবের স্ত্রী বললেন, তিনি এখানে আছেন, তিনি এখন তাঁর ফোঁড়া চুলকাচ্ছেন, আর তাঁর গায়ের উপর পোকা-মাকড় চলাফেরা করছে। শয়তান হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর স্ত্রীর এসব কথা শুনে আশ্চর্যন্বিত হল যে, হয়তো তাঁর এসব কথা অধৈর্য হওয়ার আলামত। তাই সে হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর স্ত্রীর প্রতি আরও সমবেদনা জানিয়ে তাঁকে হারানো দিনের আরাম-আয়েশের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর অর্থ-সম্পদের কথা, গৃহপালিত পশুর কথা, যৌবনের কথা এবং বর্তমান কষ্ট-যাতনার কথা ব্যক্ত করলো। এরপর বললো এই দুঃখ কখনও শেষ হবেনা।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর স্ত্রী এসব কথা শুনে চিৎকার দিলেন। এ চিৎকার শ্রবণ করে ইবলিস উপলব্ধি করলো এ স্ত্রীলোকের ধৈর্য্যের সীমা শেষ হয়ে গেছে, আর তার কৌশলের সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই সে একটি বকরীর বাচ্চা এনে তাকে দিল এবং বললো, আইয়ুবের উচিত হল, এ বকরীটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবেহ করবে, তবে সে সুস্থ হয়ে যাবে। হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর স্ত্রী তাঁর নিকট হাযির হয়ে বললো, আপনি কতদিন এ অবস্থায় থাকবেন? আর কতকাল আপনার প্রতিপালক আপনাকে কষ্ট দিতে থাকবেন, আপনার অর্থ-সম্পদ কোথায়, সন্তান-সন্ততি কোথায়, বন্ধু-বান্ধব কোথায় গেল, আপনার দেহের সুন্দর বর্ণের কি হল, আপনার সুশ্রী দেহটি কোথায় গেল? বকরীর এ বাচ্চাটিকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবেহ করুন, এসব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

হযরত আইয়ুব (আঃ) এসব কথা শুনে বললেন, আল্লাহর দুশমন তোমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তোমার ভেতরে সে ফুঁক মেরেছে, তোমার মন্দ হোক, তুমি যে অর্থ-সম্পদ, জীব-জন্তুর কথা বলে ক্রন্দন করছো তা কে দিয়েছিলেন? স্ত্রী বললেন আল্লাহ পাক দিয়েছিলেন। হযরত আইয়ুব (আঃ) বললেন, কতদিন পর্যন্ত আমরা এসব নেয়ামত ভোগ করেছি? স্ত্রী বললেন, আশি বছর পর্যন্ত। আইয়ুব (আঃ) বললেন, এখন কতদিন পর্যন্ত এ বিপদ অব্যাহত রয়েছে? স্ত্রী বললেন, সাত বছর কয়েক মাস। হযরত আইয়ুব (আঃ) বললেন, তবে কি এটি ন্যায় বিচার হবে যে পর্যন্ত না সেই সময় পর্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি, যে সময় আরাম-আয়েশে অতিবাহিত করেছি। যদি আল্লাহ পাক আমাকে সুস্থ করেন তবে আমি তোমাকে ১০০ কোড়া মারবো। তুমি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবেহ করবো? তুমি যে আহার্য ও পানীয় বস্তু নিয়ে এসেছো তা আমার উপর হারাম, এরপর ভবিষ্যতে তুমি যা আনবে তাও আমার উপর হারাম। তুমি আমার নিকট থেকে বেরিয়ে যাও, আমাকে চেহারা দেখাবে না। যাহোক হযরত আইয়ুব (আঃ) তাঁর স্ত্রীকে বের করে দিলেন। সে চলে গেল। এরপর হযরত আইয়ুব (আঃ) দেখলেন যে আমার নিকট পানাহার বলতে কিছুই নেই, আমার কোন বন্ধু নেই।

فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ

"অতঃপর আমি তার কষ্ট দূর করে দিলাম"।

হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে আল্লাহ পাক হুকুম দিলেন, পায়ের গোড়ালী দিয়ে জমিনের উপর আঘাত কর। তিনি এ হুকুম পালন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পানির একটি

ঝরণা তৈরী হয়ে গেল। এরপর আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক তিনি তাতে গোসল করলেন। ফলে তাঁর দেহের সমস্ত ব্যাধি দূর হয়ে গেল, তাঁর সৌন্দর্য ও যৌবন ফিরে আসলো। এরপর তিনি চল্লিশ কদম হাঁটলেন। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পুনরায় হুকুম হল যে, জমিনে পায়ের গোড়ালী দিয়ে পুনরায় আঘাত কর। তিনি এ নির্দেশ পালন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঝরণা বের হল, যার পানি সুশীতল ছিল। এরপর হুকুম হল, এ ঝরণার পানি পান কর। পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাধি দূর হয়ে গেল। তিনি এখন অত্যন্ত সুস্থ, সুন্দর, সুপুরুষে পরিণত হলেন। এরপর তিনি পোষাক পরিধান করলেন। তিনি ডানে বামে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর সমস্ত অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সবই বর্তমান রয়েছে; বরং আল্লাহ পাক সেগুলো দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। তাঁর সম্পদ এত বেড়ে গেল যে, যে পানি দ্বারা তিনি গোসল করেছিলেন তার ছিঁটাগুলো যখন তাঁর বক্ষে পড়ে তখন প্রত্যেক ছিঁটা একটি সোনালী পাখিতে পরিণত হয়। হযরত আইয়ুব (আঃ) যখন পাখিগুলো ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন তখন আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করেন, হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদশালী বানিয়ে দেইনি? তিনি আরজ করলেন, নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে সম্পদশালী বানিয়ে দিয়েছো, কিন্তু এটি তোমার বাড়তি দান, আর বাড়তি দান থেকে কে তৃপ্ত হতে পারে!

বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত বর্ণিত হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত আইয়ুব (আঃ) যখন গোসল করছিলেন তখন তাঁর দেহ থেকে পোষাক সরিয়ে রেখেছিলেন। তখন সোনালী পাখিগুলো তার উপর পড়তে লাগলো। তিনি সেগুলোকে কাপড়ে বন্ধ করতে লাগলেন। তখন গায়বী আওয়াজ আসলো, হে আইয়ুব! আমি কি এগুলোর প্রয়োজন থেকে তোমাকে মুক্ত করিনি (অর্থাৎ তোমাকে তো আমি অনেক ধন-সম্পদ দিয়েছি, এমন অবস্থায় সোনালী পাখি ধরার কি প্রয়োজন)? হযরত আইয়ুব (আঃ) আরজ করলেন, তোমার শ্রেষ্ঠত্বের শপথ! তুমি অবশ্যই আমাকে প্রয়োজন থেকে মুক্ত এবং সমৃদ্ধশালী করেছ, কিন্তু তোমার তরফ থেকে অবতীর্ণ বরকত থেকে আমি মুক্ত হতে পারিনি।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আইয়ুব (আঃ) সুস্থ হওয়ার পর একটি উঁচু স্থানে বসেছিলেন। এদিকে তাঁর স্ত্রী মনে মনে ভাবলেন যদিও সে আমাকে বের করে দিয়েছে কিন্তু আমি কিভাবে তাঁকে ছেড়ে যেতে পারি। এখানে তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন, অথবা কোন চতুঃষ্পদ জন্তু তাঁকে খেয়ে ফেলবে একথা চিন্তা করে স্ত্রী প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু যেখানে তিনি ইতিপূর্বে ছিলেন সেখানে কোন নিদর্শনই নেই, সব কিছুই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তিনি এদিক সেদিক তাঁকে খুঁজে না পেয়ে কাঁদতে লাগলেন। আর এসব কিছু হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর সম্মুখেই হচ্ছিল। যেহেতু তিনি একজন সুস্থ মানুষ, উত্তম পোষাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, তাই স্ত্রী তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করতে ভয় করলেন। হযরত আইয়ুব (আঃ) নিজেই তাঁকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর বান্দী! তুমি কি উদ্দেশ্যে এখানে ঘোরাফেরা করছো? তিনি বললেন, এখানে একজন অসুস্থ মানুষ ছিলেন, আমি তাঁরই অনুসন্ধান করছি, হয়তো তাঁর মৃত্যু হয়েছে অথবা তাঁর সাথে কি ঘটনা ঘটেছে? হযরত আইয়ুব (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তিনি আমার স্বামী ছিলেন। হযরত আইয়ুব (আঃ) বললেন, তুমি তাঁকে দেখলে চিনতে পারবে? স্ত্রী বললেন, এমন কেউ নেই, যে তাঁকে দেখবে এবং চিনবে না। এরপর ভীত অবস্থায় তাঁর দিকে দেখতে লাগলেন এবং বললেন, যখন তিনি সুস্থ ছিলেন তখন ঠিক আপনার ন্যায় তাঁর আকৃতি

ছিল। হযরত আইয়ুব (আঃ) বললেন, আমিই আইয়ুব, যাকে তুমি ইবলিসের নামে কোরবানী করার পরামর্শ দিয়েছিলে, কিন্তু আমি আল্লাহর হুকুম মেনেছি, শয়তানের কথা মানিনি। আমি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করেছি, তিনি আমার সব কিছু ফেরত দিয়েছেন, যা তোমার সামনে রয়েছে।

ওয়াহাব (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর স্ত্রী মানুষের বাড়ীতে কাজ করে তাঁর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসতেন। যখন হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর দুঃখ আরও বেড়ে গেল, লোকেরা তাঁর স্ত্রীকে মন্দ বলতে লাগলো। আর একদিন এমন অবস্থা হল যে কেউ তাঁকে কোন কাজ দেয়নি। সারাদিন ঘোরাফেরা করেন কিন্তু কোন কাজ পাননি! অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর মাথার চুলের এক অংশ বিক্রি করে তা দিয়ে একটি রুটি কিনে আনেন। হযরত আইয়ুব (আঃ) বললেন, মাথার কি হয়েছে? স্ত্রী তখন ঘটনা বর্ণনা করলেন। আর সে সময় হযরত আইয়ুব (আঃ) বলেছিলেনঃ

رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ

'হে পরওয়ারদেগার! আমাকে কষ্ট স্পর্শ করেছে'।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত আইয়ুব (আঃ) একথা তখন বলেছিলেন যখন পোকাগুলো তাঁর হৃৎপিন্ড ও তাঁর রসনার দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাঁর চিন্তা হয় যে, যদি এমন হয় তবে আমি আল্লাহর জিকরও করতে পারবো না এবং ফিকরও করতে পারবো না।

হাবিব এবনে সাবেত বলেছেন, যখন তিনটি বিষয় হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর সম্মুখে আসে তখন তিনি বাধ্য হয়ে مَسَّنِیَ الضُّرُّ কথাটি বলেছিলেনঃ

১. হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে তাঁর দু'জন বন্ধু আসে। তারা দেখে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন, আর সারা শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ, তারা বললো যদি আল্লাহ পাকের দরবারে আপনার কোন মর্তবা থাকতো তবে আপনার এ অবস্থা হতোনা।

২. তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্যে খাবারের অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু সেদিন কোন কিছু পাননি, ফলে খাবারের মূল্যও সংগ্রহ করতে পারেননি। বাধ্য হয়ে মাথার চুল বিক্রয় করে তাঁর জন্য খাবার ক্রয় করে আনেন এবং তাঁকে খেতে দেন।

৩. ইবলিস বলেছিল, আমি আইয়ুবের চিকিৎসা করবো এ শর্তে যে, তিনি সুস্থ হওয়ার পর একথা স্বীকার করবেন যে, তুমি আমাকে সুস্থ করেছ। এ অবস্থায় তিনি বলেছিলেনঃ

رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ

'হে পরওয়ারদেগার! কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে'।

বর্ণিত আছে যে, সুস্থ হওয়ার পর লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছে অসুস্থ অবস্থায় কি জিনিস আপনার জন্য কষ্টদায়ক ছিল। তিনি বলেছিলেন, আমার বিপদে শত্রুদের সন্তুষ্ট হওয়া।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, একটি পোকা তাঁর শরীর থেকে পড়ে গিয়েছিল। তিনি এটিকে উঠিয়ে নিজের দেহে বসিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আল্লাহ পাক কি

আমাকে তোমার আহার্য বানিয়ে দিয়েছেন? তখন পোকাটি তাকে এত জোরে দংশন করেছিল যে, ইতিপূর্বে কোন পোকা করেনি। ঐ সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কণ্ঠ থেকেই مَسَّنِيَ الضُّرُّ উচ্চারিত হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ পাক হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে সাবের বা সবর অবলম্বনকারী বলেছেন, অথচ তিনি আলোচ্য বাক্য اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ দ্বারা নিজের দুঃখ-যাতনার কথা প্রকাশ করেছেন। তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাবে বলেছেন, এ বাক্যে নিজের দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে অভিযোগ ছিলনা; বরং এটি ছিল আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া। এজন্যেই আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ

"আমি তার দোয়া কবুল করেছি"।

দ্বিতীয়তঃ যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তি মানুষের নিকট নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা বলে তবে তাকে বে-সবরী বা ধৈর্যহারা বলা যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট যদি কেউ নিজের রোগ-তাপের জন্যে ফরিয়াদ করে তবে তাকে বে-সবরী বা ধৈর্যহারা বলা যাবেনা, যেমন হযরত ইয়াকুব (আঃ) বলেছিলেনঃ

اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ

'আমিতো শুধু আল্লাহ পাকের নিকট আমার অভ্যন্তরীণ দুঃখ-কষ্টের কথা বলি'।

সুফিয়ান এবনে উয়াইনা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ফয়সালার উপর রাজী থাকে এবং এরপর মানুষের কাছে দুঃখের কথা প্রকাশ করে, অর্থাৎ নিজের দুঃখ-কষ্টের অবস্থা বর্ণনা করে তবে তাকে ধৈর্যহারা বলা যাবেনা। যেমন একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার সময় হযরত জীব্রাঈল (আঃ) তাঁর নিকট হাযির হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এখন কেমন বোধ করছেন? অর্থাৎ আপনি কেমন আছেন? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'আমি নিজেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যাকুল পাই'।[১]

وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ

"আর আমি তাকে দান করি তার পরিবার-পরিজন এবং এর সাথে অনুরূপ আরও, এটি আমার রহমত। আর যারা অল্লাহ পাকের বন্দেগী করে তাদের জন্যে নসিহত"।

মৃত সন্তানদেরকে কি জীবিত করা হয়েছে?

আলোচ্য আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে আল্লাহ পাক তাঁর সকল সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদ ফেরত দেন, বরং তার চেয়ে অধিক পরিমাণে দান করেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, তাঁর যে সব সন্তান-সন্ততির ইন্তেকাল হয়েছিল,

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২০৩-০৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫০৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-২৫-২৮

তাদেরকে কি পুনঃজীবন দেয়া হয়েছে, নাকি নতুন সন্তান-সন্ততি দান করা হয়েছে? এ পর্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), কাতাদা (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং অধিকাংশ তফসীরকারদের মত হল, আল্লাহ পাক হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর মৃত সন্তানদের পুনঃজীবন দান করেছিলেন। আর তাদের সংখ্যার অনুরূপ সংখ্যক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আয়াতের প্রকাশ-ভঙ্গিও এ ব্যাখ্যারই সমর্থন করে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর যত চতুঃষ্পদ জন্তু ছিল তত চতুঃষ্পদ জন্তু তাঁকে দান করেছেন এবং তাদের থেকে আরও গৃহ পালিত জন্তু পয়দা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর স্ত্রীকে দ্বিতীয় বার যৌবন দান করেন এবং তাঁর তরফ থেকে ২৬ জন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, ঐ স্ত্রীর ঘরে সাতটি কন্যা ও তিনটি পুত্র সন্তান লাভ হয়। আর এবনে ইয়াসার (রঃ) বলেছেন, হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর সাত ছেলে ও সাত মেয়ে জন্মগ্রহণ করে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর দু'টি খাদ্য ভান্ডার ছিল। একটি গমের দ্বিতীয়টি যবের। আল্লাহ পাক দু'টি মেঘমালা প্রেরণ করলেন। ঐ মেঘমালা থেকে তার একটি ভান্ডারের উপর স্বর্ণের বৃষ্টিপাত হল। আর দ্বিতীয় মেঘমালা থেকে রূপার বৃষ্টিপাত হয়।

আর একথাও বর্ণিত আছে যে, হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর নিকট একজন ফেরেশতা এসে বলেছিলেন, আল্লাহ পাক আপনার সবরের কারণে আপনাকে সালাম বলেছেন এবং এরশাদ করেছেন, তোমার ভান্ডারকে বাইরে এসে দেখ। হযরত আইয়ুব (আঃ) তাই করলেন। আল্লাহ পাক ঐ ভান্ডারের উপর সোনালী পাখি প্রেরণ করলেন। একটি পাখি উড়ে যেতে লাগলো। হযরত আইয়ুব (আঃ) তার পেছনে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে আনলেন। তখন ফেরেশতা বললেন, আপনার ভান্ডারে যে সোনালী পাখিগুলো আছে তা কি আপনার জন্যে যথেষ্ট নয়? হযরত আইয়ুব (আঃ) বললেন, এটি হল আমার প্রতিপালকের প্রদত্ত বরকত সমূহের একটি, আর আমি আমার প্রতিপালকের দান থেকে তৃপ্ত হতে পারিনা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর যে সব সন্তান-সন্ততি ও পশুর মৃত্যু হয় সেগুলোকে পুনঃ জীবন দান করা হয়নি; বরং অনুরূপ সংখ্যক নতুন করে দান করেছেন।

একরামা (রঃ) বলেছেন, হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে বলা হয়, তোমার সন্তান-সন্ততি আখেরাতে তুমি পাবে, তবে যদি তুমি চাও তবে দুনিয়াতেও প্রেরণ করা যেতে পারে। আর যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে আখেরাতের জন্য তোমার সন্তান-সন্ততি রেখে দেই এবং তাদের অনুরূপ দুনিয়াতে দান করি। হযরত আইয়ুব (আঃ) এ পন্থাকে পছন্দ করলেন। অর্থাৎ যাদের ইন্তেকাল হয়েছে তাদেরকে আখেরাতে দেয়া হবে। আর তাদের অনুরূপ সংখ্যক অন্য সন্তান-সন্ততি দুনিয়াতে পাওয়া যাবে। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে, আমি আইয়ুবকে (মৃত) সন্তান-সন্ততি আখেরাতে প্রদানের জন্য রেখে দিয়েছি এবং তাদেরই ন্যায় অন্য সন্তান-সন্ততি দুনিয়াতে দান করেছি। এটি ছিল

হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। আলোচ্য আয়াতের اهل শব্দটি দ্বারা সন্তান-সন্ততি উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ

"আমার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ, যারা বন্দেগী করে তাদের জন্যে এটি হল নসিহত"।

অর্থাৎ হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে তাঁর কঠিন পরীক্ষার পর এবং অসাধারণ সবর ও ধৈর্য্যের পর যা কিছু দান করা হয়েছে তা হল তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত, আল্লাহ পাকের দয়ামায়ার অনুপম নিদর্শন এবং যারা আল্লাহ পাকের বন্দেগী করে তাদের জন্যে এটি হল এক শিক্ষণীয়, অনুসরণীয় আদর্শ। যদি দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের কোন বন্দার উপর কখনও কোন বিপদাপদ আসে তখন তার কর্তব্য হল, সবর অবলম্বন করা, ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়া, ব্যাকুল ও বিচলিত না হওয়া এবং হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর আদর্শকে স্মরণ করা এবং শুধু অল্লাহ পাকের দরবারেই বিপদ দূর করার জন্যে ফরিয়াদ করা। কেননা আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান, তিনি তাঁর দরবারের ফরিয়াদীকে বঞ্চিত করেন না।

দ্বিতীয়তঃ কোন ব্যক্তিকে বিপদগ্রস্ত দেখলে তাকে আল্লাহর অপ্রিয় মনে করা সঠিক হবেনা। হয়তো আল্লাহ পাক তার মর্তব্য বৃদ্ধি করার জন্যে তাকে এ অবস্থায় রেখেছেন, আলোচ্য আয়াতে এ কথারই শিক্ষা রয়েছে।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ

"আর স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদ্রীস এবং জুলকিফলের কথা। তাদের প্রত্যেকেই ছিল সবর অবলম্বনকারী"।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র। যাকে আল্লাহ পাকের হুকুমে তিনি অতি শৈশবে তাঁর মা হাজেরা সহ মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় রেখে এসেছিলেন। যখন সেখানে কোন জন মানবের চিহ্নও ছিলনা, যাঁর পদতলে আল্লাহ পাক তাঁর কুদরত ও রহমতের জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ জমজমের কূপ দান করেছেন, যা বিগত সোয়া পাঁচ হাজার বছর থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের বিশেষ এবং বিস্ময়কর দান হিসাবে পরিগণিত। ইদ্রীস (আঃ) অর্থাৎ আখনুক, আর জুলকিফল অত্যন্ত নেককার ব্যক্তি ছিলেন। আর কারো কারো মতে তিনি পয়গম্বরও ছিলেন।

জুলকিফল প্রসঙ্গে

"কিফল" শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল, কারো জামানত গ্রহণ করা বা কারো জামিন হওয়া, বর্ণিত আছে যে একবার জুলকিফল জনৈক ব্যক্তির জামিন হয়েছিলেন। এর কারণে তাঁকে কয়েক বছর যাবত কারারুদ্ধ অবস্থায় অতিবাহিত করতে হয়েছিল। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে নবী হযরত হিজকিল (আঃ)-এর অপর নামই জুলকিফল।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫১৫
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০৪

২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৪২৬

তফসীরকার আতা (রঃ) বর্ণনা করেছেন, বনী ইসরাঈলের একজন পয়গম্বরের নিকট আল্লাহ পাকের ওহী নাযিল হয়েছে যে, তাঁর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এসেছে, বনী ইসরাঈলের নিকট তাঁর হুকুমতের দায়িত্ব যেন অর্পণ করেন। যে-ব্যক্তি একথার দায়িত্ব নেবে যে-সে রাত্রিকালে নামায আদায় করবে, গাফলত করবে না, দিনে সর্বদা রোজা রাখবে, অলস হবে না, আর মানুষের মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসা করবে, রাগান্বিত হবে না, তাকে ক্ষমতা অর্পণ করুন। পয়গম্বর বনী ইসরাঈলের কাছে বিষয়টি পেশ করলেন। ঐ মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন যুবক দন্ডায়মান হলো এবং আরজ করলো, 'আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি' এবং ঐ যুবক এ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেন। আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে নবুওয়্যতের উচ্চ মর্যাদায় সম্মানিত করেন। ঐ যুবকের নামই 'যুল-কিফিল' হয়েছে।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহর নবী ইউশা (আঃ) বয়ঃবৃদ্ধ হলেন তখন তিনি কোন ব্যক্তিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমার জীবদ্দশায় আমি কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করে দেখবো যে, সে কিভাবে দায়িত্ব পালন করে। তাই তিনি লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, যে ব্যক্তি আমার তিনটি কথা পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে আমি তাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করবোঃ

১. সে সর্বদা রোজা রাখবে।

২. রাত্রিকালে নামায আদায় করবে।

৩. মানুষের মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসায় রাগ করবে না।

এসব কথা শ্রবণ করে এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হলো যাকে অত্যন্ত সাধারণ মানুষ মনে হলো। সে বললো, 'আমি এ কাজ করতে পারি'। হযরত ইউশা (আঃ) তাঁর কথা গ্রহণ করলেন না। তিনি দ্বিতীয় দিনও পুনরায় একই ঘোষণা করলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি পুনরায় দন্ডায়মান হলেন, আর সকলেই ছিল নীরব। অবশেষে হযরত ইউশা (আঃ) তাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন।

তিনি হলেন তখন রাষ্ট্র প্রধান। তিনি দ্বিপ্রহরের খাবার প্রহরের পর যখন বিশ্রাম গ্রহণ করতে গেলেন আর ঐ সময়টিতেই শুধু তিনি নিদ্রিত হতেন। এছাড়া দিতে রাতে আর কখনও তাঁর নিদ্রার সময় হতো না।

সবরের আদর্শ

হঠাৎ ইবলিস একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষের আকৃতিতে ঐ সময় হাযির হলো এবং তাঁর দরজায় করাঘাত করলো। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে?' ইবলিস বললো, 'আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম'। তাই তিনি তার জন্যে দরজা খুলে দিলেন। বৃদ্ধ বললো, আমার এবং আমার সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে একটা ঝগড়া আছে। তারা আমার প্রতি জুলুম করেছে আর এই এই কাজ করেছে। বৃদ্ধ লোকটি তার এ কথাকে এত দীর্ঘায়িত করলো যে, খলীফার নিদ্রার সময় শেষ হয়ে গেল। যাহোক খলীফা তাকে বললেন, 'আমি যখন সন্ধ্যায় দরবারে বসবো তখন তোমার হক্ব সম্পর্কে মীমাংসা করবো'। ইবলিস চলে গেল। সন্ধ্যায় যখন তিনি তাঁর দরবারে বসলেন তখন বৃদ্ধ লোকটিকে খোঁজ করা হলো কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে খলীফা যখন পুনরায় দরবারে বসলেন তখনও তাকে খোঁজ করা হলো, কিন্তু সে ছিল অনুপস্থিত। আবার ঐ দিন দ্বিপ্রহরের পর যখন খলীফা বিশ্রাম করার ইচ্ছা করলেন তখন সে তাঁর দরজায় করাঘাত

করলো। তিনি দরজা খুলে দিলেন। ঐ বৃদ্ধ লোকটি ঘরে প্রবেশ করলো। তখন খলীফা বললেন, 'আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি যখন দরবারে বসি তখন হাযির হবে (এখন কেন এসেছো?) বৃদ্ধ লোকটি বললো, 'এ লোকগুলি খুবই মন্দ। আপনি যখন দরবারে বসেছিলেন তখন তারা বললো, 'আমরা তোমার হক্ব দিয়ে দেব'। আর যখন আপনি দরবার থেকে উঠলেন তখন তারা হক্ব আদায় করতে অস্বীকার করলো'। খলীফা বললেন, 'এখন তুমি যাও, যখন বিকালে আবার দরবারে বসবো তখন আমার কাছে এসো'। এ কথা-বার্তায় খলীফার সেদিন দুপুরের আরামও নষ্ট হয়ে গেল। বিকালে যখন তিনি দরবারে ফিরলেন তখন তিনি সেই বৃদ্ধকে এদিক-সেদিক খোঁজ করতে লাগলেন কিন্তু তাকে পেলেন না। তখন তিনি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সুতরাং তৃতীয় দিনের দ্বিপ্রহরে খলীফা তাঁর বাড়ীর খাদেমকে নির্দেশ দিলেন, 'কাউকে দরজার কাছে আসতে অনুমতি দিও না যেন আমি ঘুমাতে পারি। কারণ আমার উপর ঘুমের প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছে'।

মোটকথা, যখন ঘুমের সময় হলো তখন সেই বৃদ্ধ লোকটি এসে হাযির হলো। কিন্তু খাদেম তাকে অনুমতি দিল না। বৃদ্ধ লোকটি অপারগ হয়ে পড়লো। এমন সময় সে কক্ষের আলো-বাতাস প্রবেশের একটি পথ দেখতে পেল এবং লাফ দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো এবং ভেতর থেকে দরজায় আঘাত করতে লাগলো যেন খলীফা জাগ্রত হন। অবশেষে খলীফা জাগ্রত হলেন এবং খাদেমকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি তোমাকে আদেশ দেইনি যেন কেউ দরজায় করাঘাত করতে না পারে'। খাদেম আরজ করলো, আমার দিক থেকে কেউ আসেনি। আপনি নিজে দেখুন, এ ব্যক্তি কিভাবে এসেছে। খলীফা উঠে দেখলেন দরজা যথারীতি বন্ধ আছে। অথচ ঐ ব্যক্তি ঘরের ভেতর উপস্থিত ছিল। সে বললো, 'আপনি ঘুমিয়ে থাকবেন অথচ বিপদগ্রস্ত লোক দরজায় অপেক্ষমান থাকবে'? তখন খলীফা তাকে চিনে ফেলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন তুমি'? ইবলিস বললো, 'হ্যাঁ, তবে আপনি আমাকে অসহায় করে ফেলেছেন। আমি যা-কিছু আপনার সঙ্গে করেছি তা শুধু আপনাকে রাগান্বিত করার জন্যে। কিন্তু আল্লাহ পাক আপনাকে আমার নিকট থেকে হেফাজত করেছেন'। এই খলীফাকে যুল-কিফল বলা হয়েছে। কেননা তিনি একটি কাজের দায়িত্ব নিয়ে সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, ইবলিস যুলকিফলের নিকট তখন এসে বললো, আমি এক ব্যক্তির নিকট টাকা পাবো। সে আমার হক্ব আদায় করতে টাল বাহানা করছে, 'আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন'। তিনি তার সঙ্গে রওয়ানা হলেন। কিন্তু ইবলিস বাজারে পৌঁছে তাঁর নিকট থেকে সরে গেল এবং তাঁকে একা রেখে চলে গেল।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যুলকিফল সে ব্যক্তি ছিলেন, যিনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রত্যেক রাতে একশত রাকাত নামায আদায় করবেন এবং তিনি শেষ পর্যন্ত ঐ অঙ্গীকার পূর্ণ করছেন। হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং অধিকাংশ তফসীরকারগণ এ মত পোষণ করেন যে, তিনি একজন নবী ছিলেন। তবে হযরত আবু মুসা আশআরী (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, তিনি নবী ছিলেন না তবে বনী ইসরাঈলের একজন অত্যন্ত বড় নেককার ব্যক্তি ছিলেন।

كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ

"তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন সবর অবলম্বনকারী"।

নানা বিপদাপদ এবং কঠিন সংকটের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কখনও ধৈর্য্য-চ্যুত হননি। হযরত ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের নামে জবেহ হতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের হুকুমে তাঁকে জবেহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অকাতরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আর শৈশবে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অনেক কঠিন সংকটেরও সম্মুখীন হয়েছেন এবং ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন।

হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর কথা সূরা মরয়মে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর এবাদত বন্দেগী এবং পানাহার বর্জন প্রভৃতির কারণে তিনি ফেরেশতাদের সঙ্গে একত্রিত হয়েছেন। আর যুল কিফলের সবর অবলম্বনের কথা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তিনি সারারাত নামাযে মশগুল থাকতেন এবং আজীবন রোজা রাখতেন ও এতীম মিসকীনের লালন-পালন করতেন। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক তাঁদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا

"আর আমি তাদেরকে আমার রহমতের কোলে গ্রহণ করেছি"।

আলোচ্য আয়াতে رحمة শব্দটির তাৎপর্য হলোঃ নবুওয়্যত, জান্নাত এবং নৈকট্যের উচ্চ মকাম।

اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

"নিশ্চয় তাঁরা ছিল নেককার পরহেযগারদের অন্তর্ভুক্ত, সৌভাগ্যবানদের অন্তর্গত"।[১]

وَ
ذَاالنُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ
اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ
مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَرِيَّآ
اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ
الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۡ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا
لَهٗ زَوْجَهٗ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَ
يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۭ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৬৪-৬৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৮২

তরজমা

(৮৭) এবং স্মরণ কর জুননুনের কথা; যখন তিনি রাগ করে চলে যান এবং মনে করেন যে, আমি তার জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করবো না; এরপর তিনি অন্ধকার থেকে ডাক দিয়ে বলতে থাকেন, 'তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র, মহান, আমি তো সীমা লঙ্ঘনকারী'।

(৮৮) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম, আর এভাবেই আমি মোমেনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।

(৮৯) এবং স্মরণ কর জাকারিয়ার কথা। যখন তিনি ফরিয়াদ করে বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখোনা, তুমিতো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

(৯০) ফলে আমি তার ফরিয়াদ কবুল করেছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া। আর তার পত্নীকে আমি যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করতো। আর তারা আমাকে ডাকতো আশা ও ভয় নিয়ে এবং তারা সকলেই ছিল আমার সম্মুখে একান্ত বিনীত।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা

আলোচ্য আয়াতে এ পর্যায়ে অষ্টম ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। এ ঘটনা হল হযরত ইউনুস (আঃ)-এর। 'নূন' শব্দটির অর্থ হল মাছ। আর যেহেতু মাছ তাঁকে উদরে ধারণ করেছিল, এজন্য তাঁকে জুননুন বলা হয়। ইরাকের মোসেল প্রদেশের নিনুয়া অঞ্চলের অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক তাঁকে প্রেরণ করেন। নিনুয়া এলাকার লোকেরা কুফর ও শেরকে লিপ্ত ছিল। তারা মূর্তি পূজা করতো। তিনি তাদেরকে তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু নিনুয়াবাসী তাঁর কথা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। তাঁর বিরোধিতায় তৎপর হয় এবং তাদের কুফর ও শেরক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত ইউনুস (আঃ) তাদের অন্যায় আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং তাদের হেদায়েত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে তাদেরকে বলেন, তিন দিন পরই তোমরা কোপগ্রস্ত হবে, তোমাদের উপর আল্লাহ পাকের গজব আপতিত হবে। একথা বলে তিনি উত্তেজিত অবস্থায় আল্লাহ পাকের হুকুমের অপেক্ষা না করেই নিনুয়া ছেড়ে অন্যত্র গমন করেন।

হযরত ইউনুস (আঃ) চলে যাওয়ার পর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ পাকের আযাবের কিছু কিছু আলামত লক্ষ্য করে এবং তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ পাকের নবীর বদদোয়া কখনও ব্যর্থ হয়না। এ অবস্থায় তারা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা তাদের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, গৃহপালিত পশু সহ ঘর-বাড়ী ছেড়ে মাঠে বের হয়ে পড়ে এবং সকলে সমবেতভাবে অত্যন্ত বিনীত অবস্থায় সকাতরে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার করতে থাকে। শুধু তাই নয়; বরং তাদের মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে ফেলে এবং ভবিষ্যতে আর আল্লাহর নাফরমানী করবে না, কুফর ও শেরক বর্জন করবে বলে অঙ্গীকার করে। তারা হযরত ইউনুস (আঃ)-এর খোঁজ করতে থাকে এবং তাঁর সন্ধান পেলে আর কখনও তারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করবে না, এ শপথও গ্রহণ করে। এ অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করেন এবং স্বীয় আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন।

এদিকে হযরত ইউনুস (আঃ) নিনুয়া থেকে বের হয়ে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হন এবং অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করেন। কিছুক্ষণ পরই নৌকা ঝড়ের কবলে পড়ে। সকলের নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার যখন আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন একজনকে সমুদ্রে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নৌকায় যাত্রীদের ধারণা ছিল, নৌকায় যদি কোন পলাতক গোলাম আরোহন করে তবে নৌকা ডুবে যায়। কিন্তু কে সেই পলাতক গোলাম? তা জানার জন্য তারা লটারী করে। লটারীতে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর নাম আসে। একাধিক বার লটারী করা হয় এবং প্রত্যেক বারই তাঁর নাম ওঠে। এমন অবস্থায় হযরত ইউনুস (আঃ) সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কেননা, তিনি উপলব্ধি করেন যে তিনিই পলাতক গোলাম। সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বৃহদাকার মাছ তাঁকে গিলে ফেলে। আর তখন মাছের প্রতি আল্লাহ পাকের এই নির্দেশ হয়ঃ 'ইউনুস তোমার আহার্য্য নন, বরং তোমার দায়িত্ব হলো তোমার উদরে তাঁকে নিরাপদে রাখা, তোমার উদর হলো তাঁর কারাগার"। আর এভাবে তিনি মাছের পেটে নিরাপদে অবস্থান করেন এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করতে থাকেন। তখন তিনি যে দোয়া করেন তা হলোঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

হযরত ইউনুস (আঃ) তাঁর অপরাধ স্বীকার করে বলেনঃ "হে পরওয়ারদেগার! তুমি পবিত্র, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই (আমি তোমার নির্দেশের অপেক্ষা না করে অত্যন্ত বড় অপরাধ করেছি), আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি"।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর দ্বারা যে ভুল হয়েছে তা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দন্ডনীয় অপরাধ না হলেও তিনি পয়গম্বর হিসাবে যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সেদিক থেকে বিচার করলে এর গুরুত্ব অনেক বেশী। মূলতঃ এ কারণেই তাঁকে মাছের পেটে অবস্থানের কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁর তওবা কবুল করেন, মাছের পেটে অবস্থানের কষ্ট থেকে রেহাই পান। আর মাছের পেটে অবস্থান কালেও আল্লাহ পাক মাছকে সাবধান করে দেন যেন তাঁকে নিরাপদে রাখা হয়। তাঁর গোশ্ত, চামড়া কোন কিছুই খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি, বরং হুকুম দেয়া হয়েছে তাঁর হেফাজত করার। পরবর্তীতে আল্লাহ পাকের হুকুমে মাছটি তাঁকে ডাঙায় উদগীরণ করে এবং তিনি তাঁর এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। মাছটি দজলা নদীর তীরে যে স্থানে তাঁকে উদগীরণ করে সে স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর মাযার সেই মসজিদের ভেতরেই রয়েছে।

মোসেল প্রদেশের নিনুয়া শহরে ঠিক দজলা নদীর তীরে এই মসজিদটি স্থাপিত হয়েছে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ), আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এবং আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন যে, হযরত ইউনুস (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে ফিলিস্তিনে বাস করতেন। এক জালেম রাজা তাঁদের উপর আক্রমণ করে এবং তাঁর সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোককে বন্দী করে ফেলে। আল্লাহ পাক শা'ইয়া নামক নবীর নিকট এই ওহী প্রেরণ করেন যে, "তুমি হারকিয়া

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৪২৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৩০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৬৬

নামক বাদশাহর নিকট যাও এবং তাকে বল কোন শক্তিশালী নবীকে দুশমনদের কাছে পাঠিয়ে বন্দীদের যেন রেহাই দেয়ার ব্যবস্থা করে। আমি দুশমনদের অন্তরে বনী ইসরাঈলদের আযাদীর ধারণা সৃষ্টি করে দেব"। শা'ইয়া (আঃ) হারকিয়া নামক বাদশাহর নিকট গমন করলেন এবং আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দিলেন। হারকিয়ার রাজত্বকালে তখন পাঁচজন নবী ছিলেন, বাদশাহ হারকিয়া হযরত শা'ইয়া (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি মত, কাকে পাঠাবো? তিনি বললেন, ইউনুসকে, সে শক্তিশালী এবং আমানতদার। বাদশাহ হযরত ইউনুস (আঃ)-কে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। হযরত ইউনুস (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ পাক কি আমাকে প্রেরণের আদেশ দিয়েছেন? বাদশাহ বললেন, না। এরপর হযরত ইউনুস (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ পাক কি আমাকে এর জন্যে মনোনীত করেছেন? বাদশাহ বললেন, না। তখন ইউনুস (আঃ) বললেন, তবে আমাকে ব্যতীত অন্য কোন পয়গম্বর নিয়োজিত করুন। কিন্তু লোকেরা তাঁর কথা মানেনি এবং তাঁকে যাওয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তখন এই অবস্থায় হযরত ইউনুস (আঃ) রাগান্বিত হয়ে একটি ভাড়া করা নৌকায় আরোহণ করেন।[১]

ওরওয়া এবনে যোবায়ের, সাঈদ এবনে যোবায়ের সহ একদল বলেছেন, হযরত ইউনুস (আঃ) তাঁর জাতিকে ছেড়ে অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গিয়েছিলেন। এর কারণ এই, হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ পাকের হুকুমে আল্লাহ পাকের আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেছিলেন এবং আযাবের সময়ও নির্দৃষ্ট করেছিলেন যে, অমুক সময় তোমাদের উপর আযাব আপতিত হবে। কিন্তু লোকেরা আযাবের আলামত লক্ষ্য করে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার শুরু করে। তখন আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করেন এবং আসন্ন আযাব মাফ করে দেন। এ পর্যায়ে হযরত ইউনুস (আঃ) আশঙ্কা করেন যে, লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবে। এজন্যে তিনি সেখান থেকে দূরে চলে যান।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতির মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে তারা মিথ্যাবাদীকে হত্যা করে ফেলতো। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর অন্তরে এই আশঙ্কা হল, তিনি যে আযাবের আশঙ্কা করেছেন, যে আযাব আসার কথা ছিল তা যখন আসেনি, লোকেরা মিথ্যাবাদী মনে করে আমাকে হত্যা করবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, হযরত ইউনুস (আঃ)-কে আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছিলেন, তুমি অতি সত্বর যাও এবং তোমার জাতিকে আমার আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন কর এবং ঈমান আনয়নের জন্যে আহ্বান কর। হযরত ইউনুস (আঃ) আরজী পেশ করলেন, আমাকে রওয়ানা হওয়ার জন্যে কিছু সময় দেয়া হোক। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, কাজটি অতি সত্বর করণীয়। অতএব, অনতিবিলম্বে চলে যাও।

হযরত ইউনুস (আঃ) আরজী পেশ করলেন, আমাকে অন্ততঃ জুতা পরিধানের অনুমতি দেয়া হোক। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এতটুকু অবকাশের অনুমতি হয়নি, তখন তিনি রওয়ানা হলেন, কিন্তু মনক্ষুণ্ন অবস্থায়।[২]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২১২
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৮৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫১৮

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫১৮-১৯

فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ

"এবং মনে করেন যে আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করবো না"।

মুজাহেদ (রঃ), যাহ্যাক (রঃ) এবং কালবী (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ বাক্যটি অর্থ হল, ইউনুসের ধারণা হয়েছে এইঃ "আমি তাকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত করবো না"।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ বাক্যটির অর্থ করেছেন এই, ইউনুস (আঃ) মনে করেছেন, আমি তাঁর ব্যাপারে নিজের শক্তিকে ব্যবহার করবো না।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, বাক্যটির অর্থ হল, ইউনুস কি এই ধারণা করেছে যে আমি তাকে কাবু করতে পারব না?

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি যে ইউনুস (আঃ)-এর দ্বারা যখন এ কাজটি হয় তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যান। শয়তান তাঁকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁর জীবনের অতীত কালের এবাদত-বন্দেগী ছিল, এজন্যে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলেন না তাঁকে শয়তানের জন্য ছেড়ে দিতে। তাই আল্লাহ পাক তাঁকে মাছের পেটে রেখে দিয়েছেন।

মাছের পেটে কতদিন ছিলেন

হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে চল্লিশ দিন ও রাত ছিলেন।

আতা (রঃ) বলেছেন, তিনি মাছের পেটে সাতদিন ছিলেন। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তিনদিন ছিলেন।

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

(তাই তিনি ঘন অন্ধকার থেকে আল্লাহ পাককে ডাকলেন) এই অন্ধকার হল রাতের অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার এবং মাছের পেটের অন্ধকার।

হযরত ইউনুস (আঃ) ঐ অন্ধকার অবস্থায়ই আল্লাহ পাককে ডাকলেন এবং উপরোক্ত দোয়া পাঠ করতে লাগলেন। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মাছকে আদেশ দিলেন, ইউনুসকে তোমার পেটে ধারণ কর তবে তাঁর দেহে যেন কোন যখম না হয়, কোন হাড় যেন না ভাঙে। নির্দেশ মোতাবেক মাছটি তাঁকে গিলে ফেললো এবং সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে গেল। হযরত ইউনুস (আঃ) সেখানে তসবীহ (সোবহানাল্লাহ) পাঠের আওয়াজ শুনলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন এখানে তসবীহর আওয়াজ কি করে হয়? আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করলেন যে এটি হল সমুদ্রের জীব-জন্তুর তসবীহ পাঠেব আওয়াজ। তখন হযরত ইউনুস (আঃ) সেখানেই আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করতে শুরু করলেন। ফেরেশতাগণ হযরত ইউনুস (আঃ)-এর তসবীহ পাঠের আওয়াজ শুনে আরজ করলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক বিস্ময়কর জমিন থেকে অত্যন্ত দুর্বল তসবীহ পাঠের আাওয়াজ শুনছি"। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ফেরেশতাগণ বললেন, "এই আওয়াজটি সুপরিচিত, কিন্তু যে স্থান থেকে আওয়াজ আসছে তা অপরিচিত"। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, "এটি হল আমার বন্দা ইউনুসের আওয়াজ, যে আমার

নাফরমানী করেছে, আমি তাঁকে মাছের পেটে বন্দী করেছি"। তখন ফেরেশতাগণ বললেন, "এই সেই নেককার বন্দা, যার তরফ থেকে প্রতিদিন নেক আমলের রিপোর্ট তোমার কাছে আসতো"? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ "হ্যাঁ"। তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের নিকট হযরত ইউনুস (আঃ)-এর পক্ষে সুপারিশ করলেন এই বলে যে, "হে আল্লাহ! সে আরামের সময় নেক কাজ করতো, তোমার বন্দেগী করতো, এখন তাঁর বিপদের সময় তুমি তাঁর প্রতি দয়া কর"। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক মাছকে আদেশ দিলেন এবং সে তাঁকে নদীর ডাঙায় উদগীরণ করে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

"তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম, আর এভাবেই আমি মোমেনদেরকে উদ্ধার করে থাকি"।

তবে শর্ত হল যদি কেউ এখলাসের সাথে আল্লাহ পাকের নিকট ফরিয়াদ করে।

এ দোয়ার ফজিলত

মুসনাদে আহমদ ও তিরমিজী শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থেকে আল্লাহ পাকের নিকট যে দোয়া করেছিলেন তা হল ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

যে মুসলমান কোন ব্যাপারে এ দোয়া পাঠ করে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করবে, আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করবেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস বলবো না, যদি তোমাদের কারো উপর কোন দুঃখ অথবা বিপদ আপতিত হয় আর সে ঐ জিনিসটির মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করে, তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তার দোয়া কবুল করবেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! অবশ্যই সে দোয়াটি বলুন। তিনি বললেন, তা হল ইউনুস (আঃ)-এর দোয়া।

এবনে জরীর এ বর্ণনাটির এভাবে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "আল্লাহ পাকের ঐ নাম যার মাধ্যমে দোয়া করা হলে তিনি কবুল করেন, যদি তাঁর নিকট কিছু চাওয়া হয় তিনি দান করেন"। তা হলোঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এ দোয়ার কবুলিয়ত কি শুধু হযরত ইউনুস (আঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য, না সকল মুসলমানদের জন্যে? তিনি এরশাদ করলেনঃ তাঁর জন্যে বিশেষভাবে, আর সকল মুসলমানের জন্যে সাধারণ ভাবে। যে-কেউ এ দোয়া করবে (তা কবুল হবে)। তুমি কি পবিত্র কোরআনে পাঠ করনি?

وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ "এভাবে আমি মোমেনদেরকে উদ্ধার করে থাকি"।

অতএব, যে কেউ এ দোয়া করবে তার সাথে কবুলিয়তের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, কাসীর এবনে সাঈদ বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম হাসান বসরীকে (রঃ) জিজ্ঞাসা করলাম এসমে আযম কি, যার দ্বারা দোয়া করলে আল্লাহ পাক কবুল করেন, কোন কিছু চাইলে আল্লাহ পাক দান করেন, এরপর তিনি বললেন, তুমি কি পবিত্র কোরআনে পাঠ করনি? তখন তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করলেন। এটিই আল্লাহ পাকের এসমে আযম। যে-কেউ এর মাধ্যমে দোয়া করে, আল্লাহ পাক কবুল করেন।

বস্তুতঃ যে-কেউ হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ন্যায় আল্লাহ পাককে ডাকবে, তাঁর মহান দরবারে ফরিয়াদ করবে, আল্লাহ পাক অনুরূপভাবে তার দোয়াও কবুল করবেন। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দান করা হয়েছে।[১]

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ

"এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা। যখন তিনি ফরিয়াদ করে বলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে আর এ আয়াতে হযরত যাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর আলোচনা করা হয়েছে। এটি এ পর্যায়ের নবম ঘটনা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى

(হে রসূল!) আপনি যাকারিয়া (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন; তিনি যখন তাঁর প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করে বলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে একলা ছেড়ে দিও না। অর্থাৎ আমাদেরকে লা-ওয়ারিশ এবং নিঃসন্তান রেখোনা, আমাকে সন্তান দান কর; যে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।

وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ

"তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী"।

তুমি যাকে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা দিতে পার। অথবা এর অর্থ হলোঃ প্রকাশ্য উত্তরাধিকারীগণ সকলেই শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু হে আল্লাহ! তুমি সর্বকালে থাকবে। তুমি সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চির বিরাজমান।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ

"ফলে আমি তাঁর ফরিয়াদ কবুল করেছিলাম এবং তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া আর তাঁর পত্নীকে আমি যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫২০-২১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৩১-৩২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬৫-৬৭

অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাঁকে পুত্র সন্তান ইয়াহইয়াকে দান করেছিলেন। অথচ তাঁর স্ত্রী ছিলেন বৃদ্ধা। আর এ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। আল্লাহ পাক তাঁকে সন্তানবতী হওয়ার যোগ্য করে দিলেন। তথা ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন বন্ধ্যা, তাঁর বন্ধ্যাত্ব দূর করে দিলেন।

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

(এই নবীগণ সৎ কাজ সম্পাদনে প্রতিযোগিতা করতো) তথা কে কত বেশী নেক আমল করতে পারে তার জন্যে সর্বদা তৎপর থাকতো। আর আমাকে ডাকতো আশা এবং ভয় নিয়ে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার আশা, সওয়াব লাভের আশা এবং দোয়া কবুল হওয়ার আশা নিয়ে তাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতো। আর ভয় হলো আল্লাহ পাক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ভয়; তথা তাঁকে ভুলে থাকার ভয় অথবা গুনাহর ভয় অথবা আযাবের ভয়। অর্থাৎ আশা এবং ভয়ের মধ্যে থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁরা দোয়া করতেন।

وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

"আর তাঁরা সকলেই আমার সম্মুখে ছিল অত্যন্ত বিনীত"।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্মের কারণে মানব মনে যে ভয়ের সৃষ্টি হয় তাকেই "খুশু" বলা হয়। যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফ হতেন তাই তাঁদের অন্তরের গভীরে আল্লাহ পাকের ভয় পোষণ করতেন। আর ঐ ভয় থেকে সৃষ্টি হয় বিনয়ের। তাই তাঁরা হতেন অত্যন্ত বিনয়ী।

কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন এভাবে যে, তাঁরা আমার হুকুমের তাবেদার হতো অত্যন্ত বেশী।[১]

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর একটি ভাষণে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক এবং তাঁর 'হামদ' পেশ করতে থাক ও আশা এবং ভয় নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাক; আর বিনীতভাবে তাঁর দরবারে দোয়া করো। মনে রেখো, আল্লাহ পাক হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর এসব গুণের উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআন।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫২২
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৩২

وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ
جَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ
اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ
بَيْنَهُمْ ۭ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَ
حَرٰمٌ عَلٰي قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾ حَتّٰٓى اِذَا
فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾

তরজমা

(৯১) আর স্মরণ কর সেই নারীকে যে তার সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, এরপর আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে এবং তার পুত্রকে করেছিলাম এক নিদর্শন।

(৯২) নিশ্চয় এই যে তোমাদের জাতি তা-তো একই জাতি, আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব শুধু আমারই বন্দেগী কর।

(৯৩) কিন্তু লোকেরা নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, প্রত্যেককেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(৯৪) অতএব, যে ঈমানদার অবস্থায় সৎ কাজ করবে তার সাধনা ব্যর্থ হবেনা, আর আমি অবশ্যই তা লিখে রাখি।

(৯৫) আর যে সকল জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীরা আর ফিরে আসবে না, একথা স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে।

(৯৬) অবশেষে যখন ইয়াজুজ মাজুজকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি থেকে ছুটে আসবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত যাকারিয়া (আঃ) ও ইয়াহইয়া (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত ঈসা (আঃ) ও মরয়ম (আঃ)-এর ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। তফসীরকারগণ লিখেছেন, পবিত্র কোরআনে সাধারণতঃ হযরত যাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর আলোচনার পরই হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মরয়ম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়। কেননা, উভয় ঘটনার মধ্যে এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য

পরিলক্ষিত হয়। হযরত যাকারিয়া (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত বয়ঃবৃদ্ধ মানুষ এবং তাঁর স্ত্রীও ছিলেন বৃদ্ধা এবং বন্ধ্যা। এ অবস্থায় তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্যে দোয়া করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁকে ঐ অবস্থায় একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন, যাঁর নামকরণ করা হয়েছে ইয়াহইয়া। এ সম্পর্কে সূরা আলে-এমরান এবং সূরা মরয়মে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এটি বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু এর চেয়েও অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার হলো হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম এবং মরয়ম (আঃ)-এর ঘটনা। কেননা, মরয়ম (আঃ) ছিলেন কুমারী। অথচ আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা হিসাবে তাঁর ঘরেই আল্লাহ পাক পয়দা করেছেন হযরত ঈসা (আঃ)-কে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তিনি পিতা ব্যতীতও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন, যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। (বিস্তারিত আলোচনা সূরা আলে এমরান ও সূরা মরয়মে স্থান পেয়েছে)।[১]

মূলতঃ এসবই আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন। বিশ্ব-বাসীর জন্যে এসব হলো চিরস্মরণীয় নমুনা; যাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যবস্থা রয়েছে সর্বকালের মানুষের জন্যে।

إِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ

"নিশ্চয় এই যে তোমাদের জাতি তা-তো একই জাতি, আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব শুধু আমারই বন্দেগী কর"।

তৌহীদের আহ্বান যুগে যুগে

পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু সমস্ত নবী রসূলগণ তৌহীদের আহবায়ক ছিলেন আর তাঁদের সকলেই তৌহীদের তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন তাই আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনার পর এ আয়াতে তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষা রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً

অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন-ধর্ম এক, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক এক, অদ্বিতীয়, সকল নবী রসূলগণের একই কথা, একই আহ্বান– "এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর"। এটিই ছিল তাঁদের মূল নীতি, এটিই ছিল তাঁদের মৌল শিক্ষা। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কখনও কোন মতবিরোধ হয়নি।

অতএব, তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর, আমিই তোমাদের প্রতিপালক।

وَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

"কিন্তু লোকেরা নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে"।

১। বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪২-৪৮

আল্লাহ পাক তৌহীদের ভিত্তিতে সকলকে একই ধর্ম দান করেছেন, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ পাকের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম"।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও লোকেরা পরস্পর ধর্মীয় ব্যাপারে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং ভিন্ন ভিন্ন ফেরকার অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন, ইহুদী নাসারারা শুধু একে অন্যের বিরোধীই হয়নি, বরং একে অন্যের প্রতি লা'নত দেয়া শুরু করে। দ্বীনের ব্যাপারে এ বিভেদ সৃষ্টির ভয়াবহ পরিণাম তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

كُلٌّ إِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ

(প্রত্যেককে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে আর প্রত্যেককেই তার কর্মের যথাযথ ফল ভোগ করতে হবে)।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ আয়াতে সে সব লোকদের জন্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং তৌহীদের সরল সঠিক পথ পরিহার করে বাতিল ও ভিত্তিহীন মতবাদের অনুসারী হয়। তারা কেয়ামতের কঠিন দিনে সত্য দ্বীন বর্জন করার এবং বিভেদ সৃষ্টি করার তথা ফেরকা-বন্দি করার শাস্তি ভোগ করবে। কেননা কেয়ামতের দিনই প্রত্যেকটি মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ

"অতএব, যে ঈমানদার অবস্থায় সৎ কাজ করবে তার সাধনা ব্যর্থ হবেনা"।

নেক আমলের শুভ পরিণতি

আলোচ্য আয়াতে নেক আমলের শুভ পরিণতির নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ যে দুনিয়াতে নেক কাজ করবে, যে আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলবে এবং যাবতীয় কাজে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে তার শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত, সে সওয়াব লাভ করবে পূর্ণ মাত্রায়, তার কোন পূণ্য সাধনাই ব্যর্থ হবার নয়, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক নেককারদের সওয়াব বিনষ্ট করেন না"।

যারা নেক আমল করবে তাদের সওয়াব বা শুভ পরিণতি অবশ্যই তারা লাভ করবে।

ঈমান পূর্বশর্ত

কিন্তু এর জন্যে পূর্ব শর্ত হল ঈমান। অর্থাৎ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান থাকলেই নেক আমলের

সওয়াব পাওয়া যাবে। ঈমান ব্যতীত সৎ কাজ আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়না এবং এর জন্যে কোন সওয়াবও দেয়া হয়না। যেমন, এ যুগে অনেক অমুসলিম ব্যক্তি দুঃস্থ মানুষের সেবায় এগিয়ে আসে, কেউ হাসপাতাল নির্মাণ করে, বন্যা কবলিত বিপদগ্রস্ত মানুষের দুঃখ নিবারণে আর্থিক সহায়তা দেয়, দুর্গত মানবতার সেবায় অনেকেই সাহায্য করে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে দুঃস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসে। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় وهو مؤمن শব্দটি সংযোজন করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখেরাতে সওয়াব লাভ করতে হলে প্রকৃত মোমেন হতে হবে, ঈমানের শর্ত পূর্ণ না হলে আখেরাতে তার সওয়াব পাওয়া যাবেনা। তবে দুনিয়াতে যে সুনাম হয় তাই তার প্রাপ্য। যে নেক আমলের মূলে ঈমানের ভিত্তি নেই তা যত বড় নেক আমলই হোক না কেন, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তা কখনও গ্রহণযোগ্য হয়না। পক্ষান্তরে যদি ঈমানের সঙ্গে নেক আমল করা হয় তবে তার সওয়াব সুনিশ্চিত।

فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ

অতএব, মোমেনের পূণ্য সাধনা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অত্যন্ত মূল্যবান।

وَاِنَّا لَهٗ كَاتِبُوْنَ

(আর আমি অবশ্যই তা লিখে রাখি) অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের হুকুমে প্রত্যেকের আমলনামায় তার নেক আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

লক্ষ্যনীয়, যদিও প্রত্যেকটি মানুষের যাবতীয় কৃতকর্মের বিবরণ ফেরেশতাগণ লিখে থাকেন, কিন্তু বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করার নিমিত্তেই লিপিবদ্ধ করার সম্পর্ক স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজের সাথে করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنَّا لَهٗ كَاتِبُوْنَ

"নিশ্চয় আমি লিখে রাখি"।[১]

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

"এবং যে সকল জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীরা আর (দুনিয়াতে) ফিরে আসবেনা, একথা স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে"।

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

যেভাবে পূর্ববর্তী আয়াতে নেককার মোমেনদের শুভ পরিণতির কথা এরশাদ হয়েছে, এভাবে এ আয়াতে কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা রয়েছেঃ

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ

অর্থাৎ যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তারা কখনও আর দুনিয়াতে ফিরে আসতে পারবে না। আলোচ্য আয়াতে حرام শব্দটির অর্থ হল অসম্ভব, অকল্পনীয় অর্থাৎ যাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি আযাব দ্বারা, অথবা যাদের মৃত্যু হয়েছে, পৃথিবীতে তাদের প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব, অকল্পনীয়।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৭২

অথবা

এর অর্থ হল, যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তাদের অধিবাসীদের তওবা করা অসম্ভব।

অথবা

তাদের পৃথিবীতে পুনঃর্জীবন লাভ করা অসম্ভব।

অথবা

এর অর্থ হল, কেয়ামতের দিন শাস্তির জন্যে তাদের পুনরুত্থান না হওয়া অসম্ভব।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেনঃ যে জনপদবাসীকে আমি ধ্বংস করেছি তাদের দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়, সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।[১]

হযরত হাসান বসরী (রঃ) ও মুজাহেদ (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ لا يرجعون এর অর্থ হলো لايتوبون عن الشرك "তারা শেরক থেকে তওবা করবে না"। আর ইমাম কাতাদা (রঃ) এবং মুকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলঃ لايرجعون الى الدنيا অর্থাৎ তারা দুনিয়াতে ফিরে আসবে না।

এরশাদ হয়েছেঃ

"আর আমি যেসব জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করেছি তাদের পক্ষ সম্ভব নয় যে, তারা দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন না করে"।

প্রাণী মাত্রকেই অবশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতেই হবে। হাযির না হওয়া অকল্পনীয়। ইতোপূর্বে আমরা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছি যে, মৃত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির পক্ষেই দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নয়। এ পর্যায়ে কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীগণ তৃতীয় আরও একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন তা হল, "যাদেরকে আমি কুফরী ও নাফরমানীর জন্যে ধ্বংস করেছি, তাদের কুফরী থেকে প্রত্যাবর্তন করে হেদায়েত গ্রহণ করা সম্ভবই নয়"।

আয়াতের মর্মকথা

আয়াতের মর্মকথা হল, কোন জনপদবাসীকে ধ্বংস বা মৃত্যু মুখে পতিত করার পর দু'টি বিষয় সম্পূর্ণ অসম্ভবঃ

১. মৃত্যুর পর কারো পক্ষেই দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নয়,

২. মৃত্যুর পর আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির না হয়ে থাকাও সম্ভব নয়।

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ

"অবশেষে যখন ইয়াজুজ মাজুজকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে"।

এ আয়াত থেকে আখেরাত ও কেয়ামতের পূর্বের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। এ পৃথিবীর জন্যে একটি সময় নিদৃষ্ট রয়েছে। ঐ সময় শেষ হলে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫৪২
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯১

আর সেই ধ্বংসের পূর্ব লক্ষণ হল ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়া। তারও আগে অনেক আলামত দেখা যাবে। যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করা, দজ্জালকে হত্যা করা, এরপরই ইয়াজ্জুজ মাজুজ বের হয়ে আসবে, তারা এখন লৌহ নির্মিত দেয়ালের ভেতর আবদ্ধ রয়েছে, যা জুলকারনাইন নির্মাণ করেছিলেন, কেয়ামতের পূর্বে তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসবে। আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতের পূর্বের সেই ভয়াবহ অবস্থার কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে।

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ

থেকে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আলোচ্য অসম্ভব কাজ কবে পর্যন্ত অসম্ভব থাকবে? অর্থাৎ যতক্ষণ তার নিদৃষ্ট সময় না আসবে ততক্ষণ তা অসম্ভব থাকবে। আর সে সময় হল, কেয়ামতের আলামত সমূহের প্রকাশ কাল। এ পর্যায়ে প্রথম আলামত হল ইয়াজুজ-মাজুজের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়া, যখন তারা বের হয়ে যাবে আর তাদের সংখ্যা হবে অগণিত। ইয়াজুজ মাজুজের পরিচয় সম্পর্কে এ গ্রন্থের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।[১]

ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়ার পর কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যদি কোন ব্যক্তি ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়ার পর কোন বাছুর লালন-পালন করে তবে তার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই কেয়ামত সংঘটিত হবে।

কেয়ামতের আলামত

হযরত হোযায়ফা এবনে আসাদ গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা কথাবার্তা বলছিলাম। এমন সময় হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি বিষয়ে কথা বলছো? আমরা আরজ করলাম, কেয়ামত সম্পর্কে। তিনি এরশাদ করলেন, যে পর্যন্ত তোমরা কেয়ামতের পূর্বে দশটি আলামত না দেখবে সে পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবেনা। এরপর তিনি ধূর্ম নির্গত হওয়া, দজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ঈসা (আঃ) নাযিল হওয়া, ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়া, তিনটি স্থানে জমিন ধ্বসে যাওয়াঃ প্রাচ্য, প্রতীচ্য এবং জাজিরাতুল আরব। অবশেষে ইয়ামান থেকে একটি অগ্নি বের হবে যা মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের ময়দানে পৌঁছে দেবে উল্লেখ করেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, একটি অগ্নি ইডেন শহর থেকে বের হবে, যা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দশম আলামত বলেছেন প্রবল বায়ুকে, যা মানুষকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।[২] (মুসলিম শরীফ)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, এবনে জরীর এবনে যায়েদের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেনঃ "ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়া" হবে কেয়ামতের প্রাথমিক আলামত।

১। তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৯-৩৬

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫২৪

এবনে জরীর হোজায়ফা এবনে ইয়ামান থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের প্রথম আলামত হল দজ্জাল বের হওয়া, ঈসা এবনে মরয়মের আসমান থেকে অবতরণ করা, ইডেন থেকে অগ্নি বের হওয়া যা মানুষকে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে প্রভৃতি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।[১]

وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ

"এবং তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি থেকে ছুটে আসবে"।

অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজ জুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তাদের সংখ্যা অনেক বেশী হবে এবং তাদের গতিবেগ হবে অধিক। তাদের অবস্থা দেখে মনে হবে তারা যেন উপর থেকে নিচে নেমে আসছে। তাদের এ অভিযানকে কোন শক্তিই প্রতিরোধ করতে পারবে না। বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) মোমেনদেরকে নিয়ে কোহ-এ-তূরে আশ্রয় গ্রহণ করবেন এবং অন্যরা নিজ নিজ ব্যবস্থায় আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট থাকবে, অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ) তাদের ধ্বংসের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়ায় তাদের ঘাড়ে এক প্রকার রোগ সৃষ্টি করবেন যার কারণে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে।[২]

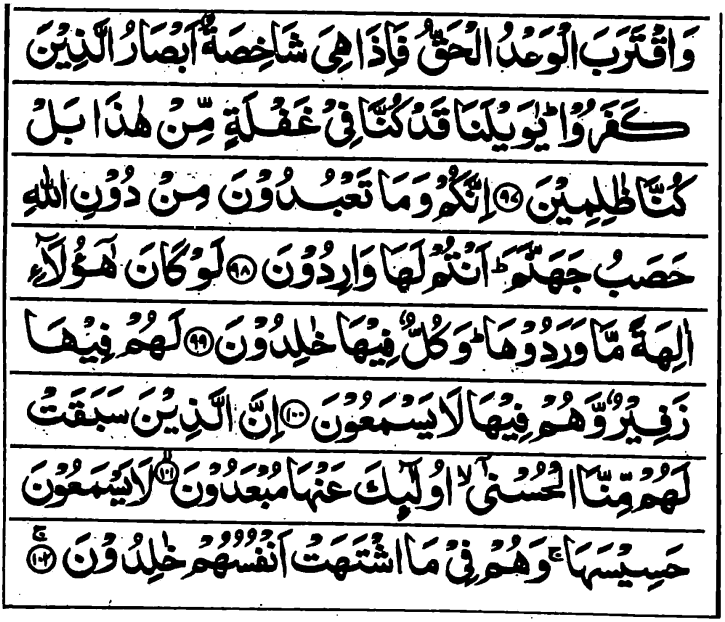
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ
كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ
كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ
آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا
زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ
لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ
حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

তরজমা

(৯৭) যখন অমোঘ প্রতিশ্রুতির সময় আসন্ন হবে, তখন হঠাৎ কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা এ বিষয়ে ছিলাম উদাসীন; বরং আমরাই ছিলাম সীমা লঙ্ঘনকারী।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬৯-৭০

২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৭২

(৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ পাকের পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলি দোযখের ইন্ধন, তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে।

(৯৯) এ দেবতারা যদি সত্যিকার উপাস্য হতো, তবে তারা দোযখে প্রবেশ করতো না, তাদের সকলেই তাতে স্থায়ী হবে।

(১০০) তারা সেখানে চিৎকার করতে থাকবে, তারা দোযখের মধ্যে কোন কিছুই শুনতে পাবেনা।

(১০১) নিশ্চয় যাদের জন্যে আমার নিকট থেকে পূর্ব থেকে কল্যাণ নির্দিষ্ট রয়েছে, তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে।

(১০২) তারা দোযখের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবেনা এবং সেখানে তারা মনের সুখে চিরকাল থাকবে।

তফসীরুল কোরআন

মানুষের কৃত কর্মের পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদানের জন্যে নিদৃষ্ট প্রতিশ্রুত সময় যখন ঘনিয়ে আসবে তখন কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত এবং আতংকিত হবে। তাদের জীবনের গাফলত, সত্য গ্রহণে তাদের অনীহা এবং সত্যদ্রোহিতা একে একে সবই মনে পড়বে। তখন তারা আক্ষেপ করতে থাকবে এবং বিলাপ করে বলবে, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, আমরা হাশরের দিন সম্পর্কে ছিলাম সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই আজ আমরা এত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। যদি আমরা দুনিয়াতে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহ করতাম, তবে আজ এত বড় বিপদে পড়তাম না, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

(তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা এ বিষয়ে ছিলাম উদাসীন, বরং আমরাই ছিলাম সীমা লঙ্ঘনকারী, আমরা ছিলাম জালেম) আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি, আমরা নিজেদের ভবিষ্যত চিন্তা করিনি, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-সামগ্রী সংগ্রহে ছিলাম ব্যস্ত, তৃপ্ত। আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে ছিলাম গাফেল।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের كُنَّا ظٰلِمِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ "আমরা ছিলাম জালেম"। জুলুম শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল, কোন বস্তুকে তার নিদৃষ্ট স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে রাখা। আর আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের বন্দেগী করা, আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা সবচেয়ে বড় জুলুম। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"নিশ্চয় শেরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম"।

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

"নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা হবে দোযখের ইন্ধন"।

মক্কার কাফের মুশরেকরা মনে করতো যে তাদের বানানো মূর্তিরা তাদের বিপদের সময় কাজে লাগবে, তাদের রক্ষা করবে, তাই তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছে যে, যাদের সাহায্য লাভ করবে বলে তোমরা আশা করছো, তোমাদের সেই বাতিল উপাস্যরাও তোমাদের সাথে দোযখের ইন্ধন হবে। তোমাদেরকে সাহায্য করার তো কোন প্রশ্নই উঠবে না।

مَا تَعْبُدُوْنَ

অর্থাৎ মূর্তি-প্রতীম, কাফেররা যাদের পূজা-অর্চনা করে অথবা বনী ইসরাঈলের সামেরী স্বর্ণ দ্বারা যে গরুর বাছুর তৈরী করেছিল এবং বনী ইসরাঈলকে তার পূজা করার আহ্বান জানিয়েছিল, বনী ইসরাঈলের যে ছয় লক্ষ লোক মিশর থেকে বের হয়ে আল্লাহ পাকের রহমতে লোহিত সাগর পার হয়ে এসেছিল, বারো হাজার লোক ব্যতীত তারা সবাই সামেরীর বানানো ঐ বাছুরটির পূজা করেছিল। এমনিভাবে ফেরআউন, নমরুদ যারা খোদাই দাবী করেছিল এবং মানুষ তাদেরকে উপাস্য মনে করেছিল এসবই আলোচ্য আয়াতের ما تعبدون من دون الله (আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর) কথাটির অন্তর্ভুক্ত। আর এসবই হবে দোযখের ইন্ধন। এখানে উল্লেখ্য, পথভ্রষ্ট লোকেরা এমন পবিত্র লোকদেরকেও উপাস্য মনে করতো যাঁরা কখনও এ অন্যায়কে পছন্দ করেননি, যেমন হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ওজায়ের (আঃ) এবং ফেরেশতাগণ, তাঁরা এ সতর্কবাণীর আওতায় আসবেন না।

আল্লামা আলুসী (রঃ) তাঁর তফসীরে রূহুল মাআনীতে এবং আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) তাঁর তফসীরে আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আল্লামা আলুসী (রঃ) একথাও লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ এবনে জুবারী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ প্রশ্ন করেছিল যে, আলোচ্য আয়াতের সতর্ক বাণী শুধু কি আমাদের উপাস্যদের উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হয়েছে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব দিয়েছিলেনঃ

لِكُلِّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

"শুধু তোমাদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে এ সতর্কবাণী নয়; বরং আল্লাহ পাক ব্যতীত যা কিছুর বন্দেগী করা হয় তার সম্পর্কেই এ সতর্কবাণী"।

حَصَبُ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ ঐ সকল বস্তু যা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার দ্বারা জাহান্নামের আগুনকে সবেগে উত্থিত করা হয়।

মুজাহেদ (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ইয়ামানী ভাষায় حَصَبُ বলা হয় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার জন্যে ব্যবহৃত কাঠকে। আর একরামা (রঃ) বলেছেন, এটি হলো আবিসিনীয় ভাষার একটি শব্দ যার অর্থ হলো অগ্নি প্রজ্জ্বলিতকারী কাষ্ঠ-খন্ড।

اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ

"তোমরা সেই দোযখে প্রবেশ করবে"।

এ আয়াতেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে কাফের মুশরেকদেরকে এবং তাদের বাতিল উপাস্যদেরকেও। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বাতিল উপাস্যদের সহ দোযখে প্রবেশ করবে আর তোমরা এবং তোমাদের দেবতারা দোযখের আগুনে পুড়তে থাকবে।

لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا

"যদি এ বাতিল উপাস্যরা সত্যিকার অর্থে মা'বুদ হতো তবে দোযখে নিক্ষিপ্ত হতো না"।

وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"আর প্রত্যেকেই (অর্থাৎ উপাসনাকারী ও উপাস্য সকলে) দোযখে চিরদিন থাকবে"। যদি তারা সত্যিকার মা'বুদ হতো তবে কখনও দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হতো না।

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ

"তারা সেখানে ফরিয়াদ করতে থাকবে"।

জাহান্নামের শাস্তি থেকে নাজাত লাভের জন্যে তারা চিৎকার দিতে থাকবে।

وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ

"আর তারা দোযখে (কিছুই) শুনতে পাবে না"।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম, এবনে আবিদ দুনিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন শুধু দোযখে সে-সব লোক থাকবে যাদের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী (কাফের মুশরেক), তাদেরকে সিন্দুকে পুরে তাতে পেরেক ঠুকে দেয়া হবে এবং দোযখের অতল তলে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তাদের প্রত্যেকেই এ ধারণা করবে যে, তাকে ব্যতীত আর কাউকে এত বেশী শাস্তি দেয়া হয়নি। এই হাদীস বর্ণনা করার পর হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লোহার সিন্দুক এবং লোহার পেরেকের স্থলে আগুনের সিন্দুক এবং আগুনের পেরেক উল্লেখ করেছেন এবং অবশিষ্টাংশ পূর্বোল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ।

হাকেম এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন আলোচ্য আয়াত

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

নাযিল হলো তখন মক্কার মুশরেকরা বললো, আল্লাহ ব্যতীত ঈসা (আঃ), ওজায়ের (আঃ) এবং ফেরেশতাগণেরও পূজা হয়, তবে কি তারা দোযখী বলে সাব্যস্ত হবে? তখন পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়, এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

"নিশ্চয় যাদের জন্যে আমার নিকট থেকে পূর্ব থেকেই কল্যাণ নির্দিষ্ট রয়েছে, তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে"।

জান্নাতবাসীর জন্য সু-সংবাদ

আলোচ্য আয়াতে الحسنى শব্দটির অর্থ উচ্চ মরতবা, নৈকট্যের মকাম অথবা সার্বিক কল্যাণ, অথবা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নেক আমলের তৌফিক, অথবা জান্নাতের সুসংবাদ। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো যাদেরকে আল্লাহ্ পাক এ জীবনে এসব কিছু বা এর কোন একটি দান করবেন তারা দোযখ থেকে থাকবে অনেক দূরে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাতীমে উপবিষ্ট ছিলেন। কয়েকজন কোরায়শ নেতাও সেখানে ছিল। তখন ৩৬০টি মূর্তি কা'বা শরীফে বর্তমান ছিল। নজর এবনে হারেস প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বললো। তিনি তার কথার জবাব দিলেন এবং তাকে নিরুত্তর করে দিলেন। এরপর তিনি

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ.....

থেকে তিন আয়াত পাঠ করে উঠে দাঁড়ালেন। তখন এবনে জুবারী এগিয়ে আসলো এবং বললো, আপনি কি একথা বলেন?

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'হ্যাঁ'। তখন এবনে জুবারী বললো, 'তাহলে ইহুদীরা কি ওজায়ের (আঃ)-এর আর খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর এবং অন্যরা ফেরেশতাদের পূজা করে না'? তিনি এরশাদ করলেন, 'না; বরং তারা পূজা করে শয়তানদের', তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا

"তারা দোযখের ক্ষীণতম শব্দও শ্রবণ করবেনা"।

অর্থাৎ যারা নেককার মোমেন, যাদের জন্য জান্নাতের আদেশ হয়েছে তারা যখন পুলসেরাত পার হয়ে যাবে তখন চির দিনের জন্যে দোযখ থেকে দূরে থাকবে। আর এত দূরে থাকবে যে, দোযখের ক্ষীণতম শব্দও তারা শুনতে পাবেনা। কেননা জান্নাত হলো সর্বোচ্চ স্থান–তথা ইল্লিয়্যীনে, আর দোযখ হলো নিম্নতম স্তরে।

চিরকাল মনের সুখে অতিবাহিত করবে

এ ক্ষুদ্র বাক্যটিতে জান্নাতের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, জান্নাত এমনি একটি স্থান যেখানে মানুষ প্রত্যেকটি জিনিস তার মর্জি মাফিক পাবে। যে খাদ্য-দ্রব্যের সে ইচ্ছা করবে তা সঙ্গে সঙ্গে হাযির করা হবে। যে ধরণের পোষাক সে পছন্দ করবে তা সে লাভ করবে। যে কাজ তার পছন্দ হবে তা সে করতে পারবে, যে কিতাব পাঠ করতে চাইবে তাকে তা দেয়া হবে। এমনকি, যে কোন বিশেষ মৌসুম পেতে চাইবে তার জন্যে সে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫২৮
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭১
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৯৪
তফসীরে রুহুল বয়ান খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৫২৪

মৌসুম সৃষ্টি করা হবে। মোট কথা, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে যদি কেউ আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক কাজ করে তবে আল্লাহ পাক জান্নাতে তাকে তার মর্জি মোতাবেক সব কিছু পাওয়ার তৌফিক দান করবেন। আর এ সুখ-সামগ্রী বা সুখী জীবন সাময়িক হবে না, বরং হবে চির কালের জন্য।

মূলতঃ বেহেশতের নেয়ামত হবে অনন্ত অসীম। মানুষের জন্যে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। বেহেশতের আনন্দ উল্লাসের কথা শুধু বর্ণনাতীতই নয়; বরং কল্পনাতীতও।[১]

আবু দাউদ, এবনে আবি হাতেম, সা'লাবী এবং এবনে মরদবিয়া তাঁদের তফসীরে লিখেছেনঃ একবার হযরত আলী (রাঃ) ভাষণ দিলেন এবং আলোচ্য আয়াত

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ.....

তেলাওয়াত করলেন, এরপর বললেন, 'এ আয়াতে যাঁদের কথা রয়েছে আমি তাঁদের অন্যতম এবং আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ), তালহা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), সাঈদ (রাঃ), আবদুর রহমান এবনে আউফ (রাঃ), আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ (রাঃ) তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত।[২]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম। তিনি বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে যাবেন, তখন তারা দোযখের ক্ষীণতম শব্দও শ্রবণ করবে না।[৩]

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۚ هٰذَا يَوْمُكُمُ
الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ
لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا
فَٰعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّٰلِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلَٰغًا
لِّقَوْمٍ عَٰبِدِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৬৭৪

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫২৯

৩। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭২
তফসীরে তাবারী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৭৭

তরজমা

(১০৩) ঐ মহা বিপদে তাদের কোন ভাবনা চিন্তা থাকবে না। আর ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করে বলবেন, তোমাদেরকে যেদিনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল আজই সেদিন।

(১০৪) সেদিন আমি আসমানকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। প্রতিশ্রুতি পালন করা আমার বৈশিষ্ট্য, আমি অবশ্যই তা পালন করবো।

(১০৫) আর আমি আসমানী কিতাব সমূহে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি, লওহে মাহফুজে লেখার পর, এই জমিনের মালিক হবে আমার নেককার বন্দাগণ।

(১০৬) এতে রয়েছে বাণী সেই সম্প্রদায়ে জন্য যারা এবাদত করে।

(১০৭) (হে রসূল!) আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দোযখের ক্ষীণ শব্দও শুনতে পাবেনা। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কেয়ামতের সেই মহা বিপদেও নেককার মোমেনগণ চিন্তিত হবেনা, হবেনা ভীত সন্ত্রস্ত।

ভয়াবহ বিপদ কখন হবে

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে الفزع الاكبر (ভয়াবহ বিপদ) শব্দ দ্বারা দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ

"আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান জমিনের অধিবাসী মাত্রই ভীত-সন্ত্রস্ত হবে"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) শিঙ্গার শেষ ফুঁক যাকে বলেছেন তা হল দুনিয়া শেষ হওয়ার মুহূর্তে যে ফুঁক দেয়া হবে, যে ফুঁকের পর দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। কেননা প্রথম বার শিঙ্গায় ফুঁক দিলেই সমগ্র মানব জাতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে।

কোনো কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এটি হল সেই ফুঁক যার কারণে সমস্ত মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবে, কেননা শিঙ্গার প্রথম ফুঁকেই সমগ্র মানব জাতি ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। ইমাম কুরতবী (রঃ) এ ব্যাখ্যাকে সঠিক বলেছেন। এর কারণ এই যে, অধিকাংশ হাদীসে দু'বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার উল্লেখ রয়েছেঃ

১. শিঙ্গায় যে ফুঁক দিলে মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হবে,

২. আর দ্বিতীয় ফুঁক হল, যা আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার জন্য দেয়া হবে, যার কারণে সকল মানুষ জীবিত হবে।

এবনে আরাবী (রঃ) বলেছেন, তিন বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবেঃ

১. যে ফুঁকে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে,

২. যে ফুঁকে মানুষের জ্ঞান ফিরে আসবে,

৩. যে ফুঁকে মানুষকে কেয়ামতের মাঠে একত্রিত করা হবে।

এবনে জরীর তাঁর তফসীরে, তেবরানী মোতাওয়ালাতে, আবু ইয়ালা মুসনাদে, আর বায়হাকী আল বাআসে, আবু মুসা মাদানী আল মুতাওয়ালাতে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত একখানি সুদীর্ঘ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই হাদীসে রয়েছে, তিনবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, যখন লোকদেরকে দোযখে নিয়ে যাবার হুকুম হবে তখন মহা বিপদ হবে।

আর এবনে জোরায়েয বলেছেন, মহা বিপদ তখন হবে যখন মৃত্যুকে জবেহ করে দেয়া হবে এবং বলা হবে, হে দোযখবাসী! তোমরা চিরদিন দোযখে থাকবে আর কখনও তোমাদের মৃত্যু হবে না।

সাঈদ এবনে যোবায়ের এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, মহা বিপদ তখন হবে, যখন দোযখকে বন্ধ করে দেয়া হবে। আর দোযখের দ্বার তখন বন্ধ করা হবে যখন দোযখ থেকে আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে বের করে ফেলবেন, এরপর আর কাউকে বের করা হবে না।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং দোযখীদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, তখন আল্লাহ পাক জীব্রাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন, তাঁর সাথে মৃত্যু থাকবে একটি দুম্বার আকৃতিতে। তখন জান্নাত ও দোযখের অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি একে চেন? উভয় পক্ষই না সূচক জবাব দেবে। তখন ঘোষণাকারী বলবেন, এটি হল মৃত্যু। এরপর তাকে জবেহ করা হবে। তখন জান্নাতবাসীকে বলা হবে, চিরদিন তোমরা জান্নাতে থাকবে। এমনিভাবে দোযখবাসীকেও বলা হবে, তোমরা চিরদিন দোযখে থাকবে, কখনও তোমাদের নিকট মৃত্যু আসবেনা, সেদিনই হবে ভয়াবহ বিপদের দিন।

আয়াতের মর্মকথা

সেই কঠিন মহা বিপদের মুহূর্তে নেককার মোমেনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হবেনা, তারা থাকবে নির্ভীক, বরং সেদিন আল্লাহ পাকের ফেরেশতাগণ নেককার মোমেনদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط

আর ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করে বলবেনঃ

هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

"আর পৃথিবীতে তোমাদেরকে যেদিনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, আজই সেদিন"। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, "তোমরা লাভ করবে অনন্ত অসীম নেয়ামত"।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫৩০

২। তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২২৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৯৮

হাকীমুল উম্মত মওলানা থানভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালা তাদের কখনও ভয় থাকবেনা, তাদের মন হবে নিঃশঙ্ক। আর আল্লাহ ওয়ালাগণ আল্লাহ পাকের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের কারণে এ নেয়ামত লাভ করে থাকেন।

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ

সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন আমি আসমানকে গুটিয়ে নেবো কাগজপত্র গুটিয়ে রাখার ন্যায়, প্রথমবারে সম্পূর্ণ নতুন করে যেভাবে আমি তোমাদেরকে তৈরী করেছিলাম, ঠিক তেমনি পুনরায় দ্বিতীয়বার তৈরী করবো। অর্থাৎ প্রত্যেকেরই সেদিনকে স্মরণ করা উচিত যেদিন আল্লাহ পাক (শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর) আসমানকে গুটিয়ে ফেলবেন যেভাবে কোন কাগজে কিছু লেখার পর তা গুটিয়ে ফেলা হয়, ঠিক সেভাবে আল্লাহ পাক আসমানকে গুটিয়ে ফেলবেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রহঃ), কাতাদা (রহঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোন কাগজে লেখা শেষ করার পর যেমন তা গুটিয়ে ফেলা হয়, তেমনি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন বিশাল বিস্তৃত আসমানকে গুটিয়ে ফেলবেন।

তফসীরকার সিদ্দিক (রহঃ) বলেছেন, সিজিল ওই ফেরেশতার নাম যিনি বান্দাদের আমল লিপিবদ্ধ করেন। যেভাবে সিজিল ফেরেশতা বান্দাগণের আমলনামা গুটিয়ে ফেলেন, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাক আসমানগুলোকে গুটিয়ে ফেলবেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, সিজিল সেই পাথরকে বলা হয় যার উপর কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর যে বস্তুর উপরই কোন কিছু লেখা হয় তাকেই সিজিল বলা হতে থাকে, যেমন কাগজ, চামড়া, হাড়, পাথর প্রভৃতি।

আল্লামা সয়ুতী (রহঃ) লিখেছেন যে, সিজিল হলো একজন ফেরেশতার নাম। আর এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সিজিল হলো একজন ফেরেশতার নাম।[১]

অর্থাৎ যেভাবে সৃষ্টির আদিতে আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনি তিনি দ্বিতীয়বারও তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করবেন। অথবা এর অর্থ হলো যেভাবে প্রথমবারের সৃষ্টি আমার জন্যে কঠিন হয়নি, ঠিক দ্বিতীয়বারের সৃষ্টিও কঠিন হবেনা। যদিও সৃষ্টি একাধিকবার হবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার সৃষ্টির পরও মানুষ পূর্বের ন্যায়ই হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, বাস্তব সত্য হলো এই যে, মানুষ দ্বিতীয়বার সৃষ্টির পরও হুবহু সেই মানুষটিই হবে, যাকে প্রথম বার তৈরী করা হয়েছিলো।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫৩১
তফসীরে কবীর খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২২৯
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭৩

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দন্ডায়মান অবস্থায় ভাষণরত ছিলেন, তিনি বললেন, তোমরা নগ্ন অবস্থায়, নগ্ন পায়ে খতনা ব্যতীত কবর থেকে বের হয়ে আসবে, আল্লাহ পাকের দিকে পদব্রজে যেতে থাকবে। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে এরশাদ করেন, সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পোষাক পরিধান করানো হবে।

وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ

'প্রতিশ্রুতি পালন করা আমার বৈশিষ্ট্য, আমি অবশ্যই তা পালন করবো"।

অর্থাৎ তোমাদেরকে অবশ্যই দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবো, নিঃসন্দেহে তোমাদের পুনরুত্থান হবে। তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করা হবে। যেহেতু আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন, তাই তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আল্লাহ পাকের ওয়াদা খেলাফ হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর এ সিদ্ধান্ত অটল, কোন অবস্থাতেই তার ব্যতিক্রম হবেনা। বিষয়টির প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এ বাক্য দ্বারা।

إِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ

"নিশ্চয় আমি তা পালন করবো"। অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদের পুনঃরুত্থান হবে।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ

"আর আমি আসমানী কিতাব সমূহে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি লওহে মাহফুজে লেখার পর, এই জমিনের মালিক হবে আমার নেককার বন্দাগণ"।

নেককার লোকদের উদ্দেশ্যে সুসংবাদ

যারা আল্লাহ পাকের একান্ত অনুগত বন্দা, যারা নেককার পরহেযগার, যারা আল্লাহ পাকের পূর্ণ তাবেদার এবং যারা তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসারী তারাই এ পৃথিবীতে এবং পরজগতে প্রাধান্য লাভ করবে, সৌভাগ্যবান হবে, তারাই হবে এ জগত ও পরজগতের যথার্থ উত্তরাধিকারী।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ

যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতের খোশ খবরী। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের নেককার বন্দাদের জন্যে দুনিয়ার ক্ষমতা ও আধিপত্য লাভের সুসংবাদ রয়েছে এ মর্মে যে, অদূর ভবিষ্যতে আমি আমার নেককার বন্দাদেরকে (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামকে) পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করবো। আর এটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত একথা লিখে দিয়েছি যে, দুনিয়ার ক্ষমতা নেককার বন্দাদেরকে প্রদান করা হবে।

আলোচ্য আয়াতে 'যবুর' শব্দ দ্বারা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাব যবুরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি যত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে সমস্তই এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, যবুর শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, লিপিবদ্ধ বিষয়। অতএব, এ আয়াতেও উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে ذكر শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল উপদেশ, নসিহত। এ স্থলে তৌরাত উদ্দেশ্য হতে পারে, অর্থ হবে তৌরাতের পর আমি যবুরেও উল্লেখ করে দিয়েছি যে, জমিনের উত্তরাধিকারী হবে আমার নেককার বন্দাগণ।

আর কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, এ আয়াতে ذكر অর্থ লওহে মাহফুজ। তখন অর্থ হবে, লওহে মাহফুজে উল্লেখ করার পর আমি আসমানী কিতাব সমূহে লিখে দিয়েছি যে, পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার নেককার বন্দাগণ।

আলোচ্য আয়াতের الارض (জমিন) শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণের চারটি অভিমত রয়েছেঃ

১. এর দ্বারা সিরিয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

২. রোম ও ইরানের জমিন উদ্দেশ্য করা হয়েছে– তথা রোমক সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য।

৩. الارض শব্দ দ্বারা সারা পৃথিবীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৪. الارض (জমিন) এর দ্বারা জান্নাতের জমিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, পবিত্র কোরআন যখন নাযিল হয় তখন পৃথিবীতে দু'টি বড় শক্তি বর্তমান ছিল। রোমক সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্য। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, عِبَادِى শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে মুসলমানগণকে, যাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, সেই পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামকে তদানীন্তন পৃথিবীর ক্ষমতা দান করবেন। আল্লাহ পাকের এ ওয়াদা পুরো হয়েছিল হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রা.)-এর যমানায়। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের মাত্র তের বছরের মধ্যে তদানীন্তন পৃথিবীর দু'টি পরাশক্তি সাহাবায়ে কেরামের হাতে ভূলুণ্ঠিত হয়। ইতিহাস সাক্ষী! এর আগে হাজার বছর ধরে উভয় শক্তিই একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ রত ছিল। কিন্তু কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারেনি। অথচ যখন তারা এমন লোকদের মোকাবেলায় আসলো যাদের কাছে ছিল ঈমান ও নেক আমল, তাদের মোকাবেলা করা ঐ দু'টি শক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা, তাঁদের নিকট ছিল ঈমানী শক্তি। আর দুশমনদের কাছে ছিল জাগতিক শক্তি। কিন্তু জাগতিক শক্তি দ্বারা কখনও ঈমানী শক্তির মোকাবেলা করা যায়না। ফেরাউন তার নয় লক্ষ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও হযরত মূসা (আঃ)-এর ঈমানী শক্তির মোকাবেলা করতে পারেনি। এমনিভাবে নমরূদ শক্তিশালী নৃপতি হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঈমানী শক্তির মোকাবেলা করতে পারেনি। বদরের রণাঙ্গনে কাফেরদের ১,০০০ লোকের সাজোয়া বাহিনী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর নিরস্ত্র-প্রায় ৩১৩ সাহাবায়ে কেরামের মোকাবেলা করতে পারেনি। ঠিক এমনিভাবে তদানীন্তন পৃথিবীর সকল শক্তি খোলাফায়ে রাশেদীনের

মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। আর এ আয়াতে নেককার লোকদের হাতে ক্ষমতা দেয়ার যে ঘোষণা করা হয়েছে, তা বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়েছে পরবর্তীতে। এতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের ক্ষমতা গ্রহণে আল্লাহ পাকের ওয়াদার বাস্তবায়ন হয়েছিল। কেননা, তাঁরা ছিলেন আল্লাহ পাকের নেককার বন্দা। ক্ষমতা পরিচালনার জন্যে যে যোগ্যতার প্রয়োজন তা তারা অর্জন করেছিলেন পবিত্র কোরআনের অনুশীলনে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণে।

এ আয়াতে যে ঘোষণা রয়েছে, নেককার লোকদেরকে পৃথিবীর ক্ষমতা প্রদান করা হবে, বিষয়টি পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতেও এরশাদ হয়েছে যেমন, সূরা আরাফে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

"নিশ্চয় পৃথিবী আল্লাহ পাকের, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে এর উত্তরাধিকারী করেন আর শুভ পরিণতি শুধু পরহেযগারদের জন্য"।

আর সূরা নূরে এরশাদ হয়েছেঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন"।

একটি প্রশ্ন

এ আয়াত দ্বারা নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে ক্ষমতা দান করবেন কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, সেই ক্ষমতা কোথায়?

জবাব

এ পর্যায়ে প্রথম কথা হল, আল্লাহ পাকের এ ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে। পৃথিবীর এক বিরাট অংশে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন, যখন ইসলামী আদর্শের সঠিক বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ইসলামী জীবন-বিধান পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগের পর উমাইয়া বংশের একশ' বছর, আব্বাসীয় বংশের ছয়শ' বছর এবং এর পাশাপাশি স্পেনে মুসলমানদের ক্ষমতা লাভ এবং উপমহাদেশে

মুসলমানদের ক্ষমতা বিস্তারে মাধ্যমে উক্ত ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। এমনকি আজও পৃথিবীতে ৪৭টি দেশ মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীন রয়েছে। পৃথিবীর সর্বাধিক স্বর্ণ এবং পেট্রোল মুসলিম দেশ সমূহে রয়েছে এবং পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে একজন হলো মুসলমান। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের জন-শক্তি, ধন-শক্তি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কারো থেকে কম নয়; বরং অনেকের চেয়ে অনেক বেশী।

মুসলমানদের অবনতি কেন?

কিন্তু এতদসত্ত্বেও বর্তমান যুগে মুসলমানদের এত অবনতি এবং লাঞ্ছনা কেন? এর কারণ হলো, এ যুগে মুসলমানদের সব কিছুই আছে; অভাব শুধু ইসলামের, অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে শুধু ইসলামের নামটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে। ইসলামী জ্ঞান, ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। পবিত্র কোরআন মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ পাক এখনও রেখেছেন, কিন্তু কয়জন তা শুদ্ধ করে পাঠ করতে পারে? ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে, এক কথায় জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন হচ্ছে না বললে আদৌ অত্যুক্তি হবে না।

অথচ কোরআনে করীমে মুসলমানদের সাহায্যের এবং বিজয়ের ওয়াদা যেখানেই করা হয়েছে সেখানেই দু'টি পূর্ব-শর্তও আরোপ করা হয়েছেঃ

১. ঈমান,

২. নেক আমল।

যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"আর তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়োনা এবং চিন্তিতও হয়োনা; তোমরাই হবে বিজয়ী যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও"।

এমনকি আলোচ্য আয়াতে عبادى الصّٰلحون অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর নেককার বন্দাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। অতএব ঈমান এবং নেক আমল এ ওয়াদা পূরণের জন্য পূর্বশর্ত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এ দু'টি শর্তই বর্তমান যুগে অনুপস্থিত। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী দুনিয়ায় অবনতির যে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে তার কারণ এই, কিছু লোক শুধু ইসলামের নাম নিয়ে থাকে; আসলে নিজেরা ঈমান ও নেক আমলের বেলায় একেবারেই গাফেল। এ ধরণের নামের মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ পাক পৃথিবীর ক্ষমতা প্রদানের কোন ওয়াদা করেননি।

যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হয়, যদি খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুগামী হওয়া যায়, তবে আজও মুসলিম জাতির উন্নতি-অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত, আল্লাহ পাকের সাহায্য অতি নিকটবর্তী।

পঞ্চম হিজরীতে যখন সারা আরবের কুফরী শক্তি যুক্ত ফ্রন্ট করে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করেছিল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রবেশের দ্বার-প্রান্তের সমতল ভূমিতে একটি পরিখা খনন করেছিলেন। স্বয়ং প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও মাটি কেটেছেন এবং মাটির বোঝা তুলে নিয়েছেন মস্তক মোবারকে, এক দিনের ঘটনাঃ একটি বড় পাথর কাটা কারো পক্ষেই সম্ভব হলোনা। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ পাথরটিকে স্বহস্তে আঘাত করলেন। ফলে পাথরের কিছু অংশ খন্ডিত হলো এবং তাতে বিদ্যুতের ন্যায় একটি ঝলক দেখা দিল। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেনঃ

ان الله زوى لى الارض فرائيت مشارقها ومغاربها وان امتى يبلغ ملكها ما زوى لى منها

অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাকে পৃথিবী দেখিয়েছেন, আমি দেখেছি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য। আর আল্লাহ পাক পৃথিবীর যতখানি আমাকে দেখিয়েছেন ততখানিতে আমার উম্মতের আধিপত্য বিস্তার হবে। মূলতঃ এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীর এক বিরাট অংশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছিলেন এবং যতদিন পর্যন্ত মুসলমানগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেছেন ততদিন পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে মুসলিম জাতি একক শক্তি হিসাবে পরিগণিত ছিল।

اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ

আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা এভাবেই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ

"এতে রয়েছে সুসংবাদ সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা এবাদত করে"।

অর্থাৎ যারা সত্য-সাধক, যারা আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে থাকে মশগুল, তাঁর স্মরণে থাকে তন্ময়, তারাই এ মহান বাণী দ্বারা উপকৃত হবে।

সূরার উপসংহার রূপে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তোমাদের হেদায়েতের জন্যে এই কোরআন নাযিল করেছেন এবং এমন নবী প্রেরণ করেছেন যিনি সমগ্র জগতের জন্যে রহমত এবং যাঁর অনুসরণের বরকতে তোমাদের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে। নেয়ামত, সৌভাগ্য এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব অর্জিত হয়েছে, আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। রসূলের দায়িত্ব ছিল শুধু আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া; আর তিনি তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, নিশ্চয় এই কোরআনে করীমে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছার যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকে, অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে যে নসীহত রয়েছে এবং যে প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী রয়েছে, তথা যে জীবন-বিধান রয়েছে এসবের মধ্যেই জান্নাতে প্রবেশের যাবতীয় উপকরণ বর্তমান রয়েছে। জান্নাতের যাত্রীদের জন্যে পবিত্র কোরআনে রয়েছে অতি সুন্দর কার্যকর, উপকারী পাথেয়।

অথবা بَلٰغ শব্দের অর্থ এখানে সাফল্য লাভের পন্থা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআনের উপদেশ গ্রহণ করবে তার জীবন সাফল্য মন্ডিত হবে। অবশ্য এ সুসংবাদ শুধু সেই মোমেনদের জন্যে যারা এক আল্লাহ পাকের এবাদত করে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "আবেদীন" অর্থ ওলামায়ে কেরাম। আর

কা'বে আহবার (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ ইসলামী উম্মাহ; যারা যথা-নিয়মে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে এবং রমজানের রোজা রাখে।[১]

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"(হে রসূল!) আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি"।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আমি বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি রহমত নাযিল করতে চেয়েছিলাম, তাদের প্রতি দয়া করতে প্রয়াসী হয়েছিলাম। তাই আমি আপনাকে পথ প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছি, আপনাকে জীবন্ত রহমত রূপে পাঠিয়েছি।

রহমতুল্লিল আলামীন

আমি আপনাকে সৃষ্টি জগতের জন্যে রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি। হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ انا رحمة مهداة

'আমি রহমত স্বরূপই প্রেরিত হয়েছি'।

(অর্থাৎ মানুষকে সৌভাগ্যবান করার লক্ষ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি) যে আমার আহ্বানে সাড়া দেয়না সে রহমতের ছায়ায় আসতে তৈরী হয়না। প্রশ্ন হতে পারে তিনি কাফেরদের জন্য কি করে রহমত হলেন? হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর জবাবে বলেছিলেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের জন্যে রহমত ছিলেন। কেননা, আল্লাহ পাক এই উম্মতের কাফেরদেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কারণেই সমূলে ধ্বংস করবেন না। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এমনিভাবে আল্লাহ পাক তাদের চেহারা পরিবর্তন করবেন না, যেমন পূর্বকালের কাফেরদের এ অবস্থাই হয়েছে।[২]

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য পয়গম্বরগণের ন্যায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন বিশেষ দেশ বা জাতির জন্য আগমন করেননি, বরং তাঁর আগমন হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে। তাঁর নবুওয়্যত প্রাচ্য-প্রতীচ্য, সাদা-কালো সবার জন্যে। কেয়ামত পর্যন্ত তিনিই একমাত্র নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না, তাঁর আদর্শ সার্বজনীন, তিনি নবুওয়্যতের আকাশের সূর্য। সূর্যের আলো থেকে যে বঞ্চিত হয় তা তারই দোষ, তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েত থেকে যে মাহরুম থাকে তা তারই অপরাধ।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫৩৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫৩৪

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে তার জন্যে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে রহমত হয়।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং মুত্তাকীদের জন্যে পথ-প্রদর্শক।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানব জাতির জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। এজন্যে এ নেয়ামতের শোকর-গুজার হওয়া প্রত্যেকেরই কর্তব্য।[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবী, তিনি শান্তিদূত, তিনিই মুক্তিদূত। সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে তিনিই রহমত। তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ। যারা যতখানি তাঁর অনুসরণ করেছে জীবন-সাধনায় তারা ততখানি সফলকাম হয়েছে। আর যারা তাঁর অনুসরণ থেকে বিরত রয়েছে তারা জীবন-সাধনায় শুধু ব্যর্থই হয়নি, বরং তাদের বিপদ হয়েছে অবধারিত।

বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এরশাদ করেছেনঃ

انما انا قاسم والله يعطى

"আমিতো শুধু বিতরণকারী, আল্লাহ পাকই দাতা"।

প্রশ্ন হলো, তিনি কী বিতরণ করেন? পরবর্তী বাক্যেই রয়েছে এর জবাব। আল্লাহ পাকই সব কিছু দান করেন, তিনি মহান দাতা, আর আল্লাহ পাক যা কিছু দান করেন, তার বিতরণকারীই হলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। মিসকিন, অনাথ-বিপদগ্রস্ত, বিধবা, মজলুম সকলের সাহায্যকারী ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আর তিনি দুর্গত মানবতার সেবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

"যারা যমীনে আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন"।

তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ ارحم ترحم

"তোমরা দয়া কর, তাহলে তোমাদের প্রতিও দয়া করা হবে"।

এমনকি তিনি এ নির্দেশও দিয়েছেন, যে জন্তুকে তোমার জন্যে হালাল করা হয়েছে তাকে জবেহ করার সময়ও দয়া কর। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেছেন, জবেহ করার সময় কিভাবে দয়া করবো? তিনি বলেছেন, জবেহ করার সময় ছুরিটি তেজ করে নাও। ছুরি ভোতা হলে জন্তুটির কষ্ট হবে।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৪০

বস্তুতঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন দয়া মায়ার প্রতীক, তিনি ছিলেন দুঃখীজনের বন্ধু। আর এ অর্থেই তিনি রহমতুল্লিল আলামীন, যা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم
مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي
أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ
الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا
الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

তরজমা

(১০৮) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে এক মা'বুদই তোমাদের মা'বুদ, তবে কি তোমরা নির্দেশ পালন করবে?

(১০৯) তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে সব দিকই যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি। আর তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা নিকটে কি দূরে, আমি তা জানিনা।

(১১০) তোমরা যা কিছু কথায় প্রকাশ কর, আর যা কিছু গোপন কর, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তা জানেন।

(১১১) এবং আমি সঠিক জানিনা, হয়তো এটি তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা এবং কিছু দিনের জন্যে তোমাদেরকে ভোগ করতে দেয়াই উদ্দেশ্য।

(১১২) রসূল বলেছেন, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দিও। আমাদের প্রতিপালক যে দয়াময়, তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছো তার বিরুদ্ধে আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি"।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের বর্ণনা ছিল এবং তিনি যে সমগ্র বিশ্বের জন্যে জীবন্ত রহমত হয়ে আগমন করেছেন তার ঘোষণা ছিল। এরপর আলোচ্য আয়াতে নিরঙ্কুশ তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান

রয়েছে। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত নবী রসূলগণের তবলীগের মূল কথাই ছিল তৌহীদ-তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন কিছুর সম্মুখে মাথা নত করোনা, আল্লাহ পাক এক, অদ্বিতীয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে এক মা'বুদই তোমাদের মা'বুদ"।

বস্তুতঃ তৌহীদের মহা সত্যটি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং অকাট্য। সমগ্র সৃষ্টি জগতই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এমনকি মানুষের নিজের দেহের মধ্যেও রয়েছে এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। অতএব, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই এ মহা সত্যকে অস্বীকার করতে পারেনা, তাই পরবর্তী বাক্যাংশে জিজ্ঞাসা করা হয়েছেঃ

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

তবে কি তোমরা নির্দেশ পালন করবে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে? আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলবে?

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ

"তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে সব দিকই যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি"।

অর্থাৎ কাফের মুশরেকদেরকে তৌহীদের কথা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পরও যদি তারা না মানে, যদি তারা এ মহান সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তবে (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন ঃ

اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ

"আমি তোমাদেরকে উভয় দিকই সমানভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের শুভ-পরিণতি কি, তা যেমন বুঝিয়ে দিয়েছি ঠিক তেমনি কুফরী ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি কি তা-ও তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি। কেননা, بعثت معلما "আমি শিক্ষক রূপেই প্রেরিত হয়েছি," আমি রহমত স্বরূপই প্রেরিত হয়েছি, সত্যের প্রচারই আমার কাজ, এ কাজ আমি যথাযথভাবে করেছি। যদি তোমরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাসী না হও, তবে তার শোচনীয় পরিণাম কি হবে সে সম্পর্কেও আমি তোমাদেরকে সতর্ক করেছি।

আলোচ্য বাক্যাংশের فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ তাৎপর্য হলো এই, আমি ওহীর কোন বিষয়ই গোপন রাখিনি। আমি সকলকে সমানভাবে সর্ব বিষয়ে অবগত করেছি। এর দ্বারা

বাতিল ফেরকা বাতিনীয়া এবং শিয়াদের একটি ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ হচ্ছে। কেননা, তাদের ধারণা হলো বিশেষ সাথীদের নিকট বিশেষ কথা বলা হয় এবং অন্যদের নিকট তা গোপন রাখা হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, আমি সব বিষয় সকলকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি।

وَاِنْ اَدْرِىْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ

অর্থাৎ তোমাদের কুফর শেরক ও নাফরমানী এবং আল্লাহর নবীকে অমান্য করার এবং পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করার ভয়াবহ পরিণাম স্বরূপ তোমাদের প্রতি যে অনিবার্য আযাবের কথা ঘোষণা করেছি তা অবশ্যই আসবে, কিন্তু কবে আসবে? আর সে আযাবের সময় নিকটে না দূরে? একথা সঠিকভাবে আমি বলতে পারিনা। এ বিষয়ের এল্‌ম একমাত্র আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে, তিনিই সব কিছু জানেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ

তোমরা যা কিছু কথায় প্রকাশ কর, আর যা কিছু গোপন রাখ নিশ্চয় আল্লাহ পাক তা জানেন, অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে তোমরা গোপনে যে ষড়যন্ত্র কর এবং প্রকাশ্যে যা কিছু বল সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। আর তিনি অবশ্যই তোমাদের শাস্তি বিধান করবেন।

وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

"এবং আমি সঠিক জানিনা, হয়তো এটি তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা এবং কিছু দিনের জন্যে তোমাদেরকে ভোগ করতে দেয়াই উদ্দেশ্য"।

অর্থাৎ তোমাদের অন্যায়-অনাচারের অনিবার্য শাস্তি আসন্ন, তার বিলম্বের কারণ আমি সঠিক জানিনা, তবে হতে পারে এটি তোমাদের জন্যে একটি পরীক্ষা।

অথবা যেহেতু মৃত্যু একদিন নির্দিষ্ট রয়েছে তাই তোমাদেরকে আত্মসংশোধনের সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যেই আযাব বিলম্বিত করা হচ্ছে।

অথবা তোমরা দুনিযার লোভ-লালসায়, আনন্দ-উল্লাসে, ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে থাকবে, তোমাদের পাপের বোঝা বৃদ্ধি হতে থাকবে এবং অবশেষে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

অথবা তোমাদের আযাবের জন্যে একটি সময় নির্দিষ্ট হয়ে আছে, যা শুধু আল্লাহ পাকই জানেন, আর সে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে রাখা হবে।

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ

(রসূল বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার ও কাফেরদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে ফয়সালা করে দিন) আর একথা সর্বজন বিদিত যে, ইনসাফের ভিত্তিতে এ ফয়সালাই হবে যে, কাফেরদেরকে আযাব দেয়া হোক এবং মোমেনদেরকে সেই আযাব থেকে রক্ষা করা হোক।

وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

"আর আল্লাহর নবী একথাও বলেন, আমাদের প্রতিপালক অনন্ত অসীম করুণাময়। তোমরা যে সব কথা বলছো তার বিরুদ্ধে আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি"।

অর্থাৎ কাফেররা যে মিথ্যা কথা বলে যে তাদেরই বিজয় হবে, ইসলামের পতাকা কয়েক দিনই উড্ডীন থাকবে, এরপর এর অস্তিত্ব থাকবে না। কাফেরদের ব্যাপারে যে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা যদি সত্য হতো তবে এত দিনে শাস্তি হয়েই যেতো; অথচ তা হয়নি। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ দোয়া কবুল করেছেন ঐতিহাসিক বদরে যুদ্ধের দিন। আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন এবং দান করেছেন মুসলমানদেরকে সুস্পষ্ট বিজয়।

তফসীরকারগণ على ما تصفون এর আরও একটি ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ তোমরা যে মিথ্যা ভিত্তিহীন কথা-বার্তা বল তার বিরুদ্ধে আমি আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করি। কাফেররা বলতো, আল্লাহ পাকের সন্তান-সন্ততি রয়েছে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাদুকর এবং কোরআনে করীম এক প্রকার কাব্য (নাউযুবিল্লাহে মিন জালেক)। তোমাদের এসব মিথ্যা অলীক কথা-বার্তার বিরুদ্ধে আমি দয়াময় আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রার্থী।

উল্লেখ্য, নবী রসূলগণ অনুরূপ ক্ষেত্রে এমন দোয়াই করে থাকেন। কেননা তাঁদের নিজেদের সত্যতা, সততা এবং আল্লাহ পাকের ন্যায় বিচার সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাস এবং আস্থা থাকে পরিপূর্ণভাবে, তাই তাঁরা এমন দোয়া করেন।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু অন্য নবীগণও দুশমনদের মোকাবেলায় এ দোয়া করতেন, এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এমন দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন, তাই তিনি জেহাদে যাওয়ার সময় এ দোয়া করতেন।

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, এবনে আবি হাতেম কাতাদা (রঃ) থেকেও এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[২]

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২রা মে ১৯৯৩; ১০ই জিলক্বদ, ১৩১৪ হিজরী রোজ রোববার রাত ১১টায় সূরা আম্বিয়ার তফসীর সমাপ্ত হলো। সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫৩৬

২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৪১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৫

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সূরা হজ্জ

মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ, রুকু-১০, আয়াত-৭৮

সূরা হজ্জ প্রসঙ্গে

তত্ত্বজ্ঞানীগণ সূরা হজ্জ মক্কী না মদনী সূরার অন্তর্ভুক্ত, সে প্রশ্নে একাধিক মত পোষণ করেছেন।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা হজ্জ মদীনা মোনাওয়্যারায় নাযিল হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত আছে।

এবনুল মুনজের কাতাদা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরা হজ্জ মদীনা শরীফে নাযিল হয়েছে, তবে এ সূরার ৪ খানি আয়াত মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, এ সূরা মদীনা শরীফে নাযিল হয়েছে তবে ১০খানি আয়াত মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে।

ইমাম কুরতবী (রহঃ) বলেছেন যে, এ সূরায় মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফে অবতীর্ণ আয়াত সমূহ একত্রিত হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সূরাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর, এর আয়াত সমূহ নাযিল হয়েছে রাত্রে এবং দিনে, ভ্রমণকালে এবং গৃহে অবস্থান কালে, মক্কা শরীফে এবং মদীনা শরীফে, শান্তিপূর্ণ অবস্থায় এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায়।

সূরা হজ্জের ফযিলত

আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজী, হাকেম, এবনে মরদবিয়া, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ সূরা হজ্জকে কি দু' সেজদার কারণে বিশেষ ফজিলত প্রদান করা হয়নি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হ্যাঁ, যে এ দু'টি সেজদা না করবে সে যেন এ সূরা পাঠ না করে।

হযরত খালেদ এবনে মেদান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দু'টি সেজদার কারণে পবিত্র কোরআনে সূরা হজ্জের বিশেষ ফজিলত রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) সূরা হজ্জ পাঠ করার সময় দু' সেজদা দিতেন এবং তিনি বলেছেন, এ সূরায় দু'টি সেজদার আয়াত থাকার কারণে সমগ্র কোরআনে এর

বিশেষ ফজিলত রয়েছে। আরও অনেক সাহাবায়ে কেরাম সূরা হজ্জ সম্পর্কে এ মতই পোষণ করতেন। পরবর্তীকালের মনীষীদের মধ্যে আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইমাম আহমদ (রহঃ) প্রমুখ এ মতই পোষণ করতেন। অবশ্য কোন কোন মনীষী বলেছেন, সূরা হজ্জে একটি সেজদার আয়াতই রয়েছে, যেমন হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) প্রমুখ। আর এ মর্মে এবনে আবি শায়বা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

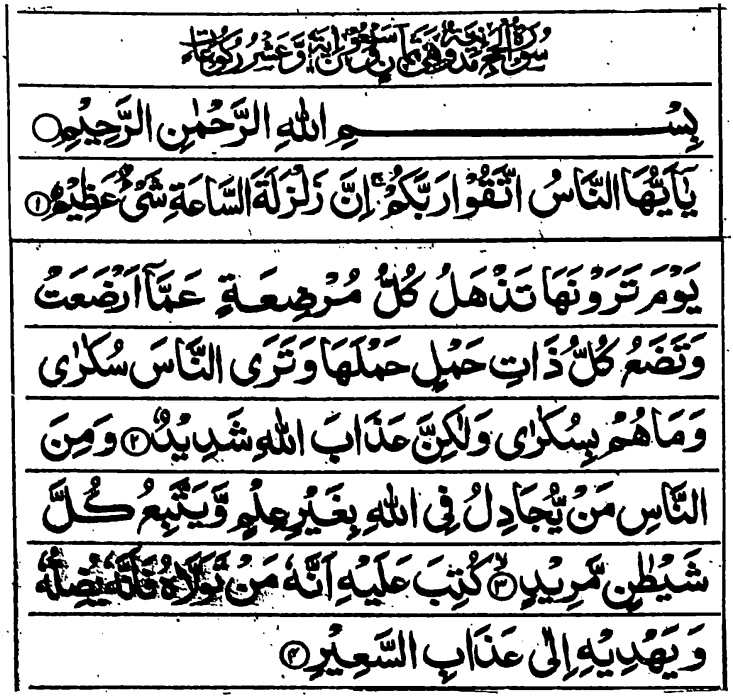

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ ثَمَانٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّعَشْرُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ①

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى
وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ② وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ
شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ③ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ
وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ④

তরজমা

(১) হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, নিশ্চয় কেয়ামতের ভূকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।

(২) যেদিন তোমরা তাকে দেখবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্য দানকারিনী ভুলে যাবে তার স্তন্যপায়ী শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে এবং তুমি মানুষকে দেখতে পাবে নেশাগ্রস্ত সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয় কিন্তু আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন।

১। তফসীরে ফতহুল কাদীর খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৩৪
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১০৯-১০
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৬

(৩) কোন কোন লোক রয়েছে যারা তাদের অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ পাক সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং তারা অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।

(৪) যে শয়তান সম্পর্কে এ নিয়ম করে দেয়া হয়েছে, যে কেউ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে নিয়ে যাবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

সূরা আম্বিয়ার শেষের দিকে তৌহীদ, রেসালত এবং আখেরাতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই এ সূরার প্রারম্ভেই কেয়ামতের মহা বিপদের উল্লেখ করে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে কেননা, কেয়ামতের কঠিন দিনে তাকওয়া পরহেযগারীই হবে মহা উপকারী সম্বল। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ

হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর অর্থাৎ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করতে থাক। অথবা এর অর্থ হলো তোমরা আল্লাহ পাকের আযাবকে ভয় করতে থাক আর আল্লাহর আযাবকে ভয় করার পন্থা হলো তাঁর নির্দেশিত কর্তব্য পালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা।

লক্ষ্যনীয়, আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ, যার পরে আর কোন বাণী আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হবেনা। আর এ মহান বাণী অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, আর সমগ্র বিশ্ব-মানবের কল্যাণ সাধনই হলো এর মূল লক্ষ্য এবং সমগ্র মানব জাতিকেই কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে। তাই يَاَيُّهَا النَّاسُ (হে মানব জাতি!) বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সমগ্র মানব জাতিকে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এরপর এ নির্দেশের কারণ স্বরূপ পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ

"নিশ্চয় কেয়ামতের ভূকম্পন অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, কেয়ামত উপলক্ষে দু' বার ভূমিকম্প হবে। একবার কেয়ামতের পূর্বক্ষণে যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ○ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا

অর্থাৎ পৃথিবীকে যখন তার কাঁপুনি কম্পিত করে তুলবে এবং ধরণী তার অভ্যন্তরস্থ ভার বের করে ফেলবে, আরো এরশাদ হয়েছেঃ

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا

'পৃথিবী যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে'। এমনি আরো বহু আয়াতে কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর দ্বিতীয়বার ভূকম্পন হবে যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে।

আলোচ্য আয়াতের উভয় অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে যে ভূকম্পনের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা হয়তো কেয়ামতের নিকট-পূর্বে যে ভূকম্পন হবে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর ইমাম এবনে জরীব তাবারীর মতে, আলোচ্য আয়াতে যে ভূকম্পনের কথা বলা হয়েছে তাহলো যে ভূকম্পন কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর হবে, যখন লোকেরা কবর থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে।

ইমাম তাবারী (রঃ) তাঁর বক্তব্যের দলিল স্বরূপ একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন, ভ্রমণরত অবস্থায় উচ্চস্বরে তিনি এ আয়াত দু' খানি তেলাওয়াত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাথী সাহাবায় কেরাম তাঁর নিকট সমবেত হলেন, হয়তো তিনি এ সম্পর্কে কোন কথা বলবেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা কি জান আলোচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তা কোন্ দিন? এটি সেদিন, যেদিন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে লক্ষ্য করে এরশাদ করবেন, হে আদম! দোযখের অংশ বের কর, আদম (আঃ) আরজ করবেন, হে আল্লাহ! কত অংশ থেকে? আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, প্রত্যেক হাজার থেকে ৯৯৯ জন দোযখের জন্যে, আর একজন জান্নাতের জন্যে।

একথা শ্রবণ করা মাত্রই সাহাবায়ে কেরাম ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা চিন্তা করোনা, তোমরা সন্তুষ্ট হও এবং নেক আমল করতে থাক। আমি আশা করি জান্নাতের অধিবাসীদের এক চতুর্থাংশ তোমরাই হবে। একথা শ্রবণ করে সমবেত সাহাবায়ে কেরাম "আল্লাহু আকবর" বললেন। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, হয়তো তোমরা বেহেশতবাসীদের এক তৃতীয়াংশও হতে পার। একথা শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম পুনরায় 'আল্লাহু আকবর' বললেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বেহেশতবাসীদের অর্ধেক সংখ্যক হবে, তখন পুনরায় সাহাবায়ে কেরাম 'আল্লাহু আকবর' বললেন।[১]

আয়াতের তাৎপর্য

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ কেয়ামতের মহা বিপদের কথা চিন্তা কর, সেই ভয়াবহ অবস্থার কথা উপলব্ধি করে সৎ কাজের দিকে ধাবিত হও এবং মনে রেখ, সেদিন আত্মরক্ষার পন্থা হবে শুধু তাকওয়া পরহেযগারী তথা আল্লাহর ভয়, আর কিছুই নয়।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১১১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৪২-৪৩

অতএব, জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চল এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর।

আলকামা এবং শাবী (রঃ)-এর মতে, এ ভূকম্পন হবে কেয়ামতের পূর্বেই। আর এটিই কেয়ামতের একটি আলামত হিসেবে পরিগণিত হবে।

আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী লিখেছেনঃ পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের পূর্বেই এ ভূমিকম্প হবে।

এবনে আরবী (রঃ) এবং কুরতবী (রঃ) এ মতই পছন্দ করেছেন। পরবর্তী আয়াত দ্বারাও একথা বোঝা যায়।[১]

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ

যেদিন তোমরা তাকে দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী মা ভুলে যাবে তার স্তন্যপায়ী শিশুকে। প্রসব করে ফেলবে প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ, অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বে যে ভূকম্পন হবে তা এত ভয়াবহ হবে যে প্রত্যেক মা তার দুগ্ধপায়ী শিশুকে পর্যন্ত ভুলে যাবে, আর যারা গর্ভবতী থাকবে তারা সেই মহাবিপদের ভয়ে প্রসব করে ফেলবে তাদের গর্ভ।

আলোচ্য আয়াতের مُرْضِعَةٍ শব্দটির অর্থ হল সেই স্ত্রীলোক যে তার সন্তানকে দুধ পান করায়, তবে ঠিক সেই কঠিন মুহূর্তে দুধ পান করাক বা না করাক, সকল অবস্থায় তার স্তন্যপায়ী শিশু সন্তানটিকে সে ভুলে যাবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। আর এ কথাও বলেছেন, ঐ মহা বিপদকালে ভয়ের কারণে গর্ভবতী নারী তার সন্তান প্রসব করে ফেলবে যা হবে ত্রুটিপূর্ণ।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, দৃষ্টান্ত দু'টি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হবে। তখনকার ভয়াবহ অবস্থার একটি বর্ণনা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى.....الاية

(আর তুমি লোকজনকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখবে অথচ তারা আদৌ নেশাগ্রস্ত নয়, তবে আল্লাহ পাকের আযাব অত্যন্ত কঠিন) আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, কেয়ামতের পূর্বে যে ভূকম্পন হবে আর আল্লাহ পাকের আযাবের যে আলামত দেখা যাবে তাতে মানুষ এমন ভীত সন্ত্রস্ত হবে, মনে হবে তারা যেন নেশাগ্রস্ত অথচ আদৌ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না, বরং আল্লাহ পাকের আযাবের ভয়েই মানুষের এ অবস্থা হবে। প্রত্যেকে অন্য মানুষের নেশাগ্রস্ত হওয়ার অবস্থা দেখতে পাবে কিন্তু নিজের কি অবস্থা সে খবর তার থাকবে না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ কেয়ামত উপলক্ষে যে ভূকম্পন হবে তা কেয়ামতের শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর এবং মৃতদের কবর থেকে উঠে আসার পরই হবে।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৬৭৬

আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত এমরান এবনে হোসাইন (রাঃ) এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াত দু' খানি বনীল মুস্তালেকের যুদ্ধে রাত্রিকালে নাযিল হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে ডাক দিয়ে একত্রিত করেছেন এবং এ আয়াত পাঠ করে শুনিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম আয়াত সমূহ শ্রবণ করে অত্যন্ত বেশী ক্রন্দন করলেন, এমনভাবে ক্রন্দন করতে আর কখনো দেখা যায়নি; সকাল হলো, লোকেরা অশ্বের পৃষ্ঠদেশ থেকে মালপত্র বের করেনি এবং পানাহারের ব্যবস্থা করেনি; বরং ক্রন্দনরত এবং চিন্তিতই রয়ে গেছে। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান এটি কোন্ দিন হবে?

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলই জানেন এদিন কোনদিন হবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এটি হবে সেদিন যখন আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে বলবেন, তোমার সন্তানদের থেকে দোযখের অংশ বের কর। হযরত আদম (আঃ) আরজ করবেন, কিভাবে, কতো হিসাবে? তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, প্রত্যেক হাজারের মধ্যে ৯৯৯ জন দোযখে যাবে আর একজন জান্নাতী। একথা শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ অবস্থায় কে নাজাত পাবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা সন্তুষ্ট হও এবং নেক আমল করতে থাকো, তোমাদের সঙ্গে আরো দু'টি সম্প্রদায় থাকবে যারা প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে অধিক সংখ্যক হবে অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজ। এরপর তিনি এরশাদ করেন, আমি আশাকরি জান্নাতবাসীদের মধ্যে আমার উম্মত হবে এক তৃতীয়াংশ। একথা শ্রবণ করে লোকেরা "আল্লাহু আকবার" বললেন এবং আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কররেন। এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি আশা করি তোমরা (উম্মতে মোহাম্মদী) বেহেশতবাসীদের অর্ধেক সংখ্যক হবে। সাহাবায়ে কেরাম এ সুসংবাদ শুনে "আল্লাহু আকবার" বললেন এবং আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করলেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এবার আমার আশা হচ্ছে জান্নাতবাসীদের দু' তৃতীয়াংশই হবে আমার উম্মত। জান্নাতবাসীদের ১২০টি কাতার হবে, তার মধ্যে ৮০টি কাতার আমার উম্মতের হবে। আর কাফেরদের মোকাবেলায় মুসলমানদের সংখ্যা এতো কম হবে যেন উষ্ট্রের পাজরে তিলের সমান অথবা অশ্বের পায়ে একটি অন্য বর্ণের চিহ্ন; বরং একটি সাদা গরুর পৃষ্ঠদেশে একটি কৃষ্ণ বর্ণের চুল। অথবা একটি কৃষ্ণ বর্ণের গরুর পৃষ্ঠে একটি সাদা চুল (অর্থাৎ কাফেরদের অনুপাতে মোমেনদের সংখ্যা অত্যন্ত কম হবে)। এরপর তিনি এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে বা হিসাব ব্যতীত জান্নাতে যাবে। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ৭০ হাজার? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ এবং প্রত্যেকের সঙ্গে আরও ৭০ হাজার। একথা শ্রবণ করে হযরত ওকাসা এবনে মোহেসেন (রাঃ) দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তুমি তাঁদের অর্ন্তভুক্ত রয়েছ। এরপর একজন আনসারী সাহাবী দন্ডায়মান হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন যেন

আমাকেও তাঁদের অর্ন্তভুক্ত করেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ওকাসা তোমার আগে এ সুযোগ নিয়ে ফেলেছে।[১]

যাহোক, আলোচ্য আয়াত সমূহে কেয়ামতের পূর্বের কঠিন বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর ঐ মহা বিপদ থেকে আত্মরক্ষার পথ-নির্দেশ করা হয়েছে, তা হলো তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা, আল্লাহ পাককে ভয় করা। শুধু এ পন্থায়ই মানুষ সেই মহা বিপদে আল্লাহ পাকের রহমত লাভে ধন্য হবে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, কেয়ামতের ঐ কঠিন বিপদে আল্লাহ পাকের একান্ত পেয়ারা বান্দাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হবেন না। কেননা, তাঁরা জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহ পাককে ভয় করে থাকেন। তাকওয়া পরহেযগারীই হলো তাঁদের বৈশিষ্ট্য। তাই অন্য আয়াতে তাঁদের সম্পর্কে এ নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছেঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ

অর্থাৎ সেই মহা বিপদও তাদেরকে চিন্তিত করবে না।

কিন্তু যেহেতু অধিকাংশ মানুষই পথভ্রষ্ট, তাই তারা সেদিন হবে বিপদগ্রস্ত। এজন্যে সাধারণভাবে কেয়ামতের কঠিন দিনের পূর্বে যে অবস্থা হবে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে আলোচ্য আয়াতে, যাতে করে প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাককে ভয় করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

"কোন কোন লোক রয়েছে যারা তাদের অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ পাক সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং তারা অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের"।

শানে নুযুল

এ আয়াত নাযিল হয়েছে নজর এবনে হারেস সম্পর্কে। এ লোকটি ছিল অত্যন্ত কলহ-প্রিয়। সে ছিল ইসলামের দুশমন, সত্যের দুশমন, মানবতার দুশমন। সে বলতো, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা, পবিত্র কোরআন পূর্বকালের লোকদের রচনা (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক), সে পরকালীন জিন্দেগীকে অস্বীকার করতো এবং বলতো মানুষ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, এরপর তার পুনর্জীবন সম্ভব নয় (এবনে আবি হাতেম)।[২]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেনঃ কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এ আয়াত আবু জেহেল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর কারো কারো মতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে উবাই এবনে খালফ সম্পর্কে।[৩]

আর আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে নজর এবনে হারেস সম্পর্কে। এ দূরাত্মা বলেছিল, 'তোমরা যে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বল তিনি কি স্বর্ণের না রৌপ্যের নাকি তামার'? তার এ প্রশ্নে আসমান প্রকম্পিত

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৭
তফসীরে তাবারী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৮৬-৮৭
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৮
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৮
৩। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১১৪

হয়ে উঠলো এবং তার মাথার খুলি উড়ে গেল। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে এক ইহুদী এমন প্রশ্ন করেছিল, ফলে আসমান থেকে বজ্রপাত হয়ে তাকে ধ্বংস করে দিল।[১]

আল্লামা শওকানী (রঃ) লিখেছেন, নজর এবনে হারেস লোকটি ছিল অত্যন্ত কলহ-প্রিয়, মূর্খ, অহংকারী। সে আল্লাহ পাকের কুদরতকে অস্বীকার করতো যে, তিনি মৃতদেরকে পুনর্জীবন দান করতে পারবেন না (নাউযুবিল্লাহি মিন জালেক)। আর কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল হয়েছে ওলীদ এবনে মুগীরা ও ওতবা এবনে রাবিয়া সম্পর্কে।[২]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের শানে নযুলের বর্ণনায় রয়েছে যে এ আয়াত নজর এবনে হারেস অথবা আবু জেহেল বা উবাই এবনে খালফ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কিন্তু আধুনিক যুগে ঐ দূরাত্মা কাফেরদের অনুরূপ ভ্রান্ত মত পোষণকারী দেখা যায় অনেককে, বিশেষতঃ যারা ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তাদেরকে দেখা যায় এমন অযৌক্তিক, অবান্তর এবং অজ্ঞতাপূর্ণ মন্তব্য করতে।[৩]

আয়াতের মর্মকথা

মানুষের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা স্বয়ং আল্লাহ পাক সম্পর্কে বেয়াদবীপূর্ণ মন্তব্য করে অথচ এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তাদের কথা-বার্তাও মূর্খতা প্রসূত। তাদের চিন্তা-চর্চায় তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। নিঃসন্দেহে তাদের জ্ঞানের দৈন্যের কারণেই তারা এ সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হতে চায়। মূলতঃ তারা উদ্ধত শয়তানের অনুসারী হয়। তারা আল্লাহ পাকের ডাকে এবং তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দেয় না; কিন্তু সাড়া দেয় অভিশপ্ত ইবলিস শয়তানের ডাকে এবং তার অনুসারী হয়।

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ

(আর শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ পাক লিখে দিয়েছেন, যে কেউ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে সে অবশ্যই তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে নিয়ে যাবে) অর্থাৎ আল্লাহ পাক অভিশপ্ত শয়তান সম্পর্কে পূর্বেই এ সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে, সেতো দোযখে যাবেই। যে বা যারা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে বা তার অনুসরণ করবে তারাও অবশ্যই দোযখে যাবে। কেননা, সে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং দোযখে পৌঁছে দেবে অর্থাৎ ইবলিস শয়তান তাকে এমন কু-কর্মে লিপ্ত করবে যা তার দোযখের শাস্তির কারণ হবে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-১৪৪
তফসীরে তাবারী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৮৯
২। তফসীরে ফতহুল কাদীর খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৩৯
৩। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৬৭৬

ইমাম এবনে জরীর তাবারী (রঃ) লিখেছেনঃ কাতাদা (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), এবনে যোরায়েজ (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ বলেছেন, যে কেউ শয়তানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে এবং তার অনুসারী হবে শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে দোযখের দিকে নিয়ে যাবে।[১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ
فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ
هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٦

তরজমা

(৫) হে মানব জাতি! যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তবে (জেনে রাখ যে) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, এরপর শুক্র থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর আকৃতি বিশিষ্ট এবং আকৃতি বিহীন মাংস খন্ড থেকে; আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাই। আর আমি যা ইচ্ছা করি একটি নিদৃষ্ট সময় পর্যন্ত মাতৃ-গর্ভে রেখে দেই। এরপর তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করি। এরপর যেন তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। আর তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয়, আর কোন কোন লোককে অকেজো বয়সে পৌঁছানো হয় যাতে বুদ্ধি-সুদ্ধির পর সে কিছুই বুঝতে না পায় (তথা সে সজ্ঞান থাকে না)। তুমি ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত কর; শুস্ক জমিন পড়ে রয়েছে। আবার যখনই আমি পানি বর্ষণ করলাম, তা সতেজ হয়ে উঠলো এবং শষ্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত হলো এবং সর্ব প্রকার সুন্দর বস্তু উৎপাদন করলো।

১। তফসীরে তাবারী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৮৯
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১১৪

(৬) আর এসব এজন্যে যে আল্লাহ পাক, তিনি ধ্রুব সত্য, আর তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী দূরাত্মা কাফের নজর এবনে হারেসের কথা বর্ণিত রয়েছে। এর পাশাপাশি যারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করে তাদের শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে যারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে সন্দিহান হয় তাদের সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে মানুষের সৃষ্টির ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে এবং মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির কথা স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে প্রথমবার যেভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তেমনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবেন; বরং দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি হবে প্রথমবারের তুলনায় সহজ। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

"হে মানব জাতি! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর তবে একথা জেনে রাখ যে, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে"।

মানব সৃষ্টির ইতিকথা

কেননা, আল্লাহ পাক আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন আর হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধর সমগ্র মানব জাতিকেও মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের আহার্য বস্তু মাটি থেকে উৎপন্ন হয়, আর ঐ আহার্য বস্তু থেকে তৈরী হয় রক্ত, সেই রক্ত থেকে উদ্ভূত হয় শুক্র কণা, সেই শুক্র কণা মায়ের উদরে প্রবেশ করে জমাট রক্তে রূপান্তরিত হয়, আর তা মাংসপিন্ডে পরিণত হয়। এরপর তাতে আল্লাহ পাক মানুষের আকার-আকৃতি দান করেন। আর তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতৃ-গর্ভে রেখে দেন যা পরবর্তীতে নবজাত শিশু হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ

অর্থাৎ "(হে মানব জাতি!) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, এরপর শুক্র কণা থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর মাংস খন্ড থেকে আকৃতি বিশিষ্ট খন্ড অথবা আকৃতি বিহীন খন্ড থেকে"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে, যারা দ্বীন ইসলামের বিরোধিতা করে তাদের উদ্দেশ্যে কেয়ামত এবং মানুষের পুনরুত্থানের দলিল পেশ করে এরশাদ হয়েছেঃ তোমাদের সৃষ্টির কথা তোমরা স্মরণ কর, তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টির কথা চিন্তা করে দেখ যে আমি তোমাদেরকে মাটি

থেকে সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমরা তারই বংশধর। এরপর তোমাদের সকলকে তুচ্ছ এক বিন্দু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। এই পানির বিন্দু প্রথমে জমাট রক্তের আকার ধারণ করে, এরপর মাংস-খন্ডে রূপান্তরিত হয়। চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র কণা তার নিজের অবস্থায় থাকে, এরপর আল্লাহ পাকের হুকুমে রক্তের লাল বর্ণ দেখা যায়, এরপর তা মাংস পিন্ডের আকার ধারণ করে। অবশ্য তাতে তখন কোন আকৃতি থাকে না। এরপর আল্লাহ পাক তাতে আকৃতি দান করেন। তখন একে একে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী হতে থাকে। কখনও তা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই গর্ভপাত হয়ে যায়। আর কখনও তা মাতৃ-গর্ভে থেকে যায় যা তোমরা অহরহ দেখতে পাও। যখন ঐ মাংস পিন্ডটির চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যে তাতে রূহ ফুঁকে দেয় আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা মোতাবেক সুন্দর, অসুন্দর আকৃতি তাকে দেয়া হয়, নর বা নারী বানানো হয়। পৃথিবীর জীবনে তার রিয্ক কি হবে? মৃত্যু কবে হবে? এবং সে ভাল হবে নাকি মন্দ- সবই লিপিবদ্ধ করা হয়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্মের অবস্থা এই যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র কণা মায়ের উদরে থাকে। এরপর আরও চল্লিশ দিন জমাট রক্ত অবস্থায় থাকে, এরপর আরও চল্লিশ দিন মাংস পিন্ডের আকৃতিতে থাকে। এরপর আল্লাহ পাক ফেরেশতাকে চারটি জিনিষ লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেন। তখন রিয্ক, আমল, মৃত্যু, ভাল কি মন্দ লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর ঐ মাংস পিন্ডে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। বর্ণিত আছে যে মাতৃ-গর্ভে শুক্র কণা যখন ধারণ করা হয় তখনই ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ! এটা কি সৃষ্টি হবে, কি হবে না? এজন্যে আলোচ্য আয়াতে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

হযরত আব্দুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ দু'টি শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ যে মানুষটির সৃষ্টি পরিপূর্ণ হয় তাকে مخلقة বলা হয়েছে। আর যার সৃষ্টি অপূর্ণ থাকে, তাকে غير مخلقة বলা হয়েছে।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, যাকে আকৃতি দেয়া হবে তাকে مخلقة বলা হয়েছে, আর যাকে আকৃতি দেয়া না হয় তাকে غير مخلقة বলা হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, مخلقة শব্দ দ্বারা সেই শিশুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে মাতৃ-গর্ভে মেয়াদ পূর্ণ করে সঠিক সময়ে জন্মগ্রহণ করে। আর غير مخلقة শব্দ দ্বারা সেই শিশু উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে সঠিক সময়ের পূর্বে গর্ভপাত হয়ে যায়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যে শিশু জন্ম হয় সঠিক অবস্থায়, নিখুঁতভাবে তাকেই مخلقة বলা হয়। আর যে শিশুর জন্ম হয় কোন ত্রুটি নিয়ে, যার কোন প্রকার অঙ্গ হানি হয় তাকে غير مخلقة বলা হয়।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৪৪

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এসব অভিমতের উল্লেখ করে বলেছেন, সঠিক কথা হলো এই, যে শিশুর সঠিক সময়ের পূর্বে গর্ভপাত হয়, তাকেই غير مخلقة বলা হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) আলকামার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন গর্ভ ধারণ করা হয় তখন একজন ফেরেশতা তাকে হাতে নিয়ে আরজ করে, "হে আমার প্রতিপালক! এটি مخلقة না غير مخلقة যদি আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ غير مخلقة তখন গর্ভপাত হয়ে যায়। আর ঐ মাংস পিন্ডে প্রাণ সঞ্চারিত হয় না। আর আল্লাহ পাক যদি এরশাদ করেনঃ مخلقة তখন ফেরেশতা আরজ করেঃ নর কি নারী? ভাগ্যাহত কি ভাগ্যবান? তার বয়স কত? আমল কেমন? তার রিয্ক কী? তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আদেশ হয়ঃ লওহে মাহফুজ দেখে নাও, তাতে সব কিছু পাওয়া যাবে। তখন ফেরেশতা লওহে মাহফুজ দেখে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে, আর তার একটি কপি নিজের কাছে রাখে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ বিবরণে আরও কিছু কথা সংযোজন করেছেনঃ এরপর শিশুটির জন্ম হয়, তার জন্যে নির্ধারিত সময়ে সে জীবন-যাপন করে, তার জন্যে নিদৃষ্ট রিয্ক সে লাভ করে, তার জন্যে নিদৃষ্ট স্থানে সে গমনাগমন করে, এরপর সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং তাকে দাফন করা হয় সে স্থানে যার কথা তার তকদীরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী আমের (রাঃ) আলেচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) এ পর্যায়ে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি এভাবে হয়েছে যে, মাতৃ-গর্ভে শুক্র কণা চল্লিশ দিন অতিবাহিত করেছে। এরপর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়েছে এবং অনুরূপভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়। এরপর মাংস পিন্ডে পরিণত হয়। তাতেও অনুরূপ সময় অতিবাহিত হয়। এরপর আল্লাহ পাক তার নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং সে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয় এবং চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়ঃ ১. রিয্ক, ২. আয়ু, ৩. আমল এবং ৪. নেককার বা বদকার। সেই আল্লাহ পাকের শপথ! যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জান্নাতীদের আমল করতে থাকে এবং তার মধ্যে এবং জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে। কিন্তু তার তকদীর প্রাধান্য বিস্তার করে। তখন সে দোযখীদের আমল করে এবং দোযখে প্রবেশ করে। আর তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দোযখীদের আমল করে, এমনকি তার মধ্যে এবং দোযখের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে, তখন তার তকদীর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সে জান্নাতীদের আমল করে ও জান্নাতে প্রবেশ করে।[২]

لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৪৫
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৮

আর আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাই, তোমরা যেন আমার অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত দেখতে পাও, হাশরের দিন পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হও। আর কোন কোন তফসীরকার এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাই, পৃথিবীতে তোমাদের কি কি করণীয় রয়েছে, আর কি কি বর্জনীয়।

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

আর একটি নিদৃষ্ট সময় পর্যন্ত আমি যা কিছু চাই মায়ের উদরে রেখে দেই, অর্থাৎ যতদিন ইচ্ছা আল্লাহ পাক সন্তানকে মাতৃ-গর্ভে রেখে দেন যার সময় কমপক্ষে ৬ মাস, উর্দ্ধে ২ বছর থেকে চার বছর পর্যন্ত।

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

এরপর তোমাদেরকে মাতৃ-গর্ভ থেকে শিশু রূপে বের করি।

মানুষকে মাতৃ-গর্ভে বিভিন্ন স্তর পার হতে হয়, এরপর শিশু অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হতে হয়।

ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

এরপর তোমরা যাতে নিজের যৌবন শক্তিতে উপনীত হতে পার অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে লালন-পালন করি, যাতে করে তোমরা যৌবন শক্তিতে উপনীত হতে পার। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্যের বিভিন্ন অবস্থা ও স্তর মানুষকে এ জীবনে অতিক্রম করতে হয়, যিনি মানব জীবনে এত পরিবর্তন আনেন, তিনিই মানুষকে কেয়ামতের কঠিন দিনে হাযির করবেন।

وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ

আর তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় (পরিণতি বয়সে পৌছে বা তার পূর্বে)।

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

আর কোন কোন লোককে অকেজো বয়সে পৌছান হয় অর্থাৎ অত্যন্ত বার্ধক্যে পৌছান হয় আর অবস্থা তাদের এই হয়–

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

যে বুদ্ধি-সুদ্ধির পর সে কিছুই বুঝতে পারে না, তথা সে অজ্ঞান হয়ে যায়, অথচ ইতিপূর্বে সে অনেক কিছুই জানত, কিন্তু বার্ধক্যের কারণেই সে জানা কথাও ভুলে যায়। যেভাবে শৈশবে বুদ্ধি-সুদ্ধির অভাবে সে অনেক কিছুই জানতো না, ঠিক এমনিভাবে বার্ধক্যের কারণেও যা কিছু জানতো সবই সে ভুলে যায়।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের বরকত

তফসীরকার একরামা (রহঃ) বলেছেন, যে পবিত্র কোরআন নিয়মিত পাঠ করে তার এ অবস্থা হয় না। বস্তুতঃ এ জীবন যেমন সত্য, ঠিক তেমনি পরজীবনও সত্য। এ পৃথিবীতে মানুষের আগমন যেমন সত্য, পরজীবনও তেমনি সত্য। মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য এসব

বিভিন্ন অবস্থা আসতে থাকে এবং বিদায় হতে থাকে। আর এই আসা এবং যাওয়া সব কিছুই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয়। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ পাকই, সবকিছু তিনিই করেন। এ পৃথিবীতে মানুষের আগমন যেমন আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, এখান থেকে গমনও তাঁরই ইচ্ছাধীন। এখানে প্রত্যেকটি অবস্থার পরিবর্তন, জীবন ও মৃত্যুর আগমন এ কথারই প্রমাণ যে, আল্লাহ পাক মৃত ব্যক্তিকে পুনঃ জীবন দান করবেন, যেভাবে অজ্ঞতার পর আসে জ্ঞান, তেমনি জ্ঞানের পর আসে অজ্ঞতা, আর যা কিছু জ্ঞান অর্জন করা হয়েছিলো মানুষ তা ভুলে যায়। শারীরিক, মানসিক শক্তি সবই এক সময় বিদায় নেয়। যে মানুষটির অস্তিত্ব ছিল না তাকে আল্লাহ পাক অস্তিত্ব দান করেন, যার স্বাস্থ্য ছিল না তাকে স্বাস্থ্য দান করেন, ঠিক যেভাবে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে জীবনের অবসান ঘটে, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন মানুষকে পুনঃজীবন দান করবেন, এটি চির সত্য।[১]

وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً

আর তুমি দেখছো নিরস জমি পড়ে রয়েছে কিন্তু যখনই আমি তাতে পানি বর্ষণ করলাম সঙ্গে সঙ্গে তা সতেজ হয়ে গেলো, ফুলে উঠলো এবং সব রকম সুন্দর সুন্দর বস্তু উৎপাদন করলো। অর্থাৎ মানুষ এ মৃত শুষ্ক জমিনের প্রতি কেন লক্ষ্য করেনা? বৃষ্টিপাতের পূর্বে জমিন যেন নিরস, এমনকি মৃত কিন্তু যখনই আল্লাহ পাকের রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয় তখন সেই মৃত শুষ্ক জমিনই প্রাণবন্ত, ফলে-ফসলে, শস্য-শ্যামলীমায় ভরপুর হয়ে ওঠে। লতা-পাতায় দেখা যায় ফল আর ফল, তোমরা অহরহ মৃত ধরণীকে পুনঃজীবিত হতে দেখ, এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক মৃত মানুষকে কেন জীবিত করতে পারবেন না, এ সত্যও কি তোমাদের বোধগম্য হয় না?

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

"আর এসব শুধু এজন্যে যে আল্লাহ পাক তিনিই যে সত্য, তিনিই মৃতকে জীবিত করেন আর তিনিই সব কিছু করতে সক্ষম"।

অর্থাৎ ইতিপূর্বে মানব সৃষ্টির যে কথা বলা হয়েছে এবং চাষাবাদের জমির যে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে তাতে কয়েকটি বিষয় দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ঃ

১. আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ধ্রুব সত্য, অনস্বীকার্য, তাঁর একত্ববাদ সন্দেহাতীত, চিরসত্য, যদি তা না হতো তবে এমন সুন্দর, সুশৃংখল, সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংহত পৃথিবীর অস্তিত্ব চিন্তাও করা যায় না।

২. আল্লাহ পাক মৃতকে করেন জীবিত, প্রাণহীন নির্জীবকে করেন সজীব, মৃত শুস্ক জমিনকে করেন প্রাণবন্ত এবং তাকে দান করেন উৎপাদনী শক্তি।

৩. আরও লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন, কোন কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নেই, তাই বর্তমান জীবনের অবসানের পর পুনঃজীবনের কথা অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২১

যেহেতু এ বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর সৃষ্টি অহেতুক নয়, নিরর্থক নয়; বরং এর এক মহান উদ্দেশ্য রয়েছে আর সে উদ্দেশ্য কার জীবনের সাধনায় সফল হয়েছে? আর কার ভাগ্যে দেখা দিয়েছে ব্যর্থতা? তা পরীক্ষার জন্যেই হাশরের ময়দানে হাযির করা হবে প্রত্যেককে এবং প্রত্যেকের কৃতকর্মের বিচার হবে, সৎ কর্মের শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত, আর অন্যায় আচরণের তথা কুফর শেরকের শোচনীয় পরিণাম অবধারিত। তাই হাশরের ময়দানে উপস্থিতি অনিবার্য।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন সমগ্র বিশ্ব জগৎ, তিনিই মানুষকে দান করেছেন তার অস্তিত্ব, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, কোন কিছুই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়, তিনি অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দান করেন আর তিনিই সমগ্র মানব জাতিকে পুনঃজীবিত করবেন এবং হাশরের ময়দানে তিনিই সকলকে সমবেত করবেন।[১]

وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ
فِى الْقُبُوْرِ ۝٧ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝٨ ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٩ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝١٠ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ
فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ عَلٰى
وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝١١

তরজমা

(৭) আর কেয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর কবরে যারা আছে আল্লাহ পাক তাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করবেন।

(৮) আর মানুষের মধ্যে কোন কোন লোক আল্লাহ পাকের সম্পর্কে তর্ক করতে যায়; অথচ তাদের কোন জ্ঞান নেই, তাদের নিকট কোন হেদায়েতও নেই এবং সুস্পষ্ট কোন গ্রন্থও তাদের নিকট নেই।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২২

(৯) যে বিতর্কে লিপ্ত হয় সে ঘাড় বাঁকিয়ে লোকদেরকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই তা করে। দুনিয়াতে তার জন্যে রয়েছে অপমান আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে আস্বাদ করাবো দহন যন্ত্রণা।

(১০) (সেদিন তাকে বলা হবে,) 'এসব তোমার কৃতকর্মেরই পরিণতি'। কেননা, আল্লাহ তাঁর বন্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

(১১) আর কোন কোন লোক আল্লাহ পাকের এবাদত করে দ্বিধার সাথে। তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়, আর যদি কোন বিপর্যয় ঘটে তবে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামতের দলিল-প্রমাণ ও মানব জাতির পুনরুত্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا

"আর কেয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই"।

অথবা কথাটিকে এভাবে বলা যায় যে, মানুষের পুনরুত্থানের দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হওয়ার পর পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে শক্তিশালী। অতএব, যিনি প্রথম সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষের পুনরুত্থানেও সক্ষম। আর আলোচ্য আয়াতে তারই ঘোষণা রয়েছে সুস্পষ্ট ভাষায়ঃ

وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا

কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী

"আর নিশ্চয় কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই"।

অর্থাৎ একদিন এ পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়বে, কেয়ামত কায়েম হবে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে সেদিন তার প্রতিপালকের দরবারে হাযির হতে হবে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

"আর কবরে যারা আছে আল্লাহ পাক তাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করবেন"।

একথা নিশ্চিত যে, যারা কবরে রয়েছে আল্লাহ পাক তাদেরকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং তাদেরকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন। যেমন সূরা আলে-এমরানে এরশাদ হয়েছেঃ

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ

"হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি একদিন সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই"।

যেহেতু আল্লাহ পাক এর ওয়াদা করেছেন তাই কোন অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম হবে না। কেননা, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না"।

কেয়ামত কায়েম হওয়ার যৌক্তিকতা

একথা সর্বজনবিদিত যে, মানব জাতির সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা এবং তাঁর এবাদত করা। এবাদত বন্দেগীর জন্যে মা'রেফাত লাভ করা পূর্বশর্ত। আর এবাদতের ভিত্তিতেই পুরস্কার ও শাস্তি নির্ধারিত হবে। আর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা না হলে মোমেন ও কাফের, নেককার ও বদকার, পাপীষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ সব সমান হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় عدل বা ন্যায় বিচার অকল্পনীয়। অথচ আল্লাহ পাক কারো প্রতি জুলুম করেন না। তিনি ন্যায় বিচার কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন।

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ (সূরা নহল)

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক ন্যায় বিচার ও পরোপকারের আদেশ দেন"।

আর নিজেও ন্যায় বিচারের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই হাশরের ময়দানে সকলকে একত্রিত করা হবে এবং প্রত্যেকের কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ করা হবে। আর প্রত্যেককে তার কর্মের সঠিক বিনিময় দেয়া হবে, এজন্যেই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

(সূরা বাকরাহ)

"সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে যাবে, এরপর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় পুরোপুরিভাবে দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না"। তথা ন্যায় বিচার কায়েম করা হবে। আর এ ন্যায় বিচারের জন্যেই কেয়ামত কায়েম হওয়ার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

"আর মানুষের মধ্যে কোন কোন লোক আল্লাহ পাকের সম্পর্কে তর্ক করতে যায়, অথচ তাদের কোন জ্ঞান নেই"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে পথভ্রষ্ট অনুসারীদের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে তারা যাদের অনুসরণ করে সেই পথভ্রষ্ট মুশরেকদের কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, সমাজে এমন কিছু হঠকারী ও জেদী লোক রয়েছে

যাদের নিকট কোন যুক্তি প্রমাণ নেই, কোন গুণ জ্ঞানও নেই, কোন সুস্পষ্ট গ্রন্থও নেই, তারপরও তারা আল্লাহ পাক সম্পর্কে অযথা বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং দম্ভ ভরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ পাকের একত্ববাদের অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দেখা সত্ত্বেও এ মহা সত্য মেনে নিতে তারা অস্বীকৃতি জানায়। যেমন, ফেরাউন ও তার দলবল হযরত মূসা (আঃ)-এর বিস্ময়কর মোজেযা সমূহ দেখেও ঈমান আনেনি। এমনিভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা (মোজেযা) দেখেও মক্কার অনেক কাফের তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তাঁর বিরোধিতা পরিহার করেনি। এজন্যেই তাদের শাস্তি ঘোষিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতেঃ

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ

"তার জন্যে পৃথিবীতে রয়েছে অবমাননা, আর কেয়ামতে তাকে আমি অগ্নির শাস্তি ভোগ করাবো"।

خزى শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, অবমাননা। আর ব্যবহারিক অর্থ হল, নিহত হওয়া, বন্দী হওয়া। এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। নজর এবনে হারেস, আকাবা এবনে আবি মুয়ীত যারা আল্লাহ পাকের শানে বেয়াদবীপূর্ণ কথা বলেছিল, তারা নিহত হয়। আর বদরের যুদ্ধে এমনি আরো সত্তর জন কাফেরকে হত্যা করা হয়, আরও সত্তর জন কাফের বন্দী হয়।

বিখ্যাত তফসীরকার জালালুদ্দিন মহল্লী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবু জেহেল সম্পর্কে, বদরের যুদ্ধে সে নিহত হয়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের علم শব্দটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যে এলম প্রতিটি মানুষের জন্যে একান্ত জরুরী তা তাদের কাছে নেই। আর هدى শব্দটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সেই জ্ঞান যা আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করার জন্যে সহায়ক হয়। আর كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ দ্বারা ওহীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মানুষের জ্ঞান অর্জনের এ তিনটি সূত্র রয়েছে। একান্ত জরুরী প্রকাশ্য জ্ঞান, চিন্তা-চর্চা, যুক্তি-বুদ্ধি প্রসূত জ্ঞান, অথবা আল্লাহ পাকের প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। জ্ঞানের এ তিনটি সূত্রের কোনটিই তাদের কাছে ছিল না। কিন্তু তারপরও তারা আল্লাহ পাককে অস্বীকার করতো এবং অহংকার করতো। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তারা অহংকার করে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে নিজেদের পার্শ্ব ফিরে চলে। কোন কিছু অমান্য করার সময় মানব দেহের যে অঙ্গটি মানুষ ঘুরিয়ে নেয় তাকে عطفه বলে। অর্থাৎ এ কাফেররা অহংকার করে বিমুখ হয় সত্য থেকে।

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো দম্ভ ভরে ঘাড় বাঁকা করা, অর্থাৎ যখন সত্য গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন সে অহংকার করে ঘাড়

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৩

বাঁকা করে চলে যায় এবং সত্যকে অমান্য করে। তফসীরকার এবনে আতিয়্যাহ, এবনে যায়েদ এবং এবনে যোরায়েজও আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[১]

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

(সেদিন তাকে বলা হবে) এসব তোমার কৃতকর্মেরই পরিণতি কেননা, আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে দোযখে ফেলে কঠিন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে, এ শাস্তি তোমার কৃতকর্মেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি কখনও জুলুম করেন না। যদি জালেমকে শাস্তি না দেয়া হয় তবে তাও জুলুম। যেমন, যে অন্যায় করেনি, তাকে শাস্তি দেয়া জুলুম হয়, অতএব, অন্যায়কারীদেরকে যথারীতি শাস্তি দেয়াই ন্যায় বিচার ও যুক্তিযুক্ত।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ

"আর কোন কোন লোক আল্লাহ পাকের এবাদত করে দ্বিধার সাথে"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে অবিশ্বাসীদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। যারা প্রকাশ্যে দ্বীন ইসলামের বিরোধিতা করতো, কেয়ামতকে অস্বীকার করতো এবং আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করতো তাদের অবস্থা বর্ণনা করে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে সে সব লোকদের আলোচনা স্থান পেয়েছে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনতো না; বরং প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করলেও অন্তরে সন্দেহ পোষণ করতো। যদি জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ হত, তাহলে দ্বীন ইসলামে থাকতো পক্ষান্তরে, যদি তাদের কোন স্বার্থ বিনষ্ট হত, তবে ইসলাম ছেড়ে দিত।

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কিছু লোক মদীনা মোনাওয়্যারায় আসতো এবং ইসলাম গ্রহণ করতো। যদি এরপর তাদের আর্থিক উন্নতি হত, তাদের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করতো তবে বলতো এ ধর্মটি ভাল। পক্ষান্তরে যদি ইসলাম গ্রহণের পর কোন প্রকার আর্থিক অসুবিধা দেখা দিত, তখন বলতো এ ধর্ম ঠিক নয়, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এবনে আবি হাতেম ও আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে গ্রাম্য লোকদের ব্যাপারে, যারা ছিল যাযাবর। তারা মদীনা শরীফে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো, এরপর যদি তাদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম হত, আর্থিক উন্নতি লাভ করতো,

১। তফসীরে রূহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১২২
তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮০

তখন বলতো এ ধর্মটি ভাল। পক্ষান্তরে, যদি তাদের অবস্থা ভাল না হত, তখন তারা বলতো এ ধর্ম গ্রহণ করার পরই আমাদের অবস্থা খারাপ হয়েছে। এরপর তারা মুরতাদ হয়ে যেতো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

وَمِنَ النَّاسِ

আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহর বন্দেগী এভাবে করে যেন তারা পৃথিবীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মনে তাদের সন্দেহ বর্তমান। পার্থিব স্বার্থ অর্জিত হলে তারা মুসলমান থাকে, আর পার্থিব স্বার্থ অর্জিত না হলে তারা ইসলাম ত্যাগ করে বসে। তারা ইসলামের গৃহে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ না করেই এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি দেখে অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয় তবে ইসলামে টিকে থাকে। পক্ষান্তরে, যদি বিপদাপদে পড়ে, সুখের মুখ না দেখে তবে ইসলাম ত্যাগ করে।

এবনে মরদবিয়া আতিয়্যার সূত্রে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এক ইহুদী মুসলমান হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তার দৃষ্টি শক্তি বিনষ্ট হয়, অর্থ সম্পদেরও ক্ষতি হয়। সে এ ভিত্তিহীন ধারণা করলো যে, হয়তো মুসলমান হওয়ার কারণেই আমার এ বিপদ। তাই সে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলো, আমার বাইয়াত আমাকে ফেরত দিন। তিনি এরশাদ করলেন, ইসলাম ফেরত দেয়া হয় না। সে বললো, আমি এ ধর্মে কোন কল্যাণ দেখলাম না। তখন এ আয়াত নাযিল হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন, হে ইহুদী! ইসলাম মানুষের মনের ময়লা দূর করে দেয় যেমন অগ্নি লৌহ, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ময়লা দূরীভূত করে দেয়।

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ

তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানই ধ্বংস হলো। আর এটি হলো সুস্পষ্ট ধ্বংস। কেননা দুনিয়া ইতিপূর্বেই ধ্বংস হয়েছে, আখেরাতে ভোগ করবে দোযখের কঠিন শাস্তি, এর চেয়ে বড় সর্বনাশ আর কী হতে পারে!

হযরত হাসান (রঃ) বলেছেন, আমার নিকট এ রেওয়ায়েত এসেছে যে, কাফেরদেরকে প্রত্যহ সত্তর বার করে অগ্নি দগ্ধ করা হবে। এরপর জীবিত করে পুনরায় দগ্ধ করা হবে (হে আল্লাহ! আমাদেরকে রক্ষা কর)।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যারা দ্বীন ইসলাম থেকে বিমুখ হয় তথা মুরতাদ হয় তারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুনিয়ার ক্ষতি হল, তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর আখেরাতের ক্ষতি হল এই যে, তার কোন সৎ কাজই থাকেনা, সে সর্বস্বান্ত হয়। দুনিয়ার লাভের আশায় সে ইসলাম কবুল করেছে, ফলে আখেরাতে তার কিছু প্রাপ্য থাকেনা। এমনি অবস্থায় দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সে ক্ষতিগ্রস্ত তথা বিপদগ্রস্ত হয়।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৯

يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ
الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ
لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ
يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى
السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ﴿١٥﴾

তরজমা

(১২) সে আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুকে ডাকে যা তার অপকারও করতে পারেনা, উপকারও করতে পারেনা। মূলতঃ এটিই চরম পথভ্রষ্টতা।

(১৩) সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে নিকটতর, এরা কত জঘন্য বন্ধু এবং কত জঘন্য সাথী!

(১৪) যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত, আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা-ই করে থাকেন।

(১৫) যে মনে করে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ পাক তাঁকে (তাঁর নবীকে) সাহায্য করবেন না সে আসমান পর্যন্ত একটি রজ্জু লটকে নিক, এরপর তা কেটে ফেলুক, এরপর দেখুক, এ প্রচেষ্টা তার আক্রোশের হেতু দূর করতে পারে কি-না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দুনিয়ার লোভে দ্বীন ইসলাম কবুল করে। যদি কোন কারণে তাদের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় তখন তারা দ্বীন ইসলাম থেকে বিমুখ হয় এবং তাদের পরিণতি সম্পর্কেও ঘোষণা হয়েছে যে, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তারা হয় সর্বস্বান্ত।

আর আলোচ্য আয়াতে তাদের আরও কিছু অবস্থা বর্ণিত হয়েছেঃ

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ

অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কিছুকে ডাকে যারা তাদের ক্ষতিও করতে পারেনা এবং কোন উপকারেও আসেনা, এমনকি যারা নিজেদেরও কোন উপকার করতে পারেনা, যদি কেউ তাদের ক্ষতি করতে চায় তবে আত্মরক্ষাও করতে পারেনা, এমনকি সাহায্যের জন্য তাদের পূজারীদের ডাকতেও পারেনা। ঐ অসহায় মূর্তিগুলোকেই নির্বোধ লোকেরা উপাস্য বলে মনে করে। মূলতঃ এ হল চরম পথভ্রষ্টতা। তারা পথভ্রষ্ট ও দিশেহারা হয়ে এত দূরে চলে যায় যে, সেখান থেকে তাদের ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা থাকেনা।

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ

"সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে নিকটতর"।

কাফেররা মূর্তি পূজার মাধ্যমে আশা করে যে তাদের উপকার হবে। কিন্তু উপকারতো কখনও হয়না, অপকারই হয় অতি দ্রুত এবং তাদের বিপদ হয় অবধারিত। যখন কেয়ামতের দিন তারা মূর্তি পূজার ভয়াবহ পরিণতি দোযখের কঠিন শাস্তি স্বচক্ষে দেখবে তখন তারা নিজেরাই বলে উঠবে,

لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ

অর্থাৎ কত জঘন্য বন্ধু এবং কত জঘন্য সহচর!

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ স্থলে مولى অর্থ সাহায্যকারী, অভিভাবক। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের مولى অর্থ মা'বুদ বা উপাস্য। আর عشير অর্থ সাথী, সহচর। অর্থাৎ কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন মূর্তি পূজার ভয়াবহ শাস্তি দেখবে তখন তারা উপলব্ধি করবে যে কত জঘন্য কাজ তারা করেছে, কত বড় বিপদ তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে, নেক আমল করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত হয়"।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-ধারার একটি বৈশিষ্ট্য হল এই, কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হলে মোমেনদের পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করা হয়। এখানেও প্রচলিত প্রথাই গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের, মুশরেক-মুনাফেকদের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার বিবরণ দেয়ার পর তাদের কঠিন কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মোমেনদের শুভ পরিণতির কথা ঘোষিত হয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে আর সেই ঈমান হয় খাঁটি, এ ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত হয় তাদের নেক আমলের মাধ্যমে, তারা সুখের কেন্দ্র শান্তির নীড় বেহেশতে প্রবেশ করবে, আর সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তাই করেন) আল্লাহ পাক যখন মোমেনকে বেহেশতের চির শান্তি দিতে চান এবং কাফেরদেরকে দোযখের চির শাস্তি দিতে ইচ্ছুক হন, তখন তাঁকে কেউ বাধা দিতে পারেনা, তাঁর ইচ্ছাই সর্বত্র হয় কার্যকর।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ

"যে মনে করে যে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ পাক তাঁকে (তাঁর নবীকে) সাহায্য করবেন না সে আসমান পর্যন্ত একটি রজ্জু লটকে নিক, এরপর তা কেটে ফেলুক, এরপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশের হেতু দূর করতে পারে কি-না"।

আলোচ্য আয়াতের ينصره এর 'হু' সর্বনামটি দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেহেতু পবিত্র কোরআনের সকল পাঠকের মনেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোবারক নাম সর্বক্ষণ জাগ্রত থাকে তাই তাঁর নাম উল্লেখ না করেই সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদের শুভ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সকল অবস্থায় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সাহায্য করবেন। তাঁকে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে দেয়া হয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করা হবে। যেহেতু কাফের মুশরেকরা, তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শত্রুরা একথা বলে বেড়াত যে, আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে সাহায্য করবেন না, তাই তাদের প্রতিবাদ করে আলোচ্য আয়াতে এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাঁর নবীকে সাহায্য করবেন। কাফেররা তথা তাঁর শত্রুরা যতই জ্বলে পুড়ে মরুক না কেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে যত কৌশলই অবলম্বন করুক না কেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে আগত সাহায্য তারা বন্ধ করতে পারবে না। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীও তারা বন্ধ করতে পারবে না। যদি তাদের আক্রোশ না মেটে তবে তারা যা ইচ্ছা তাই করুক, গলায় দড়ি দিয়ে মরুক অথবা আসমান পর্যন্ত দড়ি টেনে, আর সেই দড়ির সাহায্যে আসমানে পৌঁছে আসমানী সাহায্য বন্ধ করার চেষ্টা করুক। তাদের হিংসা-পরশ্রীকাতরতা সার্থক করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করুক যাতে করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ওহী বন্ধ করতে পারে, অথবা তাঁর প্রতি আগত আল্লাহ পাকের সাহায্য বন্ধ করতে পারে।

তফসীরকার এবনে যায়েদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের السَّمَاء শব্দটি দ্বারা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা

যে ব্যক্তি এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করবেন না, সে আসমান পর্যন্ত একটি দড়ি টেনে তার মাধ্যমে

আসমান পর্যন্ত পৌঁছুক এবং আসমান থেকে আল্লাহ পাকের যে সাহায্য আসে তা বন্ধ করার চেষ্টা করুক, অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অহরহ যে ওহী নাযিল হয়, তা বন্ধ করতে প্রয়াসী হোক।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে এ আয়াত নাযিল হয়েছে বনী আসাদ এবং বনী গাতফান গোত্র সম্পর্কে। এ উভয় গোত্রের সঙ্গে ইহুদীদের পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহ্বান করলেন তখন তারা বললো, আমাদের পক্ষে মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, আমাদের আশঙ্কা এই যে, আল্লাহ পাক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করবেন না। আর মুসলমান হওয়ার পর ইহুদীদের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি রয়েছে তা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় তারা আমাদেরকে খাদ্য-দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করবে না, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যে ওহী নাযিল হয় তারা তা রোধে সর্বাত্মক চেষ্টা করে দেখুক, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টাই হবে ব্যর্থ, আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুত সাহায্য তারা কখনও বন্ধ করতে পারবে না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), কালবী (রঃ), মোকাতেল (রঃ), যাহ্যাক (রঃ), কাতাদা (রঃ), এবনে যায়েদ (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন যে, যারা এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করবেন না এবং দুনিয়াতে তাঁর দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন না এবং দুশমনদের মোকাবেলায় তাঁকে বিজয় দান করবেন না এবং আখেরাতেও তাঁর মরতবা বুলন্দ করবেন না, তাদের চেষ্টা করা উচিৎ যেভাবেই হোক তারা যেন তাদের উদ্দেশ্য সফল করে। ইচ্ছা হলে আসমান পর্যন্ত রজ্জু টেনে আসমানে পৌঁছে আসমানী সাহায্য এবং ওহী বন্ধ করার চেষ্টা করুক, যা কখনও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আগত সাহায্য বন্ধ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৫-১৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৭

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى
وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۙ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ
فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَ
الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاۗبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۭ وَكَثِيْرٌ حَقَّ
عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۭ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
يَفْعَلُ مَا يَشَاۗءُ ﴿١٨﴾ السجدة

তরজমা

(১৬) আর এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি। আর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই হেদায়েত দান করেন।

(১৭) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে, যারা সাবী, খৃষ্টান, অগ্নি-পূজক এবং যারা মুশরেক হয়েছে; নিশ্চয় আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছুই প্রত্যক্ষ করছেন।

(১৮) তুমি কি দেখনি যে, আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহ পাককে সেজদা করে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ, জীব-জন্তু এবং বহু সংখ্যক লোক আল্লাহ পাককে সেজদা করে থাকে। আর অনেক লোকের জন্যে আল্লাহ পাকের আযাব নির্ধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ পাক যাকে অপমানিত করেন তাকে সম্মানিত করতে পারে এমন কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের সম্পকে এরশাদ হয়েছে যে, তারা যত চেষ্টাই করুক এবং যত হিংসাই করুক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত আল্লাহ পাকের সাহায্য বন্ধ করতে পারবে না এবং পবিত্র কোরআন অবতরণেও বাধা দিতে পারবে না। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক কত সুস্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল ভাষায় পবিত্র

কোরআন নাযিল করেছেন এবং সত্যকে কত যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এ ভাগ্যাহত লোকেরা বোঝে না। শুধু তাই নয়; বরং তারা বুঝতে চায়ও না। বস্তুতঃ হেদায়েত এবং গোমরাহী আল্লাহ পাকেরই হাতে।

وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন"।

অর্থাৎ এর হেকমত তিনিই জানেন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, রহমত তাঁরই হাতে, সুবিচার তিনিই করবেন, শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম শুধু তাঁরই, তাঁর জ্ঞান সকলকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তিনিই সকলের হিসাব নেবেন, তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না। আর তিনি সকলকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত শুরু করা হয়েছে- كَذٰلِكَ শব্দ দ্বারা। এর তাৎপর্য হলো, যেভাবে আমি ঐ আয়াত সমূহ নাযিল করেছি যাতে কেয়ামতের কথা, হাশরের ময়দানের কথা, তৌহীদ, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার কথা এবং তাঁকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সাহায্যের কথা প্রমাণিত হয়, ঠিক এমনিভাবে এই কোরআনে আমি এমন আয়াত সমূহ নাযিল করেছি যাতে রয়েছে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত এবং কোরআনে করীমের সত্যতার সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ।

وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন।

একথার তাৎপর্য হল এই যে, কোরআনকে আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে নাযিল করেছি যাতে করে মানুষ হেদায়েত লাভ করে, তবে যার সম্পর্কে আল্লাহ পাকের মর্জি হয়, শুধু সে-ই হেদায়েত লাভ করতে পারে। এজন্যেই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ (সূরা আনআ'ম)

"অতঃপর আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েত করার ইচ্ছা করেন ইসলামকে বোঝার জন্য তার মনের কপাটকে খুলে দেন"।

অথবা এ আয়াতের অর্থ হল, আমি মানব জাতির উপকারার্থে কোরআন নাযিল করেছি আর এজন্যে নাযিল করেছি যেন মানুষ এর দ্বারা হেদায়েত লাভ করে অথবা হেদায়েতের উপর কায়েম থাকে।[২]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, যে يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ বাক্য দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কাউকে হেদায়েত করা জরুরী নয়, তবে হেদায়েত নির্ভর করে আল্লাহ পাকের মর্জির উপর। যার সম্পর্কে আল্লাহ পাকের মর্জি হয়, সে-ই হেদায়েত লাভ করে।[৩]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৪৯

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৮

৩। তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৭

হয়তো এজন্যেই সূরা ফাতেহায় আল্লাহ পাক এ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেনঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

(হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল সঠিক পথের হেদায়েত দান কর) আর এ সূরা পাঠ করা প্রত্যেক নামাযে অবশ্য কর্তব্য। এর তাৎপর্য হল মুসলমান মাত্রকে নামাযের সময় বিনীত ভাবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হেদায়েতের জন্যে দোয়া করতে হয়। এ দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক বন্দাকে হেদায়েত করেন এবং যাদেরকে ইতিপূর্বে হেদায়েত লাভের তৌফিক দিয়েছেন, তাদেরকে হেদায়েতের উপর কায়েম থাকার তৌফিক দান করেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا

(নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে, যারা সাবেয়ী, খৃষ্টান, অগ্নি পূজক এবং যারা মুশরেক হয়েছে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন) পৃথিবীতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তার নিজ নিজ ধর্মকে প্রাধান্য দেয় কিন্তু এর মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য, তার সঠিক ফয়সালা হবে কেয়ামতের দিন।

আলোচ্য আয়াতে "মজুস" বলতে অগ্নিপূজকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাদের ধর্ম বিশ্বাস হলো ভাল-মন্দ এবং পাপ-পূণ্যের জন্যে দু'জন খোদা আছে। পূণ্যের খোদার নাম হলো ইয়াজদান, আর মন্দ বা পাপের খোদার নাম হলো আহরামান। আর وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا দ্বারা মূর্তি পূজকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক এসব মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। যারা সত্য-পন্থী হবে, তাদেরকে জান্নাতে এবং যারা বাতিলপন্থী হবে তাদেরকে দোযখে প্রেরণ করা হবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কাকে তিনি হেদায়েত করেন আর কাকে করেন না, অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে আর সেই ঈমান হয় নিখাদ, নিখুঁত, খাঁটি পরিপূর্ণ নির্ভেজাল, তারাই হেদায়েত লাভ করে।

ইমাম রাজী (রঃ) আরও লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে ছয়টি ধর্মের অনুসারীদের উল্লেখ করা হয়েছেঃ

(১) ইসলামের অনুসারী মুসলমানগণ, (২) ইহুদী, (৩) নাসারা, (৪) ইহুদী ও নাসারাদের মাঝামাঝি আরেকটি দল রয়েছে তারা হল সাবী, তারা ছিল নক্ষত্র পূজারী, তাদের বিশ্বাস ছিল বিশ্বের যাবতীয় পরিবর্তনে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব রয়েছে, (৫) মজুসী (অগ্নিপূজক), (৬) মুশরেক (মূর্তি পূজক)।

তফসীরকার কাতাদা ও মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য ছয়টি ধর্ম মতের মধ্যে একটি হল শুধু আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় আর বাকী পাঁচটি শয়তানের পছন্দনীয়। যা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়, তা হল ইসলাম যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ পাকের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম"।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, ইসলাম ব্যতীত আর যা কিছু আছে সবই বাতিল, পরিত্যাজ্য।[১]

إِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু প্রত্যক্ষ করছেন, সব কিছু সম্পর্কে তিনি অবগত"। কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, তাই যারা আল্লাহ পাকের অনুগত, যারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ, তাদের সঙ্গে সে ব্যবহার তিনি করবেন না, যা কাফের মুশরেক মুনাফেকদের সাথে করা হবে। কেননা, সকলের বাহ্যিক ও আন্তরিক অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। কেয়ামতের কঠিন দিনে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঠিকানা পাবে। কাকে কি শাস্তি দিতে হবে এবং কাকে কি নেয়ামত দিতে হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত, সব কিছুই তাঁর নখ দর্পণে। এ আয়াতে আল্লাহ পাকের এলমের পরিপূর্ণতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই। আর পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের কথা, তাঁর সর্বময় ক্ষমতার কথা, সমগ্র বিশ্ব জগত যে তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কর্তৃত্বাধীন- একথা এরশাদ হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ

"তুমি কি দেখনি যে আসমান জমীনের সব কিছুই আল্লাহ পাককে সেজদা করে এবং সূর্য-চন্দ্র, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ, জীব-জন্তু এবং বহু সংখ্যক লোক আল্লাহ পাককে সেজদা করে থাকে"।

আলোচ্য আয়াতে سجدة শব্দটি সমগ্র সৃষ্টির বশ্যতা, বাধ্যতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শরীয়তের ভাষায় যাকে সেজদা বলা হয় তা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা, সমগ্র বিশ্বজগত আল্লাহ পাকের অনুগত, তাঁর আদেশ পালনে রত, তাঁর দরবারে অবনত মস্তকে হাযির। যাকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে দায়িত্ব প্রদত্ত হয়েছে সে যথাযথভাবে তা পালন করে। অতএব, সমগ্র সৃষ্টিজগত সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদা রত রয়েছে। আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ এক কথায় সব কিছুই আল্লাহ পাকের তাবেদার, তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। বিশ্বের কোন কিছুই এমন নেই যা আল্লাহ পাকের বাধ্য এবং অনুগত নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের সকল সৃষ্টি আল্লাহ পাকের একান্ত বাধ্য ও অনুগত।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৮

তবে মানব জাতির মধ্যে অনেকে অনুগত ও বাধ্য। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ

অনেক মানুষ কথা ও কাজে, আচার-আচরণে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে নিরত রয়েছে। আর এর পাশাপাশি অনেক মানুষ এমনও রয়েছে যে, তারা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

"আর অনেক লোকের জন্য আল্লাহ পাকের আযাব নির্ধারিত হয়ে রয়েছে"।

কেননা, তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনি, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেছে অথচ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করেনি, বরং তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে। অথচ আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে নিখিল বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টি। যেমন আসমান ও জমিন সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ

অর্থাৎ আসমান জমিন বলেছে, আমরা অনুগত হয়েই হাযির হয়েছি।

এমনিভাবে আল্লাহ পাক পাথরের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, পাথরের মধ্যে এমন পাথর রয়েছে যে আল্লাহ পাকের ভয়ে পাহাড়ের উঁচু স্থান থেকে নিচে পড়ে যায়। আর এমনিভাবে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

অর্থাৎ বস্তু মাত্রই আল্লাহ পাকের হামদের তসবীহ পাঠ করতে থাকে, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পার-না।

আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, একটি পাহাড় আর একটি পাহাড়কে ডাক দিয়ে বলে, তোমার উপর দিয়ে এমন কোন ব্যক্তি কি পার হয়েছে যে আল্লাহ পাকের জিকর করছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীসখানি তেবরানী সংকলন করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, নিখিল বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আনুগত্য প্রকাশ করছে তথা সেজদায় নিরত রয়েছে। মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। অনেক লোক আল্লাহ পাকের অনুগত ও সেজদা রত রয়েছে, অনেক লোক সেজদা থেকে বিরতও রয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের অনুগত থাকে তাদের জন্যে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর অনন্ত অসীম নেয়ামত অপেক্ষা করছে। পক্ষান্তরে, যারা এ জীবনে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালীন জীবনে কঠিন কঠোর শাস্তি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের "সেজদা" শব্দটির দু'টি অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে। ১. জমিনে কপাল রাখা, ২. আল্লাহ পাকের মহান

দরবারে আনুগত্য প্রকাশ করা। যখন মানুষের ব্যাপারে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হবে। আর যখন অন্য সৃষ্টির সাথে শব্দটির সম্পর্ক হবে তখন তার অর্থ হবে, সামগ্রিকভাবে আনুগত্য প্রকাশ করা। মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাদের উদ্দেশ্যেই কঠিন কঠোর শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে।[১]

এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ

"আল্লাহ পাক যাকে অপমানিত করেন তাকে সম্মানিত করতে পারে এমন কেউ নেই"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েতের তৌফিক দান না করেন তাকেই অপমানিত করা হয়, আর যাকে তিনি অপমানিত করেন কেউ তাকে সম্মানিত করতে পারেনা, কেননা সম্মান এক আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। আর সম্মানিত হওয়ার পথ হল ঈমান ও নেক আমল।

اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা করেন, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন। এটি তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার, আল্লাহ পাকের ইচ্ছাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারেনা।

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ ز
فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ
فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾
وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا
مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ق وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾
اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ
اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ط وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৯-৩০

তরজমা

(১৯) এরা দু'টি বিবদমান দল, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে, অতঃপর যারা কুফরী ও নাফরমানী করে তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আগুনের পোষাক। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি।

(২০) যার দ্বারা তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে।

(২১) আর তাদের জন্যে রয়েছে লৌহ নির্মিত হাতুড়ি।

(২২) যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে দোযখ থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে পুনরায় তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে বলা হবে, আগুনের আযাব ভোগ করতে থাক।

(২৩) যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ ও মুক্তার কংকন পরানো হবে। আর রেশমী বস্ত্রই হবে সেখানে তাদের পোষাক।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে দু'দল লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছেঃ

(এক) যারা আল্লাহ পাককে সেজদা করে, তাঁর প্রতি অনুগত এবং কৃতজ্ঞ হয়।

(দুই) যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, যাদের শাস্তি অবধারিত।

আর আলোচ্য আয়াতে উভয় দলের অবস্থা এবং পরিণতি সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে।

শানে নুযূল

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত হামজা (রাঃ), হযরত ওবায়দা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং ওতবা, শায়বা এবং ওলীদ এবনে ওতবা সম্পর্কে। প্রথম তিনজন মোমেন ছিলেন, আর শেষ তিনজন কাফের।

ইমাম বোখারী এবং হাকেম লিখেছেনঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আমাদের সম্পর্কে। হাকেম অন্য একটি সূত্রে হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বদরের রণাঙ্গনে যে দু'দল লোক যুদ্ধরত ছিল, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। একদিকে হযরত আলী (রাঃ), হযরত হামজা (রাঃ) এবং হযরত ওবায়দা (রাঃ) ছিলেন। তাঁদের মোকাবেলায় কাফেরদের পক্ষ থেকে ছিল শায়বা এবনে রবীয়া, ওতবা এবনে রবীয়া এবং ওলীদ এবনে ওতবা।

আল্লামা বগভী (রঃ) কায়স এবনে ওবাদের সূত্রে লিখেছেনঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন কাফেরদের সঙ্গে বিতর্ক করার জন্যে সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ পাকের রহমতের সম্মুখে বিনীত হয়ে হাযির হবো।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক বর্ণনা করেন, বদরের দিন রণাঙ্গনে ওতবা এবনে রবীয়া, শায়বা এবনে রবীয়া এবং ওলীদ এবনে ওতবা বেরিয়ে আসে এবং তাদের মোকাবেলার জন্যে হুংকার দেয়। তখন তাদের মোকাবেলার জন্য আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) এবং তিনজন আনসারী যুবক আওফ, মুআয এবং মোয়াওয়াজ বের হয়ে আসেন। এ তিনজন যুবক হারেসের পুত্র ছিলেন। কাফেররা তাদের নাম জিজ্ঞাসা করে এবং এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ডাক দিয়ে বলে, আমাদের মোকাবেলায় তাদেরকে প্রেরণ করুন যারা আমাদের নিকট থেকে বের হয়ে গেছে। তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক হযরত ওবায়দা এবনে হারেস (রাঃ), হযরত হামজা এবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) এবং হযরত আলী এবনে আবি তালেব (রাঃ) বের হয়ে আসলেন। হযরত আলী (রাঃ) ওলীদ এবনে ওতবার মোকাবেলা করে তাকে শেষ করে দিলেন। আর হযরত হামজা (রাঃ) কাল বিলম্ব না করে তাঁর প্রতিপক্ষ শায়বাকে খতম করলেন, অবশ্য হযরত ওবায়দা (রাঃ) এবং ওতবার মধ্যে লড়াই অব্যাহত ছিল। এ অবস্থা দেখে হযরত হামজা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) ওতবার উপর হামলা করে তাকে খতম করলেন। আর হযরত ওবায়দা (রাঃ)-কে উঠিয়ে নিলেন। তাঁর পা কেটে গিয়েছিল। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হযরত ওবায়দা (রাঃ)-কে হাযির করা হল, তখন তিনি আরজ করলেন, আমি কি শহীদ হবোনা? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কেন নয়?

আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে দ্বিতীয় বিবরণ দিয়েছেন উফির সূত্রে এবনে জরীর। তিনি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর এবনে মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মুসলমান ও আহলে কিতাবদের সম্পর্কে। আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি নাসারারা বলেছে, আমরা তোমাদের চেয়ে আল্লাহ পাকের নিকট অধিকতর নৈকট্যের অধিকারী। কেননা, আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে আগমন করেছেন। আহলে কিতাবদের এ কথার জবাবে মুসলমানগণ বলেছেন, আমরা আল্লাহ পাকের অধিকতর নৈকট্যের অধিকারী। কেননা, আমরা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, তোমাদের নবীর প্রতি এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত আসমানী গ্রন্থের প্রতি ঈমান এনেছি, আর তোমরা আমাদের নবীর পরিচয় পেয়েছ এবং আমাদের কিতাব সম্পর্কেও অবগত হয়েছ, কিন্তু শুধু হিংসার কারণেই তোমরা অস্বীকার করছো। মুসলমান ও আহলে কিতাবদের মধ্যে এ বিষয়েই ছিল বিতর্ক। আর আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে তৃতীয় মত হল, ইতিপূর্বে اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا আয়াতে ছয়টি ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটিকে জান্নাতী আর বাকী পাঁচটিকে দোযখী ঘোষণা করা হয়েছে, কেননা যদিও উপরোক্ত আয়াতে ছয়টি ধর্মের উল্লেখ রয়েছে কিন্তু তাদেরকে হক্ব ও বাতিল বা সত্য ও মিথ্যা-এ দু'ভাগে বিভক্ত করা

যায়। একভাগ মোমেন যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, মনে প্রাণে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মানে। দ্বিতীয় ভাগ, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা এবং আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যও প্রকাশ করেনা যেমন ইহুদী, খৃষ্টান, মজুসি, মুশরেক প্রভৃতি। এ দু' দল চিন্তা ও কর্মে জীবন ধারায় একে অন্যের প্রতিপক্ষ। বদরের রণাঙ্গনে এ দু' দলের মধ্যেই হয়েছিল সংঘর্ষ। হক্ব ও বাতিলের মধ্যে হয়েছিল সেদিন যুদ্ধ, সেদিন আল্লাহ পাক সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হক্বকে করেছিলেন বিজয়ী, যদিও সত্যের অনুসারীদের সংখ্যা ছিল কম। বাতিল বা মিথ্যাকে করেছিলেন পরাজিত, যদিও তাদের সামরিক শক্তি ছিল অধিকতর।

হক্ব ও বাতিলের সংঘর্ষ যুগে যুগে

মূলতঃ হক্ব ও বাতিলের এ দ্বন্দ্ব আবহমান কাল ধরেই আছে এবং চিরদিন থাকবে। আদম ও ইবলিস, হক্ব ও বাতিলের প্রতীক। হাবিল সত্যের অনুসারী, কাবিল বাতিলপন্থী। হক্ব ও বাতিলের এ বিতর্ক দেখা যায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও নমরূদের মধ্যে, হযরত মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের মধ্যে, হযরত ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মধ্যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর প্রতি আক্রমণকারী ইহুদীদের মধ্যে। হক্ব ও বাতিলের এ সংঘর্ষ দেখা যায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও মক্কার দুরাত্মা কাফেরদের মধ্যে, যাদের অকথ্য নির্যাতনের কারণে শান্তি-দূত হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে হিজরত করতে হয়। বদরের যুদ্ধে সর্ব প্রথম হক্ব ও বাতিলের সংঘর্ষ হয়, বস্তুতঃ হক্ব ও বাতিলের এ সংঘর্ষ আজও অব্যাহত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এজন্যে আল্লামা ইকবাল বলেছেনঃ

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز = چراغ مصطوی سے شرار بولہبی

অর্থাৎ সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সত্য-অসত্যের মধ্যে সংঘর্ষ রয়েছে অব্যাহত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে আলোক-বর্তিকা নিয়ে এসেছেন, তার মোকাবেলা করেছে আবু লাহাব, আবু জেহেলরা। তিনি যে আলো বিকীরণ করেছেন তা আজও রয়েছে বিদ্যমান, তাই আবু জেহেল ও আবু লাহাবের বংশধররাও রয়েছে সক্রিয়। পরবর্তী আয়াতে বাতিল পন্থী ও হক্ব পন্থীদের পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে কিন্তু তার পূর্বে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকার একরামা (রঃ)-এর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, জান্নাত ও দোযখের মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব হয়েছে। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত ও হযরত আবু বকর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাত ও দোযখের মধ্যে একবার বির্তক হয়। দোযখ বলে আমার মর্যাদা উচ্চে। কেননা, পৃথিবীর যাবতীয় অহংকারীদের জন্যে আমাকে পছন্দনীয় করা হয়েছে। জান্নাত বললো, আমার কি অবস্থা আমার মধ্যেতো শুধু দুর্বলরা, মিসকিনরা প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ পাক জান্নাতকে সম্বোধন করে এরশাদ করলেনঃ তুমি হলে আমার রহমত, আমি যে বন্দার প্রতি রহমত করতে ইচ্ছা করবো, তোমার মাধ্যমে তা করবো অর্থাৎ তুমি হলে আমার রহমতের জীবন্ত প্রতীক, আমি যার প্রতি দয়া করতে ইচ্ছা করবো তাকে জান্নাত দান করবো। আর আল্লাহ পাক দোযখকে সম্বোধন

করে এরশাদ করেনঃ তুমি হলে আমার আযাব, যাকে আমি শাস্তি দিতে চাইবো তাকে তোমার মাধ্যমেই শাস্তি দেব, তোমাদের উভয়কে পরিপূর্ণ করা হবে। দোযখ সে পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবেনা যে পর্যন্ত না স্বয়ং আল্লাহ পাক স্বীয় কদম মোবারক তার উপর না রাখবেন। আল্লাহ পাক কোন সৃষ্টির উপর জুলুম করবেন না, দোযখকে পরিপূর্ণ করার জন্যে নির্দোষ ব্যক্তিকে দোযখে প্রবেশ করাবেন না। আর জান্নাতকে পরিপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ পাক অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন।[১]

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ

"অতঃপর যারা কুফরী ও নাফরমানী করে তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আগুনের পোষাক"।

পূর্ববর্তী আয়াতে দু'টি বিবদমান দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে– মোমেন ও কাফের। এ আয়াতে কাফেরদের শোচনীয় পরিণতি বা শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যারা দুনিয়াতে কাফের অবস্থায় জীবন-যাপন করে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করতে থাকে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই সবকিছু মনে করে, আখেরাতের জীবনের কথা, সওয়াব ও আযাবের কথা, হিসাব নিকাশের কথা এবং জান্নাত ও দোযখের কথা ভুলে যায়, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি লালন-পালন করছেন তাঁর নাফরমানী করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনা, তাদের কয়েকটি শাস্তির কথা এ আয়াত সমূহে এরশাদ হয়েছে।

কাফেরদের শাস্তি

১. তাদেরকে পরানো হবে নারকীয় আগ্নেয় বস্ত্র।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, এ নারকীয় পোষাকটি হবে তামার তৈরী এবং তা অত্যন্ত উত্তপ্ত হবে, যা তাদের দেহকে পরিবেষ্টন করে রাখবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তাদেরকে নারকীয় পোষাক হিসাবে অগ্নি খন্ড পরানো হবে।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত জোয়াইরীয়া (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমের পোষাক পরিধান করবে, আল্লাহ পাক তাকে কেয়ামতের দিন আগুনের পোষাক পরিধান করাবেন।

বাজ্জার, এবনে আবি হাতেম ও বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সর্ব প্রথম আগুনের পোষাক ইবলিসকে পরানো হবে, এরপর তার বংশধরদেরকে পরানো হবে। তখন ইবলিস তার ধ্বংসের জন্যে চিৎকার দিতে থাকবে, তার বংশধররাও তাই করবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩০-৩৩
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃ. ৫১

আবু নাঈম ওহাব এবনে মোনাব্বেহর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, দোযখীদেরকে নারকীয় পোষাক পরানো হবে, তবে ঐ পোষাকের চেয়ে তাদের নগ্ন থাকাই ভাল হবে। দোযখীদেরকে জীবন দেয়া হবে, কিন্তু জীবনের চেয়ে তাদের জন্যে মৃত্যুই শ্রেয় হবে।

হযরত আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বিলাপকারিণী স্ত্রীলোকরা যদি তাদের মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তবে তাদেরকে বিশেষ নারকীয় পোষাক পরানো হবে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আয়াতে দোযখীদেরকে নারকীয় আগ্নেয় পোষাক পরিধান করার যে ঘোষণা রয়েছে তার তাৎপর্য হল, যেভাবে পোষাক মানুষের সর্বাঙ্গকে ঢেকে রাখে ঠিক তেমনি দোযখের অগ্নিও কাফেরদের সর্বাঙ্গকে ঢেকে রাখবে এবং পুড়তে থাকবে।[১]

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ

"তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি"।

কাফেরদের আরেকটি শাস্তি হল, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে। আর ফুটন্ত পানির কারণে তাদের মগজ থেকে শুরু করে পেটের নাড়ি-ভুড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে আসবে। শুধু তাই নয়; বরং তাদের দেহের চামড়াও ফুটন্ত পানির কারণে গলে যাবে। অর্থাৎ ঐ ফুটন্ত পানির কারণে দোযখীদের দেহের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। দেহের চামড়া গলে যাবে এবং নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাবে।

তিরমিজী শরীফে এ সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোযখীদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে, আর তা প্রবাহিত হয়ে পেটের ভেতরে প্রবেশ করবে এবং দু' পায়ের মাঝখান দিয়ে বের হয়ে আসবে। আর এ শাস্তি বার বার দেয়া হবে।

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ.

"আর তাদের জন্যে রয়েছে লৌহ নির্মিত হাতুড়ি বা গুরুজ"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, দোযখীদেরকে গুরুজ দ্বারা মারা হবে, প্রত্যেকটি অঙ্গের উপরই আঘাত করা হবে। আর প্রত্যেক আঘাতেই তারা মৃত্যুর জন্য ফরিয়াদ করবে।

আবু ইয়ালা, এবনে আবি হাতেম, হাকেম এবং বায়হাকী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি লোহার ঐ গুরুজ জমিনের উপর রাখা হয় এবং সমস্ত জ্বীন ও মানুষ তা উত্তোলন করার চেষ্টা করে তবে তা সক্ষম হবেনা। যদি ঐ গুরুজের একটি আঘাত পাহাড়ের উপর পড়ে তবে পাহাড় খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাবে (অথচ এ গুরুজ দ্বারা দোযখীদের উপর আঘাত করা হবে)। এরপর দোযখীরা পুনরায় পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে, আর এ শাস্তি বার বার দেয়া হবে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৩
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৪৩২
২. তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃ. ৩৪

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ আবদুল্লাহ এবনে সিররী (রঃ) বর্ণনা করেন, ফেরেশতা ঐ জ্বলন্ত পানি দোযখীর মুখে ঢালতে চাইবে, কিন্তু সে ভীত হয়ে মুখ সরিয়ে নেবে, তাই ফেরেশতা হাতুড়ি দ্বারা তার মাথায় আঘাত করবে, মাথা ফেটে যাবে, আর তখন সেই মাথার উপর গরম পানি ঢালা হবে যা সরাসরি পেটে চলে যাবে, পরিণামে নাড়ি-ভুড়ি বেরিয়ে যাবে।

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا

"যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে দোযখ থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে পুনরায় তাতে নিক্ষেপ করা হবে"।

দোযখের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কারণে অস্থির হয়ে দোযখীরা দোযখ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। দোযখ থেকে বের হওয়া তখন তাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা। এবনে আবি হাতেম লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ফোযায়েল এবনে ইয়ায (রঃ) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! দোযখীরা কখনও দোযখ থেকে বের হওয়ার আশা করবে না। কেননা তাদের পাগুলো জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকবে। দোযখের অগ্নিশিখা তাদেরকে উপরে তুলবে, সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতারা হাতুড়ি দ্বারা মাথায় আঘাত করে নিচে ফেলে দেবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, দোযখ থেকে বের হবার অর্থ হল, অগ্নিশিখা যখন দোযখীদেরকে উপরে তুলবে, তখন তাদের ধারণা হবে যে তারা বাইরে যেতে পারবে কিন্তু তা কখনও হবেনা, বরং লৌহনির্মিত গুরুজের আঘাতে তারা নিচে পড়ে যাবে।

বায়হাকী আবু সালেহের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, দোযখে কোন কাফেরকে নিক্ষেপ করা হবে এবং গর্তের শেষ পর্যন্ত না পৌছে কোথাও থামবে না। এরপর দোযখের অগ্নি শিখা পুনরায় দোযখের উপরিভাগে নিয়ে আসবে। তখন তাদের দেহের হাড়ের উপর গোশ্ত থাকবে না (অগ্নি সব শেষ করে দেবে)। এরপর ফেরেশতাগণ তাদেরকে গুরুজ দ্বারা আঘাত করবে এবং তারা দোযখের অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হবে, এ শাস্তি সর্বদা হতে থাকবে।

وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

"তাদেরকে বলা হবে, "আগুনের আযাব ভোগ করতে থাক"।

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলবে, তোমরা দোযখের শাস্তি ভোগ করতে থাক।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

"যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে"।

মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের ভয়াবহ পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে মোমেনদের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, আর সেই ঈমান অনুযায়ী নেক আমল করে তাদেরকে আল্লাহ পাক অবশ্যই এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়।

এ আয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গি বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ। প্রথমতঃ আয়াতকে ان দ্বারা শুরু করা হয়েছে। আর ان এর ব্যবহার হয় তাগিদের জন্য। অর্থাৎ এ আয়াতে মোমেনদেরকে যে খোশখবরী দেয়া হয়েছে তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আয়াতে يدخل শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এভাবে বিষয়টি উপর আরো গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং মোমেনদের জীবন-সাধনা যে অত্যন্ত প্রশংসনীয় তার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। মোমেনগণ যে বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামত চিরকাল ভোগ করবে তার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا

"সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ রৌপ্যের কংকন পরানো হবে"।

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকারগণের মতে, প্রত্যেক জান্নাতবাসীর হাতে তিনটি অলংকার থাকবে। ১. একটি স্বর্ণের ২. একটি রৌপ্যের, আর তৃতীয়টি মনি-মুক্তার।

তিরমিযী, হাকেম এবং বায়হাকীতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ.

এরপর এরশাদ করেন, জান্নাতবাসীদের মাথায় থাকবে মুকুট, যার সামান্য একটি মুক্তার চমকে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য (সারা পৃথিবী আলোকময় হবে)।

তেবরানী আল আওসাতে এবং বায়হাকী হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি একজন সাধারণ জান্নাতবাসীর অলংকারকে বিশ্ববাসীর অলংকারের সাথে তুলনা করা হয় তবে সারা পৃথিবীবাসীর অলংকারের চেয়ে উত্তম হবে। আবুশ্ শেখ কা'বে আহবারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের একজন ফেরেশতা জান্নাতবাসীদের জন্যে অলংকার তৈরীতে মশগুল রয়েছেন, কেয়ামত পর্যন্ত এ কাজেই মশগুল থাকবেন। যদি জান্নাতবাসীর একটি অলংকারও (পৃথিবীতে) বের করা হয় তবে তা সূর্যের আলোকে নিস্প্রভ করে দেবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেনের অলংকার (তার হাতে পায়ে) যে পর্যন্ত অযুর পানি পৌঁছে।

وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

"আর রেশমী বস্ত্রই হবে সেখানে তাদের পোষাক"।

তেবরানী হযরত যাবের (রাঃ)-এর সূত্রে হযরত মারসাদ এবনে আবদুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে যার দ্বারা অত্যন্ত মসৃণ রেশমী বস্ত্র তৈরী হয়, আর তাই হবে জান্নাতবাসীর পোষাক।

নেসায়ী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার মর্ম হল ঐ বৃক্ষের ফল ফেটে যাবে এবং তা থেকে জান্নাতবাসীর পোষাক বের হয়ে আসবে।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রত্যেককে তুবা নামক বৃক্ষের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে, তুবার ফুলের কলি খুলবে আর তা থেকে পোষাক বের হয়ে আসবে। যে বর্ণের বা যে প্রকারের পোষাক নিতে ইচ্ছা করবে সে তা নিয়ে নেবে।

হযরত কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, যদি জান্নাতের পোষাক সমূহের কোন একটি পোষাক পৃথিবীতে কেউ পরিধান করে, যে কেউ তা দেখবে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। বর্ণিত আছে যে, জান্নাতী ব্যক্তি যখন কোন পোষাক পরিধান করবে তখন প্রতি ঘন্টায় তা সত্তরটি বর্ণ পরিবর্তন করবে।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার নেয়ামত ভোগ করবে তার পোষাক কখনও পুরাতন হবেনা, আর তার যৌবনও অম্লান থাকবে।[১]

وَهُدُوٓا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ
الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً الْعَاكِفُ
فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا
تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْقَآئِمِينَ وَ
الرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

তরজমা

(২৪) তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল, আর তারা পরিচালিত হয়েছিল চির প্রশংসিত গুণময় মহান আল্লাহ পাকের পথের দিকে।

(২৫) নিশ্চয় যারা কুফরী ও নাফরমানী করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে এবং মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয় যাকে আমি সর্ব সাধারণের জন্যেই করেছি, যা স্থানীয় বহিরাগত সকলের জন্য সমান, আর যে নিজের জুলুম অত্যাচার দ্বারা তাতে সীমালঙ্ঘনের ইচ্ছা করে আমি তাকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাবো।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৫২

(২৬) আর স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য উক্ত গৃহে স্থান নিদৃষ্ট করে দিয়েছিলাম। তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্যে, যারা তওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়িয়ে থাকে, রুকু করে, সেজদা করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে জান্নাতবাসীদের বিভিন্ন নেয়ামতের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভের কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাতবাসী ভাগ্যবান লোকেরা দুনিয়াতে পবিত্র কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করার তৌফিক পেয়েছিল, আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ পাঠের, তাঁর প্রশংসা করার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল, মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয়ার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করেছিল। এমনিভাবে তারা লাভ করেছিল সর্বগুণাকর চির প্রশংসিত মহান আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় পথের সন্ধান। মূলতঃ এ কারণেই তারা আখেরাতে ফেরেশতাদের সালাম লাভ করবে এবং বেহেশতবাসীগণ একে অন্যকে সালাম দেবেন। পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করবেন এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভ করে তারা শোকর গুজার হবেন।

الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ

আলোচ্য আয়াতের পবিত্র কলেমার দ্বারা পবিত্র কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর صراط الحميد শব্দ দ্বারা সরল সঠিক পথ বা দ্বীন ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে দ্বীন ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকার কারণে, কলেমায়ে তৈয়্যেবার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও এ আদর্শ গ্রহণের জন্যেই আখেরাতের অগণিত নেয়ামত লাভ হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের "পবিত্র কথা" দ্বারা জান্নাতে আল্লাহ পাকের হাম্‌দ ও তসবীহ-তাহলীল উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর صراط الحميد শব্দ দ্বারা জান্নাতের পথ বোঝানো হয়েছে। কেননা জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতবাসীগণ আল্লাহ পাকের দরবারে একথা বলে শোকর আদায় করবেনঃ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন"।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্য যিনি আমাদেরকে এ নেয়ামত লাভের পথ নির্দেশ করেছেন"।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৬

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, জান্নাতবাসীগণকে যে অগণিত নেয়ামত দান করা হবে তার কারণ হল, দুনিয়াতে তাদেরকে কলেমায়ে তৈয়্যেবার প্রতি ঈমান আনয়নের এবং আল্লাহ পাকের পথে চলার তৌফিক দেয়া হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "পবিত্র কথার" দ্বারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়াল হামদুলিল্লাহ কথাটির প্রতি সাক্ষ্য প্রদান উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যার হেদায়েত তারা দুনিয়াতে লাভ করেছিলেন, তাই জান্নাতে এত নেয়ামত তারা পেয়েছেন।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, "পবিত্র কথা" দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে অতীত কালের শব্দগুলো ভবিষ্যত কালের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ জান্নাতে তাদেরকে পবিত্র কথার হেদায়েত দেয়া হবে তথা জান্নাতে প্রবেশের পর তারা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا পাঠ করবেন। আর صراط الحميد অর্থ হল, আল্লাহর পথ তথা ইসলাম।[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا.....

নিশ্চয় যারা কুফরী ও নাফরমানী করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে এবং মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয় যাকে আমি সর্ব সাধারণের জন্যে করেছি, যা স্থানীয় বহিরাগত সকলের জন্যে সমান। আর যে নিজের জুলুম অত্যাচার দ্বারা তাতে সীমা লঙ্ঘনের ইচ্ছা করে আমি তাকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাবো।

যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা মানে না, নিঃসন্দেহে তারা কাফের, তারা পথভ্রষ্ট। কিন্তু এ কাফেরদের মধ্যেও জঘন্যতর আরও একটি শ্রেণী আছে, যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট থেকে ক্ষান্ত হয়না, বরং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে, সত্য গ্রহণে বাধা দিতে সর্বদা তৎপর থাকে, এমনকি তারা মানুষকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয়, মুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করে, মানুষকে মসজিদুল হারামে এসে হজ্জ ও ওমরা পালনেও বাধা দেয়। যেমন, ষষ্ঠ হিজরীতে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে মক্কা প্রবেশে এ কাফেররা বাধা দিয়েছিল। অথচ পবিত্র কা'বা শরীফের দ্বার সবার জন্যে উম্মুক্ত। হরম শরীফে সকলের অধিকার সংরক্ষিত। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগ থেকে এ স্থানটি শুধু আল্লাহর এবাদতের জন্যে সুনিদৃষ্ট। আর তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের উপরই পবিত্র কা'বা শরীফের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে, অর্থাৎ শুধু এক আল্লাহ পাকের

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৩৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৮
তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮৪

বন্দেগীর জন্যেই এ পবিত্র গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। শেরক কুফর থেকে হরম শরীফকে পবিত্র রাখা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে এ কা'বা শরীফই কেবলা। এখানে স্থানীয়-অস্থানীয় এবং এর স্থায়ী ও অস্থায়ী অধিবাসী-সবাই সমান। আয়াতের শেষাংশে এ কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

"আর যে নিজের জুলুম অত্যাচার দ্বারা তাতে সীমা লঙ্ঘনের ইচ্ছা করে, আমি তাকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাবো"।

অতএব, যারা মুসলমানদেরকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশে বাধা দেয় বা সেখানে কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়, তারা যেন তার শাস্তি ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত থাকে।

আলোচ্য আয়াতে মসজিদে হারাম সম্পর্কে স্থানীয় ও অস্থানীয় সকলকে সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কি ব্যাপারে এ সমান অধিকার এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের একাধিক মত রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, এবাদত বন্দেগীতে হজ্জের বিধান সমূহ পালনে সকলেই সমান, মক্কার অধিবাসী হোক অথবা মুসাফির। কাউকে আল্লাহ পাকের ঘরে এবাদত করতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার মক্কাবাসীর নেই।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য অনেক সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের অনেকেরই মত এই যে, আলোচ্য আয়াতে "মসজিদে হারাম" শব্দ দ্বারা শুধু কা'বা শরীফ উদ্দেশ্য নয়; যা ইমাম শাফেয়ী (রঃ) মনে করেন, বরং এর দ্বারা মক্কা শরীফ তথা হরম শরীফের পূর্ণ এলাকা উদ্দেশ্য। আর মসজিদে হারামের ব্যাপারে মক্কা শরীফের স্থায়ী অধিবাসী ও মুসাফিরদের সমান অধিকার-এ কথার তাৎপর্য হলো, মক্কা শরীফে অবস্থান করার সমান অধিকার সকলেরই রয়েছে। সেখানকার নাগরিক হোক বা না হোক। মক্কা শরীফের যমীনের মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক, কোন বন্দা নয়। এজন্যে এই যমীন বিক্রিও করা যাবেনা এবং কেউ এর ভাড়াও আদায় করতে পারবেনা। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম মালেক (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে দ্বারা তাঁর বক্তব্যের দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াত سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এর মসজিদে হরম শব্দ দ্বারা শুধু কা'বা শরীফ উদ্দেশ্য করা হয়নি, কেননা মে'রাজ হয়েছে হযরত উম্মে হানি (রাঃ)-এর ঘর থেকে, যা হরম শরীফের এলাকায় ছিল, কা'বা শরীফের ভেতর ছিল না। যেভাবে সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে মসজিদে হারাম শব্দ দ্বারা সমগ্র হরম শরীফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, ঠিক তেমনি আলোচ্য আয়াতের মসজিদে হারাম দ্বারা সমগ্র হরম শরীফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাক মক্কা শরীফকে সম্মানিত ঘোষণা করেছেন, অতএব এর যমীন বিক্রি করে খাওয়া হারাম করেছেন।

ইমাম এসহাক এবনে রাহওয়াই বলতেন, মক্কার যমীন ওয়ারিশ সূত্রে বিতরণ হতে পারেনা, ভাড়া দেয়া যায় না।

এবনে মাজা শরীফে উল্লেখিত, হযরত আলকামা এবনে নুজলা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে মক্কার বাড়ী-ঘর মালিকানা মুক্ত বলে মনে করা হতো। যার ইচ্ছা তাতে বসবাস করতো, অথবা অন্যকে বসবাস করার অনুমতি দেয়া হতো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কায়ে মোয়াজ্জমার বাড়ী-ঘর বিক্রয় করা বা ভাড়া দেয়া বৈধ নয়।

হযরত আতা (রঃ) হরম শরীফের ঘর ভাড়া নেয়া নিষিদ্ধ মনে করতেন।

খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) মক্কা শরীফের ঘর-বাড়ীর দ্বার তৈরী করা থেকে বিরত রাখতেন। কেননা, বাড়ীর আঙিনায় হাজীগণ অবস্থান করতে পারতেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে সোহাইল এবনে আমর নামক এক ব্যক্তি মক্কা শরীফে তার একটি ঘরের দ্বার তৈরী করলে হযরত ওমর (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাযির করার হুকুম দিলেন। সে হাযির হয়ে বললো, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি অত্যন্ত প্রয়োজনে এ দরজাটি তৈরী করেছি, আমি একজন ব্যবসায়ী মানুষ, আমি দরজা এজন্যে তৈরী করছি যেন আমার গৃহপালিত পশুগুলো নিয়ন্ত্রণে থাকে। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বিশেষভাবে তাকে এর অনুমতি দান করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) মক্কাবাসীকে সম্বোধন করে যে আদেশ দিয়েছিলেন তা ছিল এমনঃ "হে মক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের বাড়ীগুলোর দরজা রেখোনা, যাতে করে বাইরের লোক এসে যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করতে পারে"।

আতা (রঃ) বলেন, মক্কা শরীফের অধিবাসী এবং বিদেশী এ ব্যাপারে সকলেই সমান, যার যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা শরীফের বাড়ীগুলোর ভাড়া যারা ভোগ করে তারা নিজেদের উদরে অগ্নি প্রবেশ করায়।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মত ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ)-এর অভিমতও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ (রঃ) এ দু' অভিমতের মধ্য পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন, মক্কার বাড়ী-ঘরের মালিকানা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বন্টন করা বৈধ, তবে এ বাড়ীগুলোর ভাড়া গ্রহণ করা বৈধ নয়।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ)-ও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, কোন ব্যক্তি হরম শরীফের কোন স্থানে যদি অবস্থান করে, তবে এরপর কেউ এসে তাকে সেখান থেকে বের করতে পারেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং এবনে যায়েদ (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন। তাঁরা বলতেন, মক্কা শরীফের

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২৪
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৩৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৫৩
তফসীরে কুরতবী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৩

অধিবাসী হোক অথবা কোন বিদেশী মুসাফির হোক, হরম শরীফ এলাকায় অবস্থানের ব্যাপারে সবার সমান অধিকার রয়েছে। আর এ অর্থই হলো আলোচ্য আয়াতেরঃ

سَوَآءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ

এজন্যে হযরত ওমর (রাঃ) হজ্জের মৌসুমে লোকদেরকে তাদের ঘরের দরজা বন্ধ করতে নিষেধ করতেন। আল্লামা বগভী (রঃ)-ও এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অন্য একটি বর্ণনা, যা "এজালাতুল খেফা" নামক গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, মারওয়া পাহাড়ের নিকট এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে আরজী পেশ করলো, আমীরুল মোমেনীন! আমার জন্যে কিছু জায়গা নির্দিষ্ট করে দিন। হযরত ওমর (রাঃ) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তাকে পেছনে ছেড়ে অগ্রসর হয়ে বললেন, এটিতো আল্লাহ পাকের হরম, এখানে স্থায়ী ও মুসাফির সবার অধিকার সমান।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আরও লিখেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় একটি বাড়ী চার হাজার দিনারে ক্রয় করে কারাগার বানিয়েছিলেন।

এবনে জোরায়েযের এ বর্ণনাও সত্য যে, তিনি হযরত সওদা (রাঃ)-এর হুজরা ক্রয় করেছিলেন। আর হাকিম এবনে হাজার দারুণ নদওয়া বিক্রি করেছিল। আর একথাও সত্য যে, মসজিদের সম্প্রসারণের জন্যে হযরত ওমর (রাঃ কয়েকটি বাড়ী তাদের মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন। আর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সম্পর্কেও এমন বর্ণনা রয়েছে। এতে একথা প্রতীয়মান হয়, হরম শরীফের এলাকায় বাড়ী-ঘর ক্রয় করা বৈধ। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাব দিয়েছেন যে, এসব বিবরণ সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই তবে এসব ক্রয়-বিক্রয় বাড়ী-ঘরের হয়েছে, যমীনের হয়নি। নিষিদ্ধ হলো মক্কার যমীনের ক্রয়-বিক্রয়, তার উপর নির্মিত বাড়ি-ঘর নয়। এজন্যে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর কথা হলো, মক্কার যমীন বিক্রয় করা এবং তার বাড়ি-ঘরের ভাড়া গ্রহণ করা অবৈধ। কেননা, এখানে যমীন মালিকানা মুক্ত, এর মধ্যে কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়না। কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

আল্লাহ পাক এ আয়াতাংশে ঘরকে আতীক বা আযাদ বলেছেন। আর "আতীক" শব্দ দ্বারা সম্পূর্ণ হরম শরীফ এলাকাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, মক্কা শরীফের বাড়ী-ঘর ক্রয়-বিক্রয় করা বা ভাড়া দেয়া বৈধ। কেননা, এ বাড়ী-ঘরগুলোর মালিক রয়েছে, এগুলো ওয়াকফ নয়। হাসান বসরী (রঃ), তাউস (রঃ), আমর এবনে দিনার (রঃ) এবং তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদের একটি দল এ মতই পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মাজহাব মোতাবেক আয়াতের মর্মকথা হলো, "আমি কা'বাকে সকলের জন্যে নামায এবং এবাদতের জন্যে কেবলা করে দিয়েছি, কা'বা শরীফের তা'যীম, তার মধ্যে নামাযের ফজিলত এবং কা'বা শরীফের তওয়াফের হুকুম সকলের জন্যে, মক্কা শরীফের স্থায়ী অধিবাসী হোক অথবা বিদেশী মুসাফির হোক, এ ব্যাপারে সবাই সমান"। মক্কাকে আবাদ করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো সেখানে নামায কায়েম করা।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে, যেহেতু আলোচ্য আয়াতের مسجد শব্দটি দ্বারা শুধু কা'বা শরীফ উদ্দেশ্য, হরম শরীফ নয়, তাই তিনি এ অর্থ করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ)-এর জবাবে বলেছেন, যদি মসজিদে হারাম শব্দ দ্বারা শুধু কা'বা শরীফ উদ্দেশ্য হয় এবং স্থায়ী অধিবাসী ও মুসাফিরদের সম্পর্কে সমান অধিকার প্রমাণিত হয়, তবে তা মক্কা শরীফের কোন বৈশিষ্ট্য হবেনা। কেননা এ আদেশ সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মসজিদের জন্যেই সমান, প্রত্যেক মসজিদের তা'যীম করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য। আর প্রত্যেক মসজিদের সওয়াবের যে সীমা নির্দিষ্ট রয়েছে, তা সকলের জন্যে সমান। এ এলাকার স্থায়ী অধিবাসী হোক বা বিদেশী মুসাফির।

ইমাম তাহাবী (রঃ) ইব্রাহীম এবনে মুহাজেরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, মক্কা প্রত্যেকের জন্যেই মোবাহ।[১]

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর মতে, মক্কার যমীনের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। মক্কার বাড়ী-ঘর বিক্রয়ে কোন বিধি-নিষেধ নেই। যমীন সহ বাড়ী বিক্রয় ইমাম আবু হানিফার (রঃ)-এর নিকট মাকরূহ।[২]

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

"আর যে নিজের জুলুম অত্যাচার দ্বারা তাতে সীমা লঙ্ঘনের ইচ্ছা করে, আমি তাকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাবো"।

অর্থাৎ যে জেনে শুনে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে মক্কায়ে মোয়াজ্জমার পবিত্র ভূমিতে অন্যায় কাজ করে, অন্য স্থানের তুলনায় ঐ অপরাধের শাস্তি হবে অধিকতর। অতএব, যারা মুসলমানদেরকে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রবেশে বাধা দেয় তাদের শাস্তি হবে কঠিনতর। তাই তারা যেন সেই কঠোরতর শাস্তি ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত থাকে।

বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বাধিক ঘৃণিত তিন ব্যক্তি।

১. হরম শরীফে যে দুস্কার্য করে,

২. ইসলামের আবির্ভাবের পর যে বর্বরতার যুগের পন্থার অভিলাসী হয়,

৩. যে অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে ইচ্ছুক হয়।

তিরমিজী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ছয় প্রকার লোক রয়েছে, যাদের প্রতি আমি লা'নত করেছি এবং স্বয়ং আল্লাহ পাক লা'নত করেছেন এবং সকল পয়গম্বর লা'নত করেছেন, যাদের দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেন না।

১. আল্লাহ পাকের প্রেরিত কিতাবে নিজের তরফ থেকে কোন কিছু সংযোজনকারী।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৯-৪০
তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২৪

২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০

২. আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট তকদীর অস্বীকারকারী।

৩. যে জবরদস্তি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে, যাকে আল্লাহ পাক অপমানিত করেছেন তাকে যে সম্মান করে আর আল্লাহ পাক যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে যে অপমানিত করে।

৪. আল্লাহ পাক যে স্থানকে হরম বলে ঘোষণা করেছেন, তাকে যে হালাল বানায়।

৫. আমার বংশধরদের যে হত্যা করে, অপমানিত করে, যা আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন, যে তাকে হালাল করে।

৬. আমার আদর্শকে বর্জনকারী।

এ দু'খানি হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতের মসজিদে হারাম দ্বারা হরম শরীফই উদ্দেশ্য। কেননা, হরম এলাকাকে হালাল মনে করা এবং সেখানে দুষ্কার্য করা সম্পূর্ণ হারাম, তা কা'বা শরীফের ভেতরে হোক বা বাইরে।

আলোচ্য আয়াতের الحاد শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো বক্রতা, কোন একদিকে ঝুঁকে যাওয়া এবং পথভ্রষ্ট হওয়া।

তফসীরকার মুজাহেদ ও কাতাদা (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের الحاد শব্দটির এ স্থলে অর্থ হলো শেরক, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সকল নিষিদ্ধ কাজই এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা কথায় হোক বা কাজে এমনকি, পরিচারক-পরিচারিকাকে গালি দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

আতা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে الحاد শব্দটির অর্থ হলো, এহরাম পরিধান করা ব্যতীত হরম এলাকায় প্রবেশ করা এবং নিষিদ্ধ কোন কাজ করা যেমন শিকার করা বা কোন বৃক্ষ কর্তন করা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি তোমাকে হত্যা করেনা, তাকে যদি তুমি হত্যা কর। এমনিভাবে যে তোমার প্রতি জুলুম করেনা, যদি তুমি তার প্রতি জুলুম কর, তবে তাই হলো الحاد।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যদি কোন ব্যক্তি গুনাহর ইচ্ছা করে কিন্তু গুনাহ করেনি, তবে তার আমলনামায় গুনাহ লিপিবদ্ধ হবেনা। কিন্তু মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় গুনাহ করার ইচ্ছা করলেই তা গুনাহর হুকুমে হবে, যেমন কোন ব্যক্তি মক্কা শরীফে থেকে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করার ইচ্ছা করে যে এডেনে রয়েছে, ঐ ইচ্ছার জন্যেও সে গুনাহগার হবে এবং আল্লাহ পাক তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর দু'টি তাবু থাকতো, একটি হরম শরীফে, আর একটি হরম শরীফের বাইরে। যদি তিনি তাঁর বাড়ীর লোকদেরকে কঠোর ভাষায় কোন কথা বলতে ইচ্ছা করতেন তবে তিনি হরম শরীফের বাইরের তাবুতে এসে বলতেন।

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

"আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আমি ইব্রাহীমের জন্যে উক্ত গৃহে স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম"।

বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর ইতিহাস খ্যাত তুফানের সময় কা'বা শরীফকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। পরবর্তীতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণের অনুমতি দেন। তখন তিনি জানতেন না কা'বা শরীফের নির্দিষ্ট স্থান কোথায়। আল্লাহ পাকের নির্দেশে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়, যার কারণে কা'বা শরীফের বুনিয়াদের উপর বালু মাটি সরে যায়। ফলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফের ভিত্তি দেখতে পান।

বায়হাকী দালায়েলে এবং এবনে আবি হাতেম সুদ্দী (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আল্লাহ পাক একটি বাতাস প্রেরণ করেন, তার নাম ছিল খায়ুজ। তা কা'বা শরীফের ভিত্তির উপর থেকে বালু মাটি সরিয়ে দেয় এবং কা'বা শরীফের ভিত্তি প্রকাশিত হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) কালবী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আল্লাহ পাক একটি বাতাস প্রেরণ করেন, যা কা'বা শরীফের স্থানে এসে স্থির হয়ে যায়, যার মধ্যে একটি মাথা ছিল। যা বলছিল, ইব্রাহীম! আমার সম পরিমাণ স্থানে ইমারত তৈরী কর। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাই করেছিলেন।

أَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا

"(তখন বলেছিলাম) আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্যে যারা তওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়িয়ে থাকে, রুকু করে, সেজদা করে"।

বস্তুতঃ নিরঙ্কুশ তৌহীদের উপরই এ পবিত্র গৃহের ভিত্তি রাখা হয়েছে। শেরক ও কুফরের অপবিত্রতা যেন এ গৃহ স্পর্শ করতে না পারে তার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর মুশরেকরা এ পবিত্র গৃহে ৩৬০টি মূর্তি রেখেছিল। অবশেষে অষ্টম হিজরীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন তিনি ঐ মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলে দেন এবং কা'বা শরীফের পবিত্রতা নিশ্চিত করেন। আল্লাহ পাকের রহমতে আজ পর্যন্ত এ অবস্থাই বিরাজমান রয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতে কা'বা শরীফের পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে কা'বা শরীফের পুনঃনির্মাণের হুকুম যখন দিয়েছেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, "আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা এবং আমার ঘরকে তওয়াফকারী, নামায আদায়কারী, রুকু, সেজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রেখো"।

মূলতঃ পবিত্র কা'বা শরীফের স্থান সর্বকালেই সম্মানিত। এ হলো আল্লাহ পাকের নূর অবতরণের স্থল। হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) বলেছেন, যদিও কা'বা শরীফের একটি দৈহিক অবয়ব রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, এর দেয়াল বা ছাদ এর কোনটিই কেবলা নয় যদি এসব অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে স্থাপন করা হয় তবে তা কেবলা হবেনা; বরং কেবলা তাই থাকবে যা এখন আছে। কেবলা এ স্থানই, যেখানে আল্লাহ পাকের নূর অবতরণ করে এবং তাঁর তাজাল্লী বিকীরণ হতে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে ৩টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১. শুধু আল্লাহ পাকের গৃহ নির্মাণ কর এবং

২. শেরক ও পৌত্তলিকতা থেকে তাকে পবিত্র রাখ।

৩. যারা তৌহীদে বিশ্বাসী, শুধু তাদের জন্যে এবাদতের ব্যবস্থা কর।

এ পর্যায়ে প্রথমে তওয়াফকারীদের উল্লেখ করা হয়েছে। তওয়াফ শব্দের অর্থ প্রদক্ষিণ করা অর্থাৎ আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করা, আর এটি এমনই একটি এবাদত যা শুধু বায়তুল্লাহ শরীফেরই বৈশিষ্ট্য, পৃথিবীর আর কোন গৃহের তওয়াফ জায়েয নেই।

এরপর নামায আদায়কারীদের উল্লেখ রয়েছে। কেননা সমগ্র বিশ্ববাসীদের জন্যে নামাযের কেবলা হলো কা'বা শরীফ। এরপর রুকু ও সেজদাকারীদের উল্লেখ রয়েছে, কেননা এসব হলো নামাযেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।[১]

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا
مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾
ذَٰلِكَ ۖ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ
وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৭) এবং মানুষকে হজ্জের আহ্বান জানাও যেন তারা তোমার নিকট আসে, পদব্রজে ও সর্ব প্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্র সমূহের পৃষ্ঠে আরোহণ করে, দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৫৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৪০

(২৮) যেন তারা তাদের কল্যাণময় স্থান সমূহে উপস্থিত হয় এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে চতুঃষ্পদ জন্তু থেকে যা রিয্ক হিসেবে দান করেছেন, তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তারা আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতএব, তোমরা তা থেকে খাও এবং দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে খেতে দাও।

(২৯) এরপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূরীভূত করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে আর এ প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে।

(৩০) এটিই বিধান, আর যে কেউ আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠান সমূহের সম্মান করে, নিঃসন্দেহে সে তার প্রতিপালকের নিকট উত্তম ব্যক্তি। আর তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে চতুঃষ্পদ জন্তু, সেগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে। অতএব, তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা বর্জন কর এবং মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাক।

তফসীরুল কোরআন

হজ্জের আহ্বান

আল্লাহ পাকের নির্দেশ-ক্রমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন কা'বা শরীফের নির্মাণ সুসম্পন্ন করলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে এ আদেশ দিলেনঃ

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

"আর মানুষকে হজ্জের আহ্বান জানাও"।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আরজ করলেন, আমার আওয়াজ মানুষের নিকট কি করে পৌছবে? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হজ্জের আহ্বান করা তোমার কাজ, আর এ আহ্বান মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া আমার কাজ।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন মাকামে ইব্রাহীমে দন্ডায়মান হলেন, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের কুদরতে তা উপরের দিকে উঠল এবং পাহাড়ের সমান হয়ে গেল।

আর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সাফা নামক পাহাড়ে, অথবা আবু কোবায়েস নামক পাহাড়ে দন্ডায়মান হয়েছিলেন এবং তাঁর দু' কর্ণে আঙ্গুল রেখে ডানে বামে মুখ করে ঘোষণা করেছিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক একটি গৃহ তৈরী করেছেন, এ গৃহের হজ্জ করা তোমাদের উপর ফরজ করেছেন। অতএব, তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সেদিন সমগ্র বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে হজ্জের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে এ আহ্বান প্রত্যেকটি রুহের কাছে পৌঁছে দেন। যার ভাগ্যে হজ্জ ছিল, সে এ আহ্বানে সাড়া দেয়, আর যার ভাগ্যে যতবার হজ্জ ছিল সে ততবারই সাড়া দেয়। আজ থেকে প্রায় সোয়া পাঁচ হাজার বছর আগে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে সে আহ্বান জানিয়েছিলেন, যখন সেখানে কোন জন মানুষের চিহ্নও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ পাকের

কুদরতের মহিমা প্রকাশ হচ্ছে প্রতিনিয়ত, কোটি কোটি মানুষ দূর দূরান্ত থেকে হাযির হচ্ছে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায়, হজ্জ ও ওমরা করার উদ্দেশ্যে। কেননা, আল্লাহ পাক যা চান তাই হয়।[১]

সর্বপ্রথম যারা হজ্জের আহ্বানে সাড়া দেয়

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সর্বপ্রথম যারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছিল, তারা ছিল ইয়েমেনবাসী। এজন্যে ইয়েমেনবাসী সব চেয়ে বেশী হজ্জ করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের النَّاس শব্দ দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা কা'বা শরীফকে কেবলা মানে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে, এই اَذِّنْ فِى النَّاسِ বাক্যে সম্বোধন করা হয়েছে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। আর তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছে বিদায় হজ্জে যে, মানুষকে হজ্জের জন্যে আহ্বান করুন।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে লোক সকল! তোমাদের প্রতি হজ্জ ফরজ করা হয়েছে, তোমরা হজ্জ কর। (মুসলিম, আহমদ, নাসায়ী)

يَأْتُوكَ رِجَالًا

(হজ্জের জন্যে আহ্বান কর) তবে লোকেরা পদব্রজে হজ্জ করতে আসবে। এতে ভবিষ্যতের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, হজ্জের জন্য আহ্বান জানালে মানুষ দূর দূরান্ত থেকে পদব্রজে বা যানবাহনে আরোহণ করে হাযির হবে। একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে হজ্জের এ'লান করার হুকুম তখন দেয়া হয়েছিল যখন পৃথিবীতে বর্তমান যুগের প্রচার মাধ্যম, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, মোবাইল, স্যাটেলাইট এক কথায় কোন কিছুই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরতের বহিঃপ্রকাশ এভাবে হয়েছে যে, কোন প্রকার উপায় উপকরণ ব্যতীত তাঁর আহ্বান পৌঁছে গেছে এবং কোটি কোটি মানুষ হজ্জের জন্যে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হাযির হচ্ছে। আর একথাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, "দূর দূরান্ত থেকে মানুষ পদব্রজে অথবা যানবাহনে আরোহণ করে আল্লাহর পাকের ঘরের দিকে ছুটে আসবে"।

হজ্জের উপকারিতা

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

(যেন তারা তাদের লাভের জায়গায় হাযির হয় এবং তাদের উপকার দেখতে পায়)

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৭
তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৫৫
তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৬

তফসীরকারগণ বলেছেন, منافع শব্দ দ্বারা দুনিয়া এবং আখেরাতে উভয় জাহানের উপকারের কথা বলা হয়েছে। ইমাম মোহাম্মদ বাকের এবনে আলী এবং সাঈদ এবনে মোসাইয়েব (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের منافع শব্দ দ্বারা ক্ষমা এবং মাগফেরাত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করলো এবং মন্দ কথা বলেনি, গুনাহর কাজ করেনি তবে সে এভাবে নিঃস্পাপ হয়ে ফিরে আসবে যেন এখনই সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

. সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, منافع শব্দ দ্বারা এখানে ব্যবসা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটি দ্বারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

হজ্জ সম্পর্কে এ গ্রন্থের অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং হজ্জের যাবতীয় বিধান পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।[২]

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ

আর যেন তারা আল্লাহ পাকের নামকে স্মরণ করে নিদৃষ্ট দিনগুলোতে চতুঃষ্পদ জন্তুগুলো জবেহ করার সময়।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আল্লাহ পাকের নাম স্মরণ করার যে কথা এ আয়াতে রয়েছে তা দ্বারা চতুঃষ্পদ জন্তুর কোরবানীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করা ব্যতীত জন্তু জবেহ করা হলে তা হালাল হয়না। দ্বিতীয়তঃ এ আদেশের মাধ্যমে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করার জন্যে তাঁর জিকর পূর্বশত।

فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ

নিদৃষ্ট দিনগুলো

অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন, এর দ্বারা জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা এই দশ দিনের শেষের দিকে হজ্জের সময় আসে।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলতেন, আরাফার দিন, কোরবানীর দিন এবং আইয়ামে তাশরীক।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, ايام معلومات বাক্য দ্বারা আইয়ামে তাশরীক উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৭-৪৮
২। তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২০১-২৪

এ পর্যায়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর মত হল, এ বাক্য দ্বারা কোরবানীর দিন এবং তার পরের তিন দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর بهيمة الانعام কোরবানীর উদ্দেশ্যে যে জন্তু কা'বা শরীফের দিকে প্রেরণ করা হয়। আর কোরবানী ওয়াজিব হোক বা মোস্তাহাব উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, শুধু "দমে এহসার" এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ হজ্জ যাত্রী যখন এহরাম বেঁধে কা'বা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, পথে কোন শত্রু তাকে কা'বা শরীফ গমনে বাধা দেয় তখন এহরাম খুলে নেয়া এবং হজ্জের ইচ্ছা মূলতবী করা এবং কোরবানী করা উচিত। এ কোরবানীকে দমে এহসার বলা হয়।

فَكُلُوا مِنْهَا

অর্থাৎ এই কোরবানীর জন্তুর গোশ্ত তোমরা খাও, তথা কোরবানীর গোশ্ত খাওয়া বৈধ।

মাসআলা

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি কোরবানী দেয় তার জন্যে কোরবানীর গোশ্ত খাওয়া জায়েয। হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) ইয়েমেন থেকে কয়েকটি উষ্ট্র কোরবানীর জন্য নিয়ে এসেছিলেন। আর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একশত উট প্রেরণ করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় দস্তে মোবারকে ৬৩টি কোরবানী করেন। এরপর তাঁর নির্দেশ মোতাবেক অবশিষ্ট উটগুলো হযরত আলী (রাঃ) জবেহ করেন, জবেহ করার ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে শরীক করেছেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন প্রত্যেক উষ্ট্রের গোশ্তের এক এক টুকরা করে পাতিলে রাখ, যেন রান্না করা হয়। তাই করা হল। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও হযরত আলী (রাঃ) ঐ গোশ্ত আহার করলেন এবং তার শুরবা পান করলেন। (মুসলিম শরীফ)

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোরবানীর গোশ্ত খাওয়া মুস্তাহাব। নতুবা প্রত্যেক উটের গোশ্তের টুকরা লওয়ার হুকুম দেয়া হতোনা, একই উটের গোশ্ত নেয়াই যথেষ্ট হতো।

মাসআলা

এহরাম অবস্থায় শিকার করা বা সেদিকে ইঙ্গিত করাও অবৈধ এবং অপরাধ বলে বিবেচিত। যারা এমন অপরাধ করে তাদেরকে কোরবানী দিতে হয়। কিন্তু এ কোরবানীর গোশ্ত ঐ ব্যক্তির জন্যে বৈধ নয়। যেমন শিকার করা জন্তুর গোশ্ত শিকারীর জন্যে বৈধ নয়, ঠিক তেমনি শিকারের অপরাধের কারণে যে কোরবানী দেয়া হয় তার গোশ্ত ঐ ব্যক্তির জন্যে বৈধ নয়। বস্তুতঃ আসল যেখানে হারাম হয় সেখানে তার বিনিময়ও হারাম হয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইহুদীদের

প্রতি আল্লাহর লা'নত, আল্লাহ্ পাক তাদের জন্যে চর্বি হারাম করেছেন, তারা সেই চর্বি বিক্রি করে তার মূল্য গ্রহণ করেছে। এমনিভাবে হজ্জের মৌসুমে অন্যান্য অপরাধের কারণেও যে সব কোরবানী দিতে হয় সেগুলোর গোশ্ত কোরবানী দাতার জন্যে বৈধ নয়।

মাসআলা

যে কোরবানী দেয়, কোরবানীর গোশ্ত তার জন্যে জায়েয। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এ মতের পক্ষে দলিল হিসাবে বলেছেন, কোরবানী একটি এবাদত। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, তোমরা আহার কর এবং অন্যকে আহার করাও এবং তা সঞ্চয় করেও রাখ।

আল্লামা এবনে জওযী (রঃ) এবনে আবি হাতেমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ দিয়েছেন, হজ্জে তামাত্তোকারীর কোরবানীর গোশ্ত সে যা খেতে পারে তা খেয়ে নেবে, আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা খয়রাত করবে। এ বর্ণনা দ্বারা হজ্জে তামাত্তোকারী ব্যক্তির কোরবানীর গোশ্ত খাওয়ার অনুমতি প্রমাণিত হয়।

وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ

"আর দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে খেতে দাও"।

পূর্ববর্তী আয়াতে কোরবানীকারীকে কোরবানীর গোশ্ত খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে নির্দেশ হয়েছে, যারা সমাজের কম সুবিধাভোগী লোক, যারা অভাবগ্রস্ত, তাদের মধ্যে কোরবানীর গোশ্ত বিতরণ কর, তথা নিজেও খাও এর অন্যকে খেতে দাও। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে এমনকি দুঃস্থ বিপদগ্রস্ত মানুষকে এর মধ্যে অংশীদার কর।

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ

"এরপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূরীভূত করে"।

অর্থাৎ হজ্জের এহরাম বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ যাত্রীর পক্ষে চুল কাটা, নখ কাটা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কোরবানী করার পর এসব কাজের অনুমতি দেয়া হয়। কোরবানী করার সঙ্গে সঙ্গে এহরামের যে সব নিয়ম-কানুন পালন করতে হত তার অবসান ঘটে। খুব ভালভাবে গোসল করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সেলাই করা কাপড় পড়বে এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রা শুরু হবে।

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে এ মতও পোষণ করেছেন যে, মোহরেম হালাল হওয়ার জন্যে মাথা কামিয়ে ফেলতে পারে অথবা চুল কেটে নিতে পারে। তবে চুল কেটে নেয়ার চেয়ে মাথা কামিয়ে নেয়া উত্তম। কেননা, আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে সর্ব প্রথম বলেছেনঃ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ এরপর বলেছেন, وَمُقَصِّرِيْنَ কতখানি হলক করতে হবে বা চুল কাটতে হবে এ সম্পর্কে ইমামগণ একাধিক মত পোষণ করেন। ইমাম আবু

হানিফা (রঃ)-এর মতে মাথার চার ভাগের এক ভাগ হলক করা তথা চুল কামিয়ে ফেলা বা চুল ছোট করে ফেলা যথেষ্ট।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, শুধু একটি চুল বা তিনটি চুল হলক করা বা ছোট করা যথেষ্ট।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, সম্পূর্ণ মাথা হলক করা বা সম্পূর্ণ মাথার চুল কেটে ফেলা জরুরী।

وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ

আর তাদের কর্তব্য হল মানত পূর্ণ করা। অর্থাৎ যদি কেউ কোন মানত করে থাকে তবে এ সুযোগে তা সম্পাদন করে নেবে। তবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে মানত পূর্ণ করার তাৎপর্য হল, হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান আদায় করা। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, হজ্জের যাবতীয় কর্তব্য পালন করা, কোন কিছুর মানত করা হোক বা না হোক।

অর্থাৎ যে কাজ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবশ্য কর্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে, অথবা বন্দা নিজেই নিজের উপর কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছে সবই এ সুযোগে আদায় করতে হবে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে মানত পুরো করার তাৎপর্য হল, এমন কাজ যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওয়াজিব করা হয়নি; বরং বন্দা নিজেই কাজটি নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছে।

মানত দু' প্রকার হয়। শর্ত সাপেক্ষ অথবা নিঃশর্ত। শর্ত সাপেক্ষ যেমন, যদি আমার অমুক কাজটি হয়ে যায় তবে আমি একটি রোজা রাখবো। আর নিঃশর্ত যেমন মনে মনে অঙ্গীকার করে, আমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দু' রাকাত নামায আদায় করবো। শর্ত দু' প্রকার ১. পছন্দনীয় ২. অপছন্দনীয়। যদি আল্লাহ পাক আমার রোগীকে আরোগ্য দান করেন তবে আমি চারটি রোজা রাখবো। এ শর্তটি পছন্দনীয়। আর যা অপছন্দনীয় তা হল, যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি তবে আমার কর্তব্য হবে এক মাস রোজা রাখা। এমন শর্ত আল্লাহ পাকের দরবারে অপছন্দনীয়।

হাদীসের আলোকে মানত

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে কেউ আল্লাহ পাকের এবাদতের মানত মানে, সে যেন ঐ মানত পূর্ণ করে। আর যে আল্লাহর নাফরমানীর মানত করে, সে যেন নাফরমানী না করে। (বুখারী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানত হল শুধু তাই, যাতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা কাম্য হয়। এক ব্যক্তি রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকার মানত করেছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কেই এ মত প্রকাশ করেছেন। (আহমদ)

হযরত এমরান এবনে হোসাইন (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন গুনাহর কাজের মানত করা হলে তা পুরো করা জরুরী নয় যা মানতকারীর মালিকানায় নেই (যেমন কেউ যদি বলে আমি ওমরের গোলাম আযাদ করে দেব)। (মুসলিম)

এবনে হুমাম লিখেছেন, যদি কেউ এভাবে মানত করে যে, যদি আমি অমুক কাজটি করি তবে আমার সম্পদ থেকে এক হাজার দেরহাম খয়রাত করবো, অথচ তার নিকট শুধু একশ দেরহাম রয়েছে, এমন অবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে, যত টাকা তখন তার নিকট থাকবে তা আদায়ের মাধ্যমেই মানত পূর্ণ হবে, আর যে সম্পদ তার কাছে থাকবে না, তার মানতও হবেনা।

হযরত সাবেত এবনে যাহ্যাক (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি বয়য়াতা নামক স্থানে উষ্ট্রের কোরবানী করার মানত করে। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে এ সম্পর্কে বিবরণ পেশ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ স্থানে কি বর্বরতার যুগে কোন মূর্তি ছিল, যার তোমরা পূজা করতে, সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, না (সেখানে কোন মূর্তি ছিলনা)। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বর্বরতার যুগে সেখানে কোন মেলা বসতো? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না, তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি তোমার মানত পুরো কর, নিঃসন্দেহে গুনাহর কাজের মানত পুরো করা জায়েয নয়। এমনিভাবে মানতের বস্তু মানতকারীর এখতিয়ারে যদি না থাকে তবে এমন কিছুর মানত করাও সঠিক নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম জুফার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি বায়তুল মোকাদ্দাসে নামায আদায়ের মানত করে, এরপর সে যদি কা'বা শরীফে নামায আদায় করে তবে মানত পুরো হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি কা'বা শরীফে নামায আদায়ের মানত করে আর বায়তুল মোকাদ্দাসে ঐ নামায আদায় করে তবে তা যথেষ্ট হবেনা। কেননা, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি স্বগৃহে নামায আদায় করে তবে একটি নামাযের সওয়াব হয়, আর যদি মহল্লার মসজিদে নামায পড়ে তবে তা পঁচিশটি নামাযের সমান মর্যাদা রাখে। আর যদি সে জামে মসজিদে নামায আদায় করে তবে পাঁচশ' (বাড়ীর) নামাযের সওয়াব হবে। আর যদি মসজিদে আক্সায় নামায আদায় করে, তবে (বাড়ীর) এক হাজার নামাযের সমান মর্যাদা রাখবে। আর যদি কেউ আমার মসজিদে একটি নামায পড়ে তবে তা পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান মর্যাদা রাখে। আর যদি কেউ কা'বা শরীফে একটি নামায আদায় করে তবে এক লক্ষ নামাযের সওয়াব হবে। (এবনে মাজা)

হযরত আকাবা এবনে আমের জোহানী বর্ণনা করেন, আমার ভগ্নি পদব্রজে কা'বা শরীফে যাওয়ার মানত করেন। এরপর মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আমাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করেন। আমি এ বিষয়ে আরজী পেশ করলে তিনি বলেন, তার কর্তব্য হল পদব্রজেও চলবে এবং যানবাহনেও আরোহন করবে।

মাসআলা

যদি কেউ এ'তেকাফ করার মানত করে তবে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে তার কর্তব্য হল রোজা রাখা, কেননা তাঁদের মতে রোজা ব্যতীত এ'তেকাফ শুদ্ধ নয়।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬৬-৭৫

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"আর তারা এ প্রাচীন ঘরের তওয়াফ করে"।

অর্থাৎ তারা যেন কা'বা শরীফের তওয়াফ করে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত যোবায়ের (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ)-এর সূত্রে আল্লামা বগভী লিখেছেন, কাবা শরীফকে عتيق নামকরণের কারণ হল, কা'বা শরীফকে বিনষ্ট করার সকল প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

কোন জালেম বাদশা কখনও এ পবিত্র ঘরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি; বরং যে কেউ মন্দ দৃষ্টিতে এ ঘরের দিকে দেখেছে সে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে। আবরাহার ঘটনা এ পর্যায়ে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের প্রলয়ংকরী বন্যার সময় আল্লাহ পাক এ পবিত্র গৃহটিকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং আল্লাহ পাক এ ঘরটিকে তুলে নিয়েছেন, এজন্য তাকে عتيق বলা হয়েছে।

এবনে যায়েদ এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, عتيق শব্দটির অর্থ হল, প্রাচীর। যেহেতু ঘরটি পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম ঘর, তাই তাকে عتيق বলা হয়েছে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, عتيق শব্দটির অর্থ হল, সম্মানিত, উত্তম। তাই কা'বা শরীফকে عتيق বলা হয়।

কা'বা শরীফ চির সংরক্ষিত

সুফিয়ান এবনে উয়াইনা (রাঃ) বলেছেন, কোন মানুষ কখনও এ পবিত্র গৃহের মালিক হয়নি এবং কখনও হতে পারবে না। শুধু তাই নয়; বরং কা'বা শরীফের চারি পার্শ্বের এলাকা মানুষের মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

আল্লাহ পাক কা'বা শরীফকে সর্বদা হেফাজত করেছেন। বিভিন্ন সময় কোন কোন জালেম কা'বা শরীফ দখল করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে যেমন, আবরাহা তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে হাযির হয়েছিল। এটি ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের যুগ। আবরাহার সৈন্যরা মক্কাবাসীর গৃহ পালিত জন্তু ধরে নিয়ে যায়। মক্কার তদানীন্তন নেতা আবদুল মোত্তালেব আবরাহার সঙ্গে দেখা করেন এবং মক্কাবাসীর উট বকরীগুলো ফেরত দেয়ার দাবী জানান। আবরাহা বললো, আমি তোমাদের পবিত্র ঘর ধ্বংস করতে এসেছি, তুমি সে বিষয়ে কিছুই বলনা, অথচ উটের কথা বল! তখন আবদুল মুত্তালিব বলেছিলেন, আমি উটের মালিক তাই এ সম্পর্ক কথা বলছি, আর ঘরের মালিক স্বয়ং আল্লাহ পাক, তিনি তাঁর ঘরের হেফাজত নিজেই করবেন। পরদিন দেখা গেল ছোট ছোট আবাবিল পাখি উড়ে আসছে। তাদের মুখের মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খন্ড। ঐ পাখিই আবরাহা ও তার হস্তি বাহিনীকে ক্ষণিকের মধ্যে ধ্বংস করে দেয়। এর বিবরণ স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনের সূরা ফীলে। এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর ঘরের হেফাজত করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যেহেতু সর্বকালে আল্লাহ পাক পবিত্র কা'বা শরীফকে জালেমদের থেকে হেফাজত করতেন, এজন্যে এ ঘরকে عتيق বলেছেন।

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ

"এটিই বিধান, আর যে কেউ আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠান সমূহের সম্মান করে, নিঃসন্দেহে সে তার প্রতিপালকের নিকট উত্তম ব্যক্তি"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ذٰلِكَ অর্থাৎ এ পর্যন্ত হজ্জের বিবরণ যা কিছু বর্ণিত হল, এখন তার শুভ পরিণতির কথা শোন। যে সব বিষয়কে আল্লাহ পাক সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন যে তার সম্মান রক্ষা করে, আল্লাহ পাকের নিকট তা হয় অতি উত্তম এবং পছন্দনীয় প্রশংসনীয় কাজ। এর শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত। যারা যাবতীয় পাপাচার পরিহার করে চলে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজ থেকে বিরত থাকে তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে রয়েছে অনেক সওয়াব। যেভাবে সৎ কাজের শুভ পরিণতি বা সওয়াব সুনিশ্চিত, ঠিক তেমনি মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করাও অত্যন্ত বড় সওয়াবের কাজ।[১]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

ذٰلِكَ অর্থাৎ এ পর্যন্ত হজ্জের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর একটি মূলনীতি ঘোষণা করা হচ্ছে, যে কেউ আল্লাহ পাকের বিধান শ্রবণ করে এবং এর উপর আমল করে এবং কখনও আল্লাহ পাকের বিধানের বিরোধিতা না করে এবং তার আদব রক্ষা করে তবে তা হবে ঐ ব্যক্তির জন্যে মঙ্গলজনক কাজ। এটি কারণ হবে ঐ ব্যক্তির মর্তবা বৃদ্ধির এবং মা'রেফাত লাভের ও আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার। আর যা কিছুই আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উপকরণ রয়েছে, সবই حرمٰت الله এর অন্তর্ভুক্ত হল। যেমন, আল্লাহ পাকের বিধান সমূহ, দ্বীনি কিতাব সমূহ, পবিত্র স্থান সমূহ এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য বন্দাগণ যেমন ফেরেশতাগণ, নবীগণ, সালেহগণ ইত্যাদি।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সম্মানিত বিধান সমূহের সত্যিকার সম্মান দেবে এবং সঠিক মর্যাদা দেবে, আল্লাহ পাকের দরবারে তার এ কাজ অত্যন্ত পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় হবে। তিনি আরও বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের حرمٰت الله শব্দটির ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ এবং যাবতীয় পাপাচার, আর এ নিষিদ্ধ কাজ সমূহের সম্মান করার অর্থ হল, সেগুলোর কাছেও না যাওয়া। কেননা, হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছেঃ মোমেনের দ্বারা যদি কোন ত্রুটি বা অপরাধ হয়ে যায় সে তাকে পাহাড় মনে করে, যা তার মাথার উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। আর মুনাফেকের দৃষ্টান্ত হল, সে মনে করে নাকের উপর একটি মাছি বসলে যেমন হাত নাড়লেই উড়ে যায়, এভাবে কৃত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, حرمٰت الله সে সব কাজ যা একান্ত করণীয়, অর্থাৎ যাবতীয় বিধি-নিষেধ যা মেনে চলা অত্যন্ত কর্তব্য। আর জুযায (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৫৭
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৬৮৩

আয়াতের حرمٰت সে সব কাজকে বলা হয়েছে যা করা অবশ্য কর্তব্য, যাতে কোন প্রকার ত্রুটি করা নিষিদ্ধ বা হারাম। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে حرمٰت الله শব্দ দ্বারা হজ্জের নিয়ম-কানুনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর তফসীরকার এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে حرمٰت الله শব্দ দ্বারা মক্কা শরীফ ও পবিত্র কা'বা শরীফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের নিকট উত্তম হওয়ার তাৎপর্য হল, এ কাজের জন্যে আল্লাহ পাক অনেক সওয়াব দান করবেন।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, حرمٰت অর্থাৎ সম্মানিত বস্তু সমূহ। যেমন, কোরবানীর জন্তু, বায়তুল্লাহ শরীফ, সাফা মারওয়া পাহাড়, মীনা, আরাফা, পৃথিবীর সকল মসজিদ, পবিত্র কোরআন এমনকি, আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ এসবই حرمٰت الله এর অন্তর্ভুক্ত।[২]

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, আমি কি তোমাদেরকে বলবো, সবচেয়ে বড় গুনাহ কি? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন এরশাদ করুনঃ তখন তিনি বলেন, আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করা সবচাইতে বড় গুনাহ, পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা। এ কথাগুলোকে তিনি বার বার বলছিলেন। তখন আমাদের ইচ্ছা হয়েছিল, তিনি যদি আর না বলতেন।

وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

"আর তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে চতুঃস্পদ জন্তু, সেগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে"।

অর্থাৎ যে সব জন্তু আল্লাহ পাকের নামে জবেহ করা হয় তা হালাল। কেননা, এগুলো স্বয়ং আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে, তাঁরই নামে কোরবান করা হয়।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ

"অতএব, তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা বর্জন কর"।

আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো নামে জীব-জন্তু জবেহ করা শেরক। ইসলাম এর অনুমতি দেয়না। আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন দেব-দেবীর নামে মানত করা বা জবেহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং বর্জনীয়। তাই শেরক ও মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

(আর মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাক) ইমাম আহমদ (রঃ), আবু দাউদ (রঃ), এবনে মাজা (রঃ) হযরত হাযিম এবনে ফাতেকের বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওযাসাল্লাম ফজরের নামায আদায় করেছেন এবং নামাযের পর

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১০৮
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৪৩৪

দন্ডায়মান হয়ে এরশাদ করেছেনঃ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করার অপরাধের সমান। এরপর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।[১]

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا
خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ
مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾ ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ
تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ
فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾
الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى
مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

তরজমা

(৩১) এক আল্লাহ পাকের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে। মূলতঃ যে কেউ আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করেছে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেছে, এরপর মৃত ভক্ষক পাখীরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে, অথবা বাতাস তাকে কোন দূরবর্তী স্থানে নিয়ে ফেলে দিয়েছে।

(৩২) এটিই আল্লাহর বিধান, আর যে আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের সম্মান করে, মূলতঃ তা তার অন্তরের পরহেযগারীর পরিচায়কই বটে।

(৩৩) এই সমস্ত চতুঃস্পদ জন্তুগুলোতে তোমাদের জন্যে এক নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত উপকার রয়েছে। এরপর তাদেরকে কোরবানীর স্থান ঐ প্রাচীন গৃহ পর্যন্ত পৌছাতে হবে।

(৩৪) আর আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই কোরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে করে তাদেরকে উপজীবিকা স্বরূপ যে সব চতুঃস্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলোর উপর আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করে। বস্তুতঃ তোমাদের মা'বুদ এক আল্লাহ পাকই। অতএব, তোমরা শুধু তাঁরই নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর এবং যারা বিনয়াবনত, তাদেরকে সুসংবাদ দান কর।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১০৮-০৯

(৩৫) আল্লাহ পাকের নাম স্মরণ করা হলে যাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং তাদের উপর কোন বিপদাপদ হলে তারা সবর অবলম্বন করে এবং তারা নামায কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মূর্তি পূজার অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকার তাগিদ করা হয়েছিল। আর এ আয়াতে সকল দিক থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের প্রতি একনিষ্ঠভাবে একাগ্রচিত্তে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানান হয়েছে। বস্তুতঃ মুসলমান মাত্রেরই জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই হতে হবে।

حنيف শব্দটি حنف শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হল সংকল্পের দৃঢ়তা, সত্যের উপর কায়েম থাকা এবং দৃঢ় সংকল্প থাকার তাৎপর্য হল শুধু এক আল্লাহর জন্যে এবাদত করা, সব দিক থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহ পাকের প্রতি মনোনিবেশ করা।

غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ

"আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে শুধু এক আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর"। আর সে বিশ্বাসকে দৈনন্দিন জীবনের কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রমাণ করা এবং আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের সম্মান করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সুয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা আল্লাহর সাথে শেরক করতো, আর মুশরেক অবস্থায়ও হজ্জ করতো। কিন্তু আল্লাহ পাক যখন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন এ আয়াতে নির্দেশ প্রদান করলেন, "তোমরা হজ্জ সহ সকল এবাদত কর, কিন্তু আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করোনা"।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, লোকেরা যখন মুশরেক ছিল, তখনও শেরক অবস্থায় হজ্জ করতো, তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ তোমরা একনিষ্ঠভাবে, একাগ্রচিত্তে এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, কোন অবস্থাতেই তাঁর সাথে শেরক করোনা।[১]

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ

"মূলতঃ যে কেউ আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করেছে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেছে, এরপর মৃত ভক্ষক পাখীরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে, অথবা তাকে বাতাস কোন দূরবর্তী স্থানে নিয়ে ফেলে দিয়েছে"।

এ আয়াতে শেরকের ভয়াবহ পরিণতি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে সে যেন আসমান থেকে নিচে পড়ে যায়।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৪

আসমান থেকে পড়ে গেলে যেমন রক্ষা নাই; বরং তার মৃত্যু অবধারিত, পাখীরা ঐ ব্যক্তির মৃত দেহ ছিড়ে খায়, অথবা তীব্র বাতাস তাকে দূরে নিক্ষেপ করে দেয়। ঠিক এমনিভাবে তৌহীদের উচ্চাসন থেকে যে ছিটকে পড়ে তার অবস্থা সে ব্যক্তিরই ন্যায় যে আকাশ থেকে পতিত হয়, অর্থাৎ তার ধ্বংস অনিবার্য, কেননা সে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যান্যদের সম্মুখে মাথা নত করেছে। এভাবে সে নিজেই নিজেকে অপমানিত করেছে, সে কু-প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়েছে, অথবা ইবলিস শয়তান তাকে ঝড় বাতাসের মত উড়িয়ে নিয়ে সর্বনাশের গহীন গর্তে ফেলেছে, যেখান থেকে কখনও আর সে রেহাই পাবেনা।

তফসীরকারগণ বলেছেন, মুশরেকদের এক দল শেরক ও নাফরমানীতে অবিচল থাকে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ

অর্থাৎ কাক শকুনই তাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে এবং ছিড়ে খাবে। আর বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার তাৎপর্য হল, অভিশপ্ত শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে। ঈমানের উচ্চ মকাম থেকে গোমরাহীর অন্ধকার গহবরে নিক্ষেপ করবে। কখনও মুশরেকরা তওবা করে ফেলে, এভাবে শেরক থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়। তার দৃষ্টান্ত হল, কোন লোককে তুফান দূরে উড়িয়ে নিক্ষেপ করে, পরে সে নিরাপদে বাড়ি ফেরে।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেনঃ যে শেরক করে তার দৃষ্টান্ত হল সে ব্যক্তির ন্যায়, যে আসমান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়, তার ধ্বংস হয় অনিবার্য।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, কাফেরদের দৃষ্টান্ত হল, সে ব্যক্তির ন্যায় যে আসমান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আর এমন ব্যক্তির কোন চেষ্টা-তদবীর সার্থক হবেনা।[১]

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

এটিই আল্লাহর বিধান, আর যে আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের সম্মান করে, মূলতঃ তা তার অন্তরের পরহেযগারীর পরিচায়কই বটে।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের সম্মান রক্ষা করা আল্লাহ পাকের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং তৌহীদের প্রতি ঈমানের নিদর্শন, যার অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে আল্লাহ পাকের প্রতি ভক্তি-অনুরক্তি রয়েছে, সে অবশ্যই আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে এবং তাঁর বিধি-নিষেধকে যথাযথভাবে পালন করবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে شعآئر الله দ্বারা কোরবানীর জন্তুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের দিনে একশটি কোরবানী দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে ৬৬ স্বীয় হস্ত

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১১০
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৪৯

মোবারকে কোরবানী করেছিলেন। আর অবশিষ্টগুলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে হযরত আলী (রাঃ) কোরবানী করেছিলেন।

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"এসব চতুঃষ্পদ জন্তুতে তোমাদের জন্যে এক নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত উপকার রয়েছে। এরপর তাদেরকে কোরবানীর স্থান ঐ প্রাচীন গৃহ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে"।

অর্থাৎ কোরবানীর জন্য নিদৃষ্ট উষ্ট্রের উপর (তাকে কষ্ট না দিয়ে) আরোহন করা, বোঝা বহন করা, আর তার দুধ পান করা জায়েয। আর জবেহ হওয়া পর্যন্ত এসব কিছু বৈধ।

আতা এবনে আবি রবাহ (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ) এবং এসহাক (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে, কোরবানীর জন্যে নিদৃষ্ট উষ্ট্রগুলোর উপর আরোহন করা যায়, একে দিয়ে বোঝাও বহন করানো যায় এবং তাদের দুধও পান করা যায়, তবে শর্ত হল এসব কাজের দ্বারা যেন তাদেরকে কষ্ট না দেয়া হয়।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে পদব্রজে যাচ্ছে এবং কোরবানীর জন্য সংগ্রহ করা উষ্ট্রকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি এরশাদ করলেন, তুমি এর উপর আরোহণ কর। সে ব্যক্তি আরজ করলো, হুজুর এটি কোরবানীর উষ্ট্র। তিনি পুনরায় এরশাদ করলেন, তুমি এর উপর আরোহণ কর। সে পুনরায় বললো, হুজুর এটি কোরবানীর উষ্ট্র। তিনি এরশাদ করলেন, তুমি তার উপর আরোহন কর। দ্বিতীয়বার কি তৃতীয়বার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমার মন্দ হোক।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) দেখলেন, এক ব্যক্তি কোরবানীর উষ্ট্রকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, তুমি এর উপর আরোহণ কর, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথ থেকে অধিকতর সঠিক পথে চলতে পারবে না। অর্থাৎ তাঁর পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ অবলম্বন করোনা। কোরবানীর জন্তুর উপর আরোহণ করা তাঁর সুন্নতের বরখেলাফ নয়। (তাহাবী)

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, একান্ত প্রয়োজন না হলে কোরবানীর জন্তুর উপর আরোহণ করা এবং তার উপর বোঝা তুলে দেয়া, তার দুধ পান করা বৈধ নয়, কেননা যখন কোন কিছুকে আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তখন তা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা বৈধ হয় না। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, নিতান্ত প্রয়োজন হোক বা না হোক কোন অবস্থাতেই কোরবানীর জন্তু ব্যবহার করা জায়েয নয়। কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

"যে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের সম্মান করে সে তার অন্তরের পরহেযগারীর পরিচয় দেয়"।

যেহেতু কোন কোন হাদীস শরীফে এর সমর্থন রয়েছে সেজন্যে নিতান্ত প্রয়োজনে এর অনুমতি রয়েছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, আবু যোবায়ের বলেছেন, আমি

শুনেছি হযরত যাবের (রাঃ)-এর নিকট কোরবানীর উটের উপর আরোহন করার মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিলো, তখন হযরত যাবের (রাঃ) বলেছেন, আমি নিজে শুনেছি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছিলেন, যদি তুমি বাধ্য হও, তবে কোরবানীর জন্তুর উপর আরোহন করতে পার যতক্ষণ না তোমার জন্যে কোন বিকল্প ব্যবস্থা না হয়। অতএব, আলোচ্য আয়াতের মর্ম হলো, একান্ত প্রয়োজনে নিতান্ত বাধ্য হয়ে কোরবানীর জন্তুর উপর আরোহন করা যায়।

অবশ্য আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত তফসীরকার হযরত মুজাহেদ (রহঃ), কাতাদা (রহঃ) এবং যাহ্যাক (রহঃ) বলেছেন, কোন জন্তুকে কোরবানীর জন্যে মনোনীত করার পূর্ব পর্যন্ত তার দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয, কিন্তু যখন তাকে কোরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তখন আর তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার হক্ব থাকে না।

ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

(এরপর তাদেরকে কোরবানীর স্থান ঐ প্রাচীন গৃহ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে) আলোচ্য আয়াতে "আল বাইতুল আতিক" শব্দ দ্বারা হরম শরীফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, হরম শরীফের জমীন মানুষের মালিকানা থেকে মুক্ত। কোন ব্যক্তি হরম শরীফের জমিন বিক্রিও করতে পারে না, ক্রয়ও করতে পারে না।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন, হাজী শুধু মীনাতে জবেহ করবে আর যে উমরা করবে সে মারওয়াতে জবেহ করবে, এর বরখেলাফ করা বৈধ নয়, কেননা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাই করেছেন। অবশ্য একথার জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মীনাতে কোরবানী করেছেন, কিন্তু এর দ্বারা অন্যত্র কোরবানী করা নিষিদ্ধ হয়না, কোন এক স্থানে তাঁকে কোরবানী করতেই হত, তাই বলে অন্য স্থানে কোরবানী নিষিদ্ধ তা কি করে প্রমাণিত হবে? অথচ পবিত্র কোরআন ও সুন্নতে রসূল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হরম শরীফের অন্যত্রও কোরবানী করা বৈধ।

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং আবু দাউদ, এবনে মাজা শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মীনার সমস্ত এলাকা কোরবানীর স্থান, মক্কার সমস্ত পার্বত্য এলাকা, পথ কোরবানীর স্থান এবং সমস্ত আরাফাত ও মুজদালেফা অবস্থান-স্থল।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের شعائر الله তথা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ দ্বারা বিশেষ নিদর্শনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, বিশেষ দ্বীনি নিদর্শন সমূহের সম্মান করা দ্বীনদার পরহেযগার লোকদের বৈশিষ্ট্য।

আয়াতের মর্মকথা

আয়াতের মর্মকথা হল, কোরবানীর জন্তুগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্যে অনেক দ্বীনি ফায়দা রয়েছে। আর মৃত্যু পর্যন্ত সে ফায়দা হতে থাকে। আর যেখান পর্যন্ত আমল পৌঁছে বা আমলের সওয়াব হয় সে পর্যন্ত এ উপকারও অব্যাহত থাকে। কোরবানীর জন্তু যেমন উট, গরু, ছাগল ও দুম্বা প্রভৃতি চতুঃস্পদ জন্তুতে তোমাদের জন্যে অনেক উপকার

রয়েছে। এগুলোর গোশ্ত সুস্বাদু আহার্য্য, এর দুধ অত্যন্ত উপকারী পানীয়, এর লোম পশমী কাপড়ে ব্যবহৃত, এসব জন্তুকে কোরবানীর জন্য নিদৃষ্ট করার পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু কোরবানীর জন্যে নিদৃষ্ট করার পর আর এর দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ নয়।

কোন কোন তফসীরকারের মতে, আলোচ্য আয়াতের شعائر শব্দটির অর্থ হজ্জের ফরজ সমূহ এবং সেখানকার বিশেষ বিশেষ স্থান সমূহ, যেখানে প্রত্যাবর্তনকালে হাজীগণ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকেন। আর হজ্জের যাবতীয় আমলের সওয়াবও হাজীগণ পেয়ে থাকেন।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا

"আর আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যেই কোরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি"।

لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

"যাতে করে তাদেরকে উপজীবিকা স্বরূপ যে সব চতুঃষ্পদ জন্তু দিয়েছি তারা সেগুলোর উপর আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করে"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নামে কোন জীব-জন্তু কোরবান করার বিধান নতুন কিছু নয়; বরং প্রত্যেক আসমানী ধর্মেই এটি এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এর উদ্দেশ্য হল, এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ। কিন্তু এর জন্য পূর্ব শর্ত হল, কোন জন্তু কোরবান করার সময় শুধু আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই কোরবানী করতে হবে। পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো নামে কোরবানী করা হয় বা মানত নিয়াজ মানা হয় তবে তা নিঃসন্দেহে শেরক হবে, যা অমার্জনীয় অপরাধ। অতএব, জবেহ করার সময় "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে জবেহ করতে হবে। যে জন্তু জবেহ করার সময় আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ হয়না, তার গোশ্ত খাওয়াও হালাল হয়না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু চতুঃষ্পদ জন্তু কথা বলেনা, তাই তাদেরকে بهيمة বলা হয়। আর انعام হল উট, গরু, বকরী, দুম্বা প্রভৃতি। আর কিছু কিছু চতুঃষ্পদ জন্তু রয়েছে যা انعام নয়। যেমন, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর প্রভৃতি। এগুলোর কোরবানী জায়েয নয়। (আর আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যেই কোরবানীর নিয়ম নিদৃষ্ট করে দিয়েছি) বলে মুসলমানদেরকে কোরবানীর জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কেননা, যখন পূর্ব কালের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ এ নেক আমলটি করেছেন, তখন মুসলমানদের জন্যে তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হয়েছে।

কোরবানীর ফজিলত ও বিধান

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শিং বিশিষ্ট এমন একটি ছাগল আনতে নির্দেশ করলেন যে কালো দ্বারা হাঁটে, কালোতে বসে এবং কালো দ্বারা দেখে থাকে (অর্থাৎ উপর থেকে নীচ পর্যন্ত একটি

পশমও তার যেন কালো ছাড়া অন্য রঙের না থাকে)। এরপর তাঁর কোরবানীর জন্য ঐরূপ ছাগল আনা হলো। (আমাকে) এরশাদ করলেনঃ "হে আয়েশা! ছুরি নিয়ে এসো"। এরপর আবার এরশাদ করলেন, "এটি পাথরে ঘষে ধার করে নাও"। সুতরাং আমি তাই করলাম। এরপর তিনি সেই ছুরি নিয়ে নিলেন এবং ছাগলটি ধরাশায়ী করলেন ও 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে ছাগলটি কোরবানী করে দিলেন।

এরপর এ দোয়া পড়লেনঃ হে আল্লাহ! মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিবারের তরফ থেকে এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতের তরফ থেকে কবুল কর। -(মুসলিম শরীফ)

হাদীসের ব্যাখ্যা

কোরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। এর অনেক সওয়াব। একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছে যে, কোরবানীর জন্তুর প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি সওয়াব পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি জন্তুটি পশম বিশিষ্ট হয় (অর্থাৎ দুম্বা। এ জন্তুর পশম অনেক বেশী হয়ে থাকে)? তবে তার ব্যাপারে নির্দেশ কেমন? তিনি এরশাদ করলেন, "এ জন্তুরও প্রতি পশমের বিনিময়ে একটি সওয়াব পাওয়া যাবে"। (মেশকাত)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বকরা ঈদের দিন কোরবানীর রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে অধিক প্রিয় আর কোন আমল আল্লাহর কাছে নাই। আর নিঃসন্দেহে কোরবানকারী ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার কোরবানীর জন্তুর শিং, পশম এবং খুর সাথে নিয়ে আসবে (অর্থাৎ এ বস্তুগুলি ওজনে এবং সংখ্যায় অধিক হওয়ায় তার সওয়াব বর্ধিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে)। আর তিনি একথাও এরশাদ করেছেন যে, (কোরবানীর) রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা কবুল হওয়ার মর্যাদা প্রাপ্ত হয়ে যায়। অতএব তোমরা খুব খুশী মনে কোরবানী কর। (মেশকাত)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেন যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দশ বছর মদীনা মুনাওয়্যারায় অবস্থান করেন এবং প্রতি বছর নিয়মিত কোরবানী করেছেন।-(মেশকাত)

কোরবানীর গুরুত্ব

কোরবানী করার মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা। এজন্যেই প্রাণী জবেহ করার বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। এ বিধানকে অমান্য করে কেউ যদি কোরবানীর মূল্য দান করে দেয় অথবা তার পরিবর্তে খাদ্য-শষ্য, কাপড় ইত্যাদি গরীবকে দান করে দেয় তবে তার দ্বারা আল্লাহ পাকের এ হুকুম পালন করা হবে না; বরং কোরবানী না করার দরুণ গুনাহগার হবে এবং প্রতিটি পশমের বিনিময়ে যে সওয়াব লাভে ধন্য হতো, তা থেকে বঞ্চিত হবে। একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ

"যে ব্যক্তি সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও কোরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে"।

এই হাদীস থেকেও কোরবানী করার অনেক তাগিদ প্রমাণিত হয়। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেহেতু নিয়মিত কোরবানী করতেন এবং এই আমলের জন্যে তাগিদ করেছেন সেজন্যে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সঙ্গতি-সম্পন্ন লোকদের উপর কোরবানী করা ওয়াজিব বলেছেন।

কার উপর কোরবানী ওয়াজিব

যার উপর যাকাত ফরজ হয়েছে অথবা যার কাছে (ঈদের দিনে) সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা তার মূল্যের সমান নগদ অর্থ অথবা ঐ মূল্যের পরিমাণ ব্যবসায়ের মাল অথবা ঐ মূল্যের সমান অতিরিক্ত আসবাব পত্র থেকে থাকে, তার উপর কোরবানী এবং ফেতরা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। অনেকে মনে করে যার উপর যাকাত ফরজ হয়নি তার উপর কোরবানীও ওয়াজিব হবে না। কিন্তু কথাটি সঠিক নয়, কারণ এমন লোকও আছে যাদের উপর সোনা-রূপা, ব্যবসায়ের মাল অথবা নগদ অর্থ নেছাব পরিমাণ না থাকায় যাকাত ফরজ হয়নি অথচ অতিরিক্ত আসবাব পত্র সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের পরিমাণ থাকায় কোরবানী ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কিন্তু এসব ব্যবহৃত অতিরিক্ত আসবাব পত্রের দরুণ যাকাতও ফরজ হয় না। যাকাত এবং কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আরেকটি পার্থক্য আছে। নেসাব পরিমাণ অর্থ চান্দ্র মাসের হিসাবে বারো মাস অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত ফরজ হয়ে থাকে। কিন্তু কোরবানীর জন্যে নেসাব পরিমাণ অর্থ কোরবানীর দিবসের আগের চব্বিশ ঘন্টা সঞ্চিত থাকাও জরুরী নয়। জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের আছরের সময় যদি এ পরিমাণ মাল কারো হস্তগত হয় যে পরিমাণ দ্বারা কোরবানী ওয়াজিব হয়, তবে তার উপর পরদিন কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। বলাবাহুল্য, নেসাব পরিমাণ অর্থ হস্তগত হলেই কোরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে। প্রত্যেকের মালিকানা পৃথক পৃথক দেখতে হবে। অর্থাৎ যদি কোন পরিবারে পিতা, পুত্র এবং পুত্রের মায়ের মালিকানায় এ পরিমাণ অর্থ থাকে যে পরিমাণের দ্বারা নেসাব পূর্ণ হয় তবে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক কোরবানী করতে হবে। অবশ্য নাবালেগের পক্ষ থেকে কোন অবস্থাতেই কোরবানী ওয়াজিব হবে না। সাধারণতঃ মহিলাদের নিকট যে পরিমাণ গহনা থাকে তাতে কোরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়।

কোরবানীর জন্তু

কোরবানীর জন্তু শরীয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। গুরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া এবং দুম্বার কোরবানী করা যেতে পারে। এছাড়া অন্য জন্তু যত মূল্যবানই হোক এবং যত সুস্বাদুই হোক কোরবানী দুরস্ত হবে না। এজন্যে হরিণ বা অন্য কোন জন্তু কোরবান করা জায়েয হবে না।

মাসআলা

গরু, মহিষ এবং উট এগুলোর একটি জন্তু দ্বারা সাতটি কোরবানী হতে পারে অর্থাৎ সাত ব্যক্তি শরীক হয়ে একটি জন্তু কোরবানী করলে প্রত্যেকের কোরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, প্রত্যেকের নিয়ত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করা

হতে হবে। যদি সাতজনের মধ্যে একজনেরও গোশ্‌ত খাওয়া অথবা ব্যবসা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে প্রত্যেকেরই কোরবানী বিনষ্ট হয়ে যাবে। জন্তুকে সাতের অধিক ভাগ করে কোরবানী করলে কারো কোরবানী হবে না। তবে সাতের কম ভাগ করে কোরবানী করা চলে। এমন অবস্থায় শর্ত এই যে, কারো ভাগ সাত ভাগ করলে যে পরিমাণ প্রতি ভাগে হতো তার কম কোন ভাগে হবে না।

মাসআলা

ছোট জন্তু অর্থাৎ ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি এক ব্যক্তির তরফ থেকে একটিই কোরবানী করতে হবে। এখানে একটি জন্তুতে একাধিক ব্যক্তির শরীক হওয়া জায়েয হবে না।

মাসআলাঃ

গরু ও মহিষের বয়স কমপক্ষে দু' বছর হতে হবে। উটের বয়স হতে হবে কমপক্ষে পাঁচ বছর। এছাড়া অন্যান্য জন্তুর বয়স কমপক্ষে এক বছর হওয়া জরুরী।

কেমন জন্তু কোরবানী করতে হবে

যেহেতু কোরবানীর জন্তুটি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পেশ করা হয়ে থাকে এ জন্য এটি উৎকৃষ্ট ধরণের মোটা-তাজা, সুস্থ-সবল এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যেন আমরা কোরবানীর জন্তুর চোখ এবং কান ভালভাবে পরীক্ষা করে নেই এবং এমন জন্তু কোরবানী না করি যার কানে ছিদ্র আছে। (তিরমিযী শরীফ)

হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করা হলো যে, কোরবানীর ব্যাপারে কি ধরণের জন্তু কোরবানী করা থেকে বিরত থাকতে হবে? তিনি ইঙ্গিতে এরশাদ করলেন যে, (বিশেষভাবে) চার ধরণের জন্তু থেকে বিরত থাকঃ

১. ঐরূপ খোঁড়া জন্তু যার খোঁড়ামি প্রকাশ পায়,

২. ঐরূপ অন্ধ জন্তু যার অন্ধত্ব প্রকাশিত,

৩. ঐরূপ রুগ্ন জন্তু যার রোগ প্রকাশ পেয়েছে,

৪. ঐরূপ কৃশ এবং পাতলা জন্তু যার হাড়ে একটি আবরণ ছাড়া আর কিছুই নেই।

কোরবানী করার সময়ঃ জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ থেকে নিয়ে বারো তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। এ সময়ের যে-কোন দিন কোরবানী করা চলে তবে উত্তম দিন হলো দশ তারিখ বা ঈদের দিন।

মাসআলা

ঈদের নামায শেষ হওয়ার আগে কোরবানী করা দুরস্ত নয়। তবে যে-সব এলাকায় ঈদের নামায হয় না সেখানে ফজরের নামাযের পর কোরবানী করা দুরস্ত আছে।

কোরবানীর গোশ্‌ত এবং চামড়া

যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্যে অর্থ ব্যয় করেছে সে-ই তার গোশ্‌ত, চামড়া এবং হাড়ের মালিক। ইচ্ছা করলে সে সম্পূর্ণ গোশ্‌ত নিজ পরিবারের জন্যে রেখে দিতে পারে। আর চামড়া বিক্রয় না করে যদি নিজে ব্যবহার করে তবে তাও জায়েয আছে। চামড়া বিক্রয় করলে তার অর্থ গরীবের হক্ব হয়ে যাবে। গোশ্‌ত বন্টনের উত্তম পন্থা হলো তিন ভাগের এক ভাগ গোশ্‌ত নিজে রাখবে, এক তৃতীয়াংশ নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে হাদিয়া স্বরূপ পৌছে দেবে এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ গরীবদেরকে দান করে দেবে।

মাসআলাঃ কোরবানীর গোশত অথবা চামড়া কশাইকে পারিশ্রমিক স্বরূপ দেয়া জায়েয নয়।

মাসআলাঃ কোরবানীর চামড়ার অর্থ দিয়ে মসজিদ বা মাদ্রাসা নির্মাণ করা অথবা শিক্ষক, মুয়াজ্জেন এবং ইমামের বেতন দেয়া জায়েয নয়।

فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا

বস্তুতঃ তোমাদের আল্লাহ একই আল্লাহ। অতএব, তোমরা তাঁর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর এবং যারা বিনয়াবনত হয় তাদেরকে সুসংবাদ দান কর।

আলোচ্য আয়াতে ইসলামের মূল শিক্ষা তৌহীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মা'বুদ বা উপাস্য এক আল্লাহ পাকই। অতএব, তোমরা শুধু তাঁর প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ কর এবং তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়ার লক্ষ্যেই কোরবানী কর, কোরবানীর সময় শুধু তাঁরই নাম উচ্চারণ কর।

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ

আর (হে রসূল!) আপনি সুসংবাদ দিন সে সব লোকদেরকে যারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হয় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বিনীতভাবে। مخبتين শব্দটি বহুবচন مخبت এর। এর একাধিক ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেন, مخبت বলা হয় বিনয়ী ব্যক্তিকে, যে অত্যন্ত বিনয়াবনত অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হয়।

২. আখফাস (রঃ) বলেছেন এর অর্থ হল, যে আল্লাহ পাকের দরবারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

৩. আর কালবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, যারা আল্লাহ পাকের এবাদতে সাধনা রত থাকে।

৪. মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, مخبت অর্থ হল, مخلص অর্থাৎ যে শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তাঁর বন্দেগী করে, যার এবাদতে এখলাসের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে।

৫. মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন এর অর্থ হল, যারা আল্লাহর এবাদতে এবং তাঁর স্মরণে শান্তি লাভ করে।

৬. আর আমর এবনে আওস এর মতে, مخبتين হল সে সব লোক, যারা কারো প্রতি কখনও জুলুম করেনা, আর কেউ যদি তাদের প্রতি জুলুম করে তবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেনা।[১]

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

(আল্লাহ পাকের নাম স্মরণ করা হলে যাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়) এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন তাদের কথা, যাদেরকে জান্নাত প্রদানের সুসংবাদ দিয়েছেন। অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের স্মরণ কালে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্মের উপলব্ধি তাদের দেহ মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যেমন একবার হযরত আলী (রাঃ) অযু করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেহারার বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল, তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপতে লাগলো। তিনি এত ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন, মনে হল তিনি অনেক দিনের অসুস্থ। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তোমরা জাননা আমি অযু করে কোন্ দরবারে হাযির হতে যাচ্ছি? আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে হাযির হওয়ার কথা মনে করা এবং সেই মহান দরবারের মাহাত্মের উপলব্ধি আমার এ অবস্থার কারণ।

وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত এবং ভক্তিতে অভিভূত থাকে এবং আল্লাহ পাকের বন্দেগীর কারণে যদি কোন বিপদাপদও দেখা দেয়, কোন সংকটের সম্মুখীনও হতে হয় তবে তারা সবর অবলম্বন করে, ধৈর্যহারা হয়না কখনও।

وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ যারা নামায কায়েম করে এবং নামাযের হক্ব আদায় করে।

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

"আর আমি তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে"।

হজ্জের সফর অত্যন্ত কষ্টকর। বিপদাপদের আশঙ্কা থাকে সর্বক্ষণ। ঐ বিপদে সবর অবলম্বন করা সাধক মাত্রেরই কর্তব্য। আর ঐ কঠিন সফরে নামায কাযা হওয়ারও আশঙ্কা থাকে, কিন্তু যারা সর্বদা এ ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধান থাকে তারা নামাযে গাফেল হয়না; বরং সকল অবস্থায় তারা নামায কায়েম করে থাকে। আর এ পর্যায়ে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই তাদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, আল্লাহর রাহে দান করতেও তারা কখনও এতটুকু কুণ্ঠিত হয়না।

(হে রসূল!) উল্লেখিত গুণাবলী যাদের মধ্যে রয়েছে তাদেরকে আপনি জান্নাতের সুসংবাদ দান করুন, নিঃসন্দেহে তারা সৌভাগ্যবান।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৩৪
· তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্টা-১১৫

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا
فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا
دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا
لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩৬) আর আমি উটকে করেছি আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। তোমাদের জন্যে তাতে রয়েছে কল্যাণ। অতএব, কাতারবন্দী হয়ে দন্ডায়মান অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহ পাকের নাম পাঠ কর। এরপর তারা যখন কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তা থেকে তোমরা খাও এবং অভাবগ্রস্ত সবর অবলম্বনকারীকে, যাচনাকারীকে খেতে দাও। এভাবে আমি তাদেরকে তোমাদের বশ করে দিয়েছি যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(৩৭) আল্লাহ পাকের নিকট তাদের গোশ্ত এবং রক্ত পৌছায় না; বরং পৌছায় তোমাদের পরহেযগারী। এভাবে তাদেরকে তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্যে যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন। অতএব, (হে রসূল!) আপনি নেককার লোকদেরকে সুসংবাদ দিন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের বর্ণনা রয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কোরবানীর উটও আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। এতে রয়েছে তোমাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের উপকার। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটি মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের বিরাট এহসান যে, তিনি মানুষের উপকারার্থে চতুঃষ্পদ জন্তু পয়দা করেছেন এবং সে জন্তুগুলোকে আল্লাহ পাকের নামে কোরবান করার এবং এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌছাবার আদেশ দিয়েছেন, এমনকি কোরবানীর জন্যে নিদৃষ্ট জন্তুকে আল্লাহর নিদর্শন বলে ঘোষণা

করেছেন। আর এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অসম্মান করোনা। অতএব, যে উট এবং গরু কোরবানীর জন্যে নিদৃষ্ট হয় তাকে "বুদন" বলা হয়, আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও কারো কারো মতে, শুধু উটকেই বুদন বলা হয়। কিন্তু সঠিক মত হল, উটের সাথে গরুও বুদনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, হাদীস শরীফে রয়েছে, একটি উট যেমন সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবান করা যায়, তেমনি গরুও সাতজনের তরফ থেকে কোরবান করা যায়।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীস শরীফে রয়েছে, হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা একটি উটের কোরবানীতে সাতজন শরীক হই, ঠিক এমনিভাবে একটি গরুতেও যেন সাতজন শরীক হতে পারি। এরপর এরশাদ করেছেন, এতে রয়েছে তোমাদের জন্যে আখেরাতের অনেক উপকার।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোরবানীর ঈদের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে মানুষের কোন আমল কোরবানীর চেয়ে অধিকতর পছন্দনীয় নয়। কেয়ামতের দিন কোরবানীর জন্তু তার শিং, খুর ও পশম সহ মানুষের নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে। মনে রেখ, কোরবানীর রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ পাকের নিকট পৌঁছে যায়। অতএব, তোমরা মনের সম্পূর্ণ অনুভূতি এবং আন্তরিকতা নিয়ে কোরবানী কর। (এবনে মাজা, তিরমিজী)

বিখ্যাত সুফী বুযুর্গ হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) ঋণ করেও কোরবানী করতেন। মানুষ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ এতে রয়েছে তোমাদের কল্যাণ।

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদুল আযহার নামায আদায় করি। নামায সুসম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্মুখে একটি ভেড়া হাযির করা হয় যাকে তিনি "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে জবেহ করেন, এরপর বলেন, হে আল্লাহ! এটি আমার তরফ থেকে এবং আমার উম্মতের মধ্যে যে কোরবানী না করতে পারে তার তরফ থেকে। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

আলোচ্য আয়াতের صواف শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, উটকে তার তিন পায়ের উপর দাড় করিয়ে বাঁ দিকের একটি হাতকে বেঁধে দিয়ে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়ালাকা" পাঠ করে জবেহ করাই হল এর অর্থ। সাধারণত উটকে কেবলামুখি দাড় করিয়ে তার একটি হাত বেঁধে তার বুকের মধ্যে জখম করে দেয়ার মাধ্যমেই তাকে জবেহ করা হয়। এরপর সমস্ত রক্ত বের হয়ে যায়।[১]

বোখারী শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি একটি উটকে বসিয়ে তার হলকুমে বর্শা দিয়ে আঘাত করছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এ অবস্থা দেখে তাকে বললেন, তাকে দাড় করিয়ে দাও এবং বেঁধে দাও, এটিই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পন্থা।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১১৭

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, صواف শব্দটি তখন ব্যবহৃত হয়, যখন উটকে তিনটি পায়ে দাড় করানো হয় এবং বাম পা বেঁধে দেয়া হয়।

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا

(যখন সে কাত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়) অর্থাৎ যখন তার মৃত্যু হয়ে যায়।

فَكُلُوا مِنْهَا

"তখন তোমরা তা থেকে খাও"।

وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

"অভাব গ্রস্ত সবর অবলম্বনকারীকে ও যাচনাকারীকে খেতে দাও"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, দারিদ্র প্রপীড়িত মানুষ দু' প্রকার। কেউ অভাব থাকা সত্ত্বেও সবর অবলম্বন করে থাকে, কারো নিকট ভিক্ষা চায়না, অল্পে তুষ্ট থাকে আর এক প্রকার অভাবগ্রস্ত হল, যারা দারিদ্র্যের কষাঘাতে অধীর হয়ে যায় এবং মানুষের নিকট হাত পাতে। আলোচ্য আয়াতে উভয়কে কোরবানীর গোশ্ত প্রদানের নির্দেশ রয়েছে।

তফসীরকার একরামা, কাতাদা এবং ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলেছেন, قانع সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যে ঘরে বসে গেছে এবং মানুষের নিকট চাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করে এবং অল্পে তুষ্ট থাকে। আর معتر বলা হয় সেই মিসকিনকে যে ভিক্ষা করে বেড়ায়।

উফী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, قانع সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে কারো নিকট কিছু চায়না। আর معتر সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে দাতার সম্মুখে আসে, কিন্তু কিছু চায়না।

সাঈদ এবনে যোবায়ের, হাসান ও কালবী (রঃ) বলেছেন, যে ভিক্ষা চায়, এমন মিসকিনকে قانع বলা হয়। আর معتر সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে কিছু চায়না, তবে দাতার সম্মুখে এ উদ্দেশ্যে হাযির হয়, সে যেন তাকে কিছু দিয়ে দেয়। আর এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, قانع এর অর্থ হল মিসকিন, আর معتر হল সে ব্যক্তি যে মিসকিন নয়, তবে অর্থ সম্পদ না থাকায় সে কোরবানী করতে পারেনি, আর লোকের সামনে এজন্যে হাযির হয় যেন তারা তাকে গোশ্ত দিয়ে দেয়।

كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"এভাবে আমি তাদেরকে তোমাদের বশ করে দিয়েছি যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"।

অর্থাৎ দেহের আয়তনে মানুষের তুলনায় কোরবানীর জন্তুগুলো কত বড়, কত শক্তিশালী, তারপরও আল্লাহ পাক জন্তুগুলোকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন, তার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, জবেহ করে। এটি নিঃসন্দেহে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ। এর জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার হওয়া প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে) এবং এখলাসের সঙ্গে তথা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোরবানী পেশ করবে।[১]

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

"আল্লাহ পাকের নিকট তাদের গোশ্ত ও রক্ত পৌছায় না; বরং পৌছায় তোমাদের পরহেযগারী"।

শানে নুযুল

এবনে আবি হাতেম, এবনুল মুনজের এবনে জোরায়েযের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা কোরবানী করার পর জন্তুর রক্ত কা'বা শরীফের উপর ছিটিয়ে দিত এবং গোশ্তের টুকরোগুলোকেও ছড়িয়ে দিত। যখন বর্বরতার যুগ শেষ হল, ইসলামের আবির্ভাব হল, পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা এ কর্মের অধিকতর অধিকারী (অর্থাৎ আমরাও কোরবানীর রক্ত কা'বা শরীফে ছিটিয়ে দেব)। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা সুয়ুতি (রঃ) এবনে মুনজের ও এবনে মরদবিয়ার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বর্বরতার যুগে পৌত্তলিকরা কোরবানী করার পর তার রক্ত কা'বা শরীফের সম্মুখে নিয়ে যেত এবং কা'বা শরীফের দিকে ঐ রক্ত ছিটিয়ে দিত। ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানগণও এ কাজের ইচ্ছা করলেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[২]

কোরবানীর উদ্দেশ্য

এ আয়াতে কোরবানীর প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। কোরবানীর উদ্দেশ্য হল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, তাঁর অনুগত হওয়া। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক স্বপ্নযোগে এ আদেশ দিয়েছেন, তোমার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ কর। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে আল্লাহ পাকের আদেশ সম্পর্কে জ্ঞাত করলেন। কিশোর ইসমাঈল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোরবান হতে অকুণ্ঠ চিত্তে সম্মতি দিলেন। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এ ঘটনার বিবরণ। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى

"হে আমার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি; অতএব এ সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১১৭-১৮

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১১৮
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৫৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৬৩

ইসমাঈল (আঃ) এর জবাবে বললেন, কোরআনে হাকীমের ভাষায়ঃ

قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

"হে আমার পিতা! আপনার প্রতি যে আদেশ হয়েছে তা আপনি পালন করুন, ইনশা-আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্য ধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন"।

এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে তাঁর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ করতে উদ্যত হলেন। পবিত্র কোরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করে বিশ্ব মুসলিমকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাই আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্যে প্রয়োজনে নিজের সর্বস্ব পর্যন্ত কোরবান করার বাস্তব শিক্ষা রয়েছে এ ঘটনায়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ○ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

"এরপর ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন। আল্লাহ পাক ইব্রাহীম (আঃ)-কে ডাক দিয়ে বললেন, হে ইব্রাহীম! তুমি অবশ্যই তোমার স্বপ্নের সত্যতা প্রমাণ করেছ, নিশ্চয় আমি এভাবেই নেককার লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি"।

বস্তুতঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন তা যেমন অতুলনীয়, ঠিক তেমনি চির অনুসরণীয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সেই কোরবানীর অনুসরণেই বিশ্ব মুসলিমকে প্রতি বছর দশই জিলহজ্ব আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোরবানী দিতে হয়। বিগত প্রায় সোয়া পাঁচ হাজার বছর ধরে এ বিধানের উপর আমল করা হচ্ছে এবং ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আজ পৃথিবীতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নেই, কিন্তু আল্লাহ পাকের লক্ষ কোটি প্রেমিকের দল তাঁর মহান আত্মত্যাগের আদর্শকে অনুসরণ করছেন।

ইতিহাস খ্যাত রাজা বাদশাহদের রাজত্বের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রত্নতত্ব বিভাগের মাধ্যমে, ইতিহাসের পাতায় বা যাদুঘরে। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মহান আদর্শের বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় প্রতিটি মুসলিম গৃহে, ঐতিহাসিক পবিত্র ঈদুল আযহার দিনে।

অতএব, কোরবানীর জন্তু কত বড় বা কত দামি এটি বড় কথা নয়; বরং বড় কথা হল, কি উদ্দেশ্যে কোন্ প্রেরণায় কোরবানী করা হয়েছে। এজন্যেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট এর গোশ্ত ও রক্ত পৌঁছায় না; বরং তোমাদের আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও পরহেযগারীই পৌঁছায়। তোমাদের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে ভক্তি-অনুরক্তি সুপ্ত আছে তাই আল্লাহ পাকের নিকট পৌঁছায়।

এজন্যে একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের আকৃতি বা অর্থ সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন তোমাদের অন্তরের দিকে এবং তোমাদের আমলের দিকে"।

হাদীস শরীফে আছে, কোন দুঃস্থ মানুষের হাতে সদকা খয়রাত পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ পাকের নিকট পৌঁছে যায়। এমনিভাবে কোরবানীর জন্তুর রক্ত জমিনে পড়ার পূর্বেই তা আল্লাহ পাকের নিকট পৌঁছে যায়। এর তাৎপর্য হল, কোরবানী করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তা কবুল হয়।

আলোচ্য আয়াতের এ ঘোষণা যে, "কোরবানীর গোশ্ত ও রক্ত আল্লাহ পাকের নিকট পৌঁছেনা"-এর ব্যাখ্যায় মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক কোরবানীর গোশ্ত ও রক্ত নিজের কাছে উঠিয়ে নেন না; বরং তোমাদের নিয়ত, উদ্দেশ্য এবং কর্ম তৎপরতার প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখেন।

كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ

আর এভাবেই আল্লাহ পাক এ জন্তুগুলোকে তোমাদের কর্তৃত্বাধীন করে দিয়েছেন, যেন তোমরা কোরবানী করার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর। কেননা, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণের হেদায়েত করেছেন এবং কোরবানী করার তৌফিক দান করেছেন। অতএব তোমাদের কর্তব্য হল, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা, তাঁর মহিমা প্রকাশ করা, তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখিয়েছেন, তিনিই তোমাদেরকে হজ্জের নিয়ম-কানুন বাতলিয়েছেন, তিনিই এ জন্তুগুলোকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়ার পথ প্রদর্শন করেছেন।

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ

আর (হে রসূল!) যারা এখলাস বা পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করে তথা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালন করে জীবন-যাপন করে তাদেরকে সুসংবাদ দান করুন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের محسنين শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন, موحدين অর্থাৎ (হে রসূল!) যারা তৌহীদ বিশ্বাস করে তাদেরকে আপনি সুসংবাদ দান করুন।

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم
بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

তরজমা

(৩৮) নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোমেনগণ থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ লোককে পছন্দ করেন না।

(৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে তারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক"। আল্লাহ পাক যদি মানুষকে একে অন্যের দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন তবে ধ্বংস হয়ে যেত (রাহেবদের) খানকাহ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ যেগুলোতে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয় আল্লাহ পাকের নাম। আর আল্লাহ পাক নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক জবরদস্ত শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হজ্জের বিধান এবং দুনিয়া আখেরাতে হজ্জের উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে, আর একথাও বর্ণিত হয়েছে যে কাফেররা মুসলমানদেরকে পবিত্র কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতে বাধা দিয়েছে।

মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা

আর এ আয়াতে এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, কাফেরদের বাড়াবাড়ি বেশী দিন আর নয়; অদূর ভবিষ্যতেই এমন অবস্থা হবে যে, মুসলমানদেরকে হজ্জ ও ওমরা পালনে কোন শত্রুই বাধা দিতে পারবে না। আল্লাহ পাক তাদের বিষ দাত ভেঙে দেবেন, আল্লাহ পাক এমন ব্যবস্থা করবেন যে কাফেররা মুসলমানদের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত দিতে পারবে না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোমেনগণ থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন এবং কাফেরদের অন্যায়-অনাচার বন্ধ করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, পছন্দ না করার তাৎপর্য হল ঘৃণা করা। অর্থাৎ যারা অবাধ্য কাফের এবং যারা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ তাদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। মোমেনদেরকে আল্লাহ পাক সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করে অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

"আল্লাহ পাক কি তাঁর বন্দার জন্যে যথেষ্ট নন"? এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

"আর যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তিনি তার জন্যে যথেষ্ট"। অতএব, মোমেন মাত্রেরই আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা উচিত। অবাধ্য কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক আদৌ পছন্দ করেন না।

তফসীরকার এবনে জোরায়েয (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু জবেহ করার সময় আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নাম স্মরণ করে এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নামে কোরবানী করে এবং তাদের মূর্তিগুলোর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, তাকেই আলোচ্য আয়াতে خَوَّانٍ كَفُوْرٍ বলা হয়েছে অর্থাৎ তারাই হল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ। আর এমন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে আল্লাহ পাক আদৌ পছন্দ করেন না। অতএব, যারা মোমেন, যারা সত্য পরায়ণ, তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত এবং কাফেরদের পরাজয় অবধারিত।

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করতো, অকথ্য নির্যাতন করতো, এমনকি তারা মুসলমানদেরকে মক্কা শরীফ

থেকে বহিস্কার করেছে। মুসলমানগণ কাফেরদের জুলুম অত্যাচারে বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি প্রার্থনা করতেন। কিন্তু আল্লাহ পাক মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় জেহাদের অনুমতি দেননি, বরং বিপদে ধৈর্য ধারণের এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করার আদেশ দিতেন। এভাবে মুসলমানদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা পরিপূর্ণ হয়েছে এবং এমন একটি পবিত্র দল তৈরী হয়েছে, যাঁরা ফেরেশতাদের ন্যায় আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়েছেন, এদিকে কাফেরদের অত্যাচারও চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তিনি কাফেরদেরকে মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করার আর সুযোগ দেবেন না এবং তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন দূরীভূত করবেন। আর এ অবস্থা শুধু জেহাদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে পারে। তাই আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে"।

কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি

এখানে একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সুদীর্ঘ তেরটি বছর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে নির্যাতীত-উৎপীড়িত হতে হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার অনুমতি দেয়া হয়নি; বরং তাদেরকে বারে বারে সবর অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু হিজরতের পর যখন মদীনা মোনাওয়্যারা ইসলামের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়, তখন মজলুম মুসলমানদেরকে জালেম কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার তথা অস্ত্র ধারণের অনুমতি দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

আবদুর রাজ্জাক, আবদ এবনে হোমায়েদ, তিরমিজী, নাসায়ী, এবনে মাজা, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম, এবনে হাব্বান, হাকেম, এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রায় সত্তরটি আয়াতে জেহাদের স্থলে সবর অবলম্বনের হুকুম দেয়ার পর এই প্রথম আলোচ্য আয়াতে জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

এবনে আবি হাতেম ওরওয়া এবনে ওজায়রের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এবনুল মুনজের এ বিবরণ পেশ করেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত বিশেষভাবে সে সব লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা মক্কা শরীফ থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, কিন্তু পথে কাফেরদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হন, তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার অনুমতি দান করেন।

بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

যেহেতু কাফেররা মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে এজন্যে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের

অত্যাচারিত হওয়াকে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদানের কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে একথা জানা যায় যে, যে সব কাফেরদের মুসলমানদের প্রতি জুলুম করার শক্তি নেই, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বা তাদেরকে হত্যা করা জায়েয নয়। অতএব, যারা জেহাদ করতে পারে এমন কাফেরদের স্ত্রীলোকদের হত্যা করারও বৈধ নয়। তবে যদি তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরামর্শ প্রদানে সাহায্যকারী হয়, অথবা যদি তারা সম্পদশালী হয় এবং যুদ্ধরত কাফেরদেরকে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর্থিক সাহায্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করাও জায়েয। এভাবে অকেজো বৃদ্ধ, সাধু, পাদ্রী, অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতিকে হত্যা করা বৈধ নয়। এসব লোককে হত্যা না করার হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু করার ব্যাপারে পরামর্শে শরীক না হয় এবং নিজেদের বুদ্ধিমত্তা-প্রসূত পরিকল্পনা দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য না করে। যদি তা করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে, মুরতাদ স্ত্রীলোককে হত্যা করা হবেনা; বরং বন্দী করা হবে, আর এতদিন বন্দী রাখা হবে যতদিন সে তওবা না করে অথবা বন্দী অবস্থায়ই তার মৃত্যু হবে।

ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, মুরতাদ নারী পুরুষের শাস্তির ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। উভয়কেই হত্যা করা হবে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর দলিল হল, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস, যা বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। এই হাদীসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

হযরত রবাহ এবনুর রাবী বর্ণনা করেন, আমরা এক জেহাদে হযরত রসূলে করীম সাল্লাললাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন যে, কিছু লোক একত্রিত হয়ে আছে। তাই তিনি এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন লোকদের একত্রিত হয়ে থাকার কারণ জানার জন্যে। সে ব্যক্তি এসে বললেন, একজন স্ত্রীলোকের লাশ পড়ে আছে, সেজন্যে লোকেরা একত্রিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "সেতো যুদ্ধ করতো না" (অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করার যোগ্যতা তার ছিলনা, তবু কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে)। অগ্রগামী দলের অধিনায়ক ছিলেন হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ)। তাঁকে তিনি নির্দেশ প্রেরণ করলেনঃ "কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করোনা এবং কোন শ্রমিককেও নয়"।

এই হাদীসে সাধারণভাবে স্ত্রীলোকদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সে কাফের হোক বা মুরতাদ এবং এই হাদীসে হত্যা না করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে যুদ্ধ করেনা।

হানাফীদের বক্তব্য হল, কোন কর্মের পুরস্কার বা শাস্তির প্রকৃত স্থান হল আখেরাত, দুনিয়া হল কর্মক্ষেত্র। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

অর্থাৎ "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই"। এ পৃথিবী হল পরীক্ষার স্থল বা কর্মস্থল। এটি কর্মফল ভোগের স্থান নয়। কোন আমলের যে শাস্তির বিধান নিদৃষ্ট রয়েছে যেমন, খুনের বদলা খুন, চুরি, মদ্যপান, ব্যভিচার, অপবাদ প্রভৃতির যে শাস্তির ব্যবস্থা

রয়েছে তাতে মানব জাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর এভাবে জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু-বংশ প্রভৃতির হেফাজতের উদ্দেশ্যেই এ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। মুরতাদকে হত্যা করা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য তখন হবে, যখন তার ষড়যন্ত্র বা হত্যাকান্ড থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজত করা উদ্দেশ্য হবে। এ হত্যা করার কারণ তার কাফের হওয়া নয়; কাফের হওয়ার শাস্তি অনেক বড় যা আখেরাতে দেয়া হবে। অতএব, কাফেরদের মধ্যে যাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার যোগ্যতা রয়েছে, অর্থাৎ পুরুষ যদি মুরতাদ হয়ে যায় তবে তার ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার্থে তাকে হত্যা করা জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু যার মধ্যে যুদ্ধ করার যোগ্যতা নেই অর্থাৎ স্ত্রীলোক তাদেরকে হত্যা করা হবেনা, সে কাফের হোক বা মুরতাদ। কেননা, যে কাফের যুদ্ধ করতে পারে তাদের স্ত্রীলোকদেরকে হত্যা করতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। যদি কাফেরদের হত্যা করা তার কুফরীর শাস্তি হতো, তবে হত্যা করার পর তার কুফরী থেকে পবিত্র হওয়া জরুরী হতো। যেমন, কেসাসের পর হত্যাকারী পবিত্র হয়, আর এ কারণে যে কাফেরকে হত্যা করা হয় তারও আখেরাতে নাজাত পাওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এমন নয়।

যে সব তত্ত্বজ্ঞানী মুরতাদ স্ত্রীলোকদেরকে হত্যা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন তারা বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে (মুসলমান) নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে তাকে হত্যা কর। (বোখারী শরীফ)

শানে নুযুল

আল্লামা সুয়ুতী (রঃ) লিখেছেনঃ তিরমিযী, নেসায়ী, এবনে মাজা, এবনে জরীর, এবনে মুনজের, এবনে আবি হাতেম, এবনে হাব্বান, এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। যখন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেনঃ মক্কাবাসী তাদের নবীকে বের করে দিয়েছে, এ জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উপলব্ধি করলাম যে, কাফেরদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন, সর্ব প্রথম জেহাদ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়।

এবনে আবি শায়বা, আবদ এবনে হোমায়েদ এবং এবনে আবি হাতেম তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কয়েকজন মোমেন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা দিয়েছেন। তখন কাফেররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। মূলতঃ তখনই কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়। আর সে সময়ই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, এ আয়াত হিজরতের পূর্বক্ষণে তথা মক্কার জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা সুদীর্ঘ তের বছর যাবত মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় কাফেররা মুসলমানদের প্রতি অবর্ণনীয় নির্যাতন করেছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়নি। এমনকি যখন মদীনাবাসীগণের একটি বিরাট দল মক্কা শরীফে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে বয়আত করলেন, তখন তারা বলেছিলেন যে আমাদেরকে অনুমতি দান করুন, এ মুহূর্তে মীনাতে যত মুশরেক রয়েছে, আমরা সকলকে শেষ করে দেই। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমাকে এখনও এ ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়নি"।

কিন্তু যখন কাফেরদের নির্যাতন-উৎপীড়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল এবং কাফেররা স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো, তখন প্রথমে হিজরতের হুকুম হলো, সাহাবায়ে কেরামের এক দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন এবং আর এক দল মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করলেন। তখন কাফেররা স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা করলো, ঐ অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লামকে মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করার অনুমতি দেয়া হয়। এরপর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

"যাদের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে উদ্দত হয়, তাদেরকে জেহাদের অনুমতি দেয়া হলো, কেননা তারা অত্যাচারিত"।[১]

অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য।

وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ

আর এ কর্তব্য পালনে তথা জেহাদ অভিযানে মুসলিম জাতি একা থাকবেনা, বরং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের সাহায্যও থাকবে তাদের সাথে। তাই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে– "নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুজাহেদদের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম"।

যাদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে বের করা হয়েছে তা শুধু এ কারণে যে, তারা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে অর্থাৎ তারা মুসলমান হয়েছে, তাই তাদের প্রতি বর্ণনাতীত অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ

এতে একথা প্রমাণিত হয় যারা মজলুম, তাদের জালেমের বিরুদ্ধে জেহাদ করা কর্তব্য।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৯
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৬৮৫

এখানে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে, জালেমরা শুধু এজন্যেই মুসলমানদের প্রতি জুলুম করেছে যে তারা বলেছে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক"। অথচ এ কথাটি অপরাধ নয়, কিন্তু জালেমদের ধারণা এটি অপরাধ। যারা মানবতার কল্যাণে বিশ্বাস করে, যারা মানবতার উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বাসী হয়, যারা সভ্যতার ক্রমবিকাশে অবদান রাখে তারা জানে যে এটি কোন অপরাধ নয়, বরং মানবতার উৎকর্ষ সাধনের এটিই পথ ও পন্থা। অতএব, মুসলমানদের বাড়ী-ঘর থেকে তাদেরকে বহিস্কার করার কোন অধিকার কাফেরদের ছিলনা। যারা মানুষের অধিকার হরণ করে তারাই জালেম, আর তাদের বিরুদ্ধেই ইসলাম জেহাদ ঘোষণা করেছে।

মানব দেহে কোন দুষ্ট ক্ষত হলে তার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে যেমন দেহে অস্ত্রোপচার করতে হয়, ঠিক তেমনি মানবতার দুশমনরা যখন জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচারে মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে, তখনই ইসলাম জেহাদের তা'লিম দেয়। জেহাদের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলাম বিশ্ব মানবের মহা কল্যাণ সাধন করেছে।

আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের জন্যে রয়েছে বিরাট সান্ত্বনা। মুসলমানগণ তখন ছিলেন নিঃস্ব এবং সংখ্যায় অনেক কম। আর শত্রুবাহিনীর ছিল বিরাট জনশক্তি এবং প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, অল্প সংখ্যক নিরস্ত্র-প্রায় মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক বিজয়ী করতে পারেন, সে শক্তি তাঁর অবশ্যই আছে।

মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ

বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মুসলমানদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং কাফেরদের মোকাবেলায় মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এ বাক্যটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও এতে রয়েছে বিরাট সুসংবাদ। যারা বিগত ১৩ বছর ধরে মুসলমানদের প্রতি বর্ণনাতীত জুলুম অত্যাচার করেছে, আজ তাদের মোকাবেলা করার এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি; বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মুসলমানদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আর এরই মধ্যে ইসলামের অভ্যুত্থানের এবং মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে নিহিত।

الَّذِيْنَ

এ নির্যাতিত মুসলমানদেরকে যারা তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, তাদের শাস্তি অবধারিত।

প্রশ্ন হতে পারে, কোন্ অপরাধে মুসলমানগণ তাদের বাড়ী-ঘর এবং দেশ থেকে বহিষ্কৃত হলেন? এর জবাবও রয়েছে পরবর্তী বাক্যাংশে। তাদের একটি মাত্র অপরাধ, তা হলো তারা মূর্তিপূজা বর্জন করেছে, তারা সর্বশক্তিমান সর্বগুণাকর এক আল্লাহ পাককে তাদের প্রতিপালক হিসাবে মেনে নিয়েছে, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে তথা তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এটি কি তাদের অপরাধ? এ কারণেই তাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিস্কার করা হয়েছে, আর এ অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে জেহাদ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

শান্তির জন্যেই জেহাদ

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম বিশ্ব মানবকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব-বন্ধুত্ব কায়েম করতে চায়। বিশ্ব শান্তি অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ দেয়।

কিন্তু কেউ যদি অশান্তি সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়, মানবতার উৎকর্ষ সাধনে তথা ইসলাম প্রচারে বাধা সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, অথবা মুসলমানদের উপর হামলা চালায় তখন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। এজন্যে মুসলমানদেরকে নিজের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার এবং শত্রুদের সমুচিত শাস্তি দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণেরও আদেশ দেয়া হয়েছে। যাতে করে পৃথিবী থেকে জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচারের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়। সত্য ও ন্যায়ের শত্রু তথা মানবতার শত্রুকে পরাভূত করা যায়। মুসলমানদের প্রতি যখন কোন শত্রু আক্রমণ করে, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা তখন ফরজ হয়ে যায়। যখন মুসলিম জাতি সামগ্রিকভাবে আক্রান্ত হয়, যখন কোন মুসলিম দেশের উপর শত্রুরা আক্রমণ করে, তখন শত্রুদেরকে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে প্রতিটি মুসলমানের উপর। প্রয়োজনের তাগিদে মুসলমান মাত্রকে তার জান-মাল এক কথায় যথাসর্বস্ব কোরবানী দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাই জেহাদের জন্যে যথাসাধ্য সময়োচিত প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ .

(সূরা আনফাল)

"এবং তোমরা শত্রু দমনের উদ্দেশ্য যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় কর। অশ্ব পালন ও অন্যান্য সময়োচিত, যুগোপযুগী অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবস্থা কর, যাতে তোমরা তা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুর প্রতি আঘাত হানতে পারো, তাদেরকে পর্যদুস্ত করতে পারো। প্রকাশ্য শত্রু ব্যতীত তোমাদের গোপন শত্রুও রয়েছে অর্থাৎ মুনাফেক, তাদেরকে তোমরা জাননা, আল্লাহ পাক জানেন"।

বস্তুতঃ ইসলাম যে জেহাদের বিধান পেশ করেছে তা শান্তির বৃহত্তর প্রয়োজনেই করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে অশান্তি সৃষ্টি করা হত্যাকান্ড থেকেও মারাত্মক এবং ঘৃণ্য কাজ। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

এ কারণেই যখন কাফেররা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তখন কোন মুসলমান এ পর্যায়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারেনা। কেননা, আল্লাহ পাক শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন মোমেন বন্দাদের প্রতি, আর এজন্যে জেহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

"এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না অশান্তি উৎপাত বন্ধ হয় এবং আল্লাহ পাকের দ্বীন সম্পূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়"। (সূরা আনফাল)

এ আয়াতে অশান্তি নিরসন হওয়া পর্যন্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, অত্যাচারীকে তার অপকর্মের দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে, তার অত্যাচারের মোহ ভেঙে দিতে হবে, তার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, আর তা করতে হবে সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে। মানবতার দুশমনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে সর্বশক্তি নিয়ে। আর এজন্যেই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ

"হে নবী! মোমেনদেরকে জেহাদের জন্যে অনুপ্রাণিত করুন"। (সূরা আনফাল)

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ

"হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ অভিযান করুন এবং তাদের সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করুন। আর তাদের আশ্রয়স্থল হলো দোযখ"।

এমনিভাবে মোমেনদেরকে জেহাদের তাগিদ করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"হে মোমেনগণ! তোমরা শত্রুকে চরম আঘাত হানতে বেরিয়ে পড়, হালকা ও ভারি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আর তোমাদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ কর। এটি তোমাদের জন্যে উত্তম পন্থা, যদি তোমরা তা বুঝতে পার"। (সূরা তওবা)

অতএব, এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ।

দ্বিতীয়তঃ শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই জেহাদের বিধান জারি করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ জেহাদ ব্যতীত শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প পথ নেই। অতএব, মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে এবং শান্তি-শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনে জেহাদের মাহাত্ম বর্ণনাতীত এবং এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا

"আল্লাহ পাক যদি মানুষকে একে অন্যের দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন তবে ধ্বংস হয়ে যেত (রাহেবদের) খানকাহ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ যেগুলোতে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয় আল্লাহ পাকের নাম"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক জেহাদের অনুমতি প্রদানের দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন। যেভাবে পূর্ববর্তী আয়াতে জেহাদের প্রথম কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, জালেমের জুলুমকে প্রতিরোধ করার জন্যে জেহাদ একান্ত জরুরী। ঠিক এভাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি আল্লাহ পাক মানুষকে একে অন্যের দ্বারা প্রতিরোধ না করেন, তবে গির্জা, মাদ্রাসা, এবাদতখানা, মসজিদ সবই ধ্বংস হয়ে যেত। যদি জেহাদের অনুমতি না দেয়া হতো, তবে ধর্ম-কর্মের যাবতীয় কেন্দ্রগুলো জালেমরা ধ্বংস করে ফেলতো। প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের কেন্দ্রকে ধ্বংস করতো।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) ও যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের صوامع শব্দটির অর্থ হলো, দুনিয়াত্যাগী লোকদের খানকা বা এবাদতখানা।

আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, صوامع সাবীদের এবাদত ঘর।

صلوت বলা হয়েছে খৃষ্টানদের গির্জাগুলোকে।

আর مسجد মুসলমানদের মসজিদ সমূহ।

একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ নিতান্ত একটি অপ্রিয় বিষয়। কিন্তু যদি জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষ না নেয়া হয় তবে দুনিয়াতে মহা অঘটন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। জালেমরা মসজিদ-মাদ্রাসা, গির্জা, এবাদতখানা সবই ধ্বংস করে দিত। অন্যায়ের দাপট বেড়ে গেলে, পাপাচার প্রভাব বিস্তার করে ফেললে কেউ শান্তিতে থাকতে পারেনা। তাই স্বভাব ধর্ম ইসলাম অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের শিক্ষা দিয়েছে। মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরেই ইসলাম এ নির্দেশ দিয়েছে।

এ পর্যন্ত আল্লাহ পাক জেহাদের অনুমতি প্রদানের কারণ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক মুজাহেদীনদের সাহায্য করার এবং কি শর্তে সাহায্য করবেন তা ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন যে তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করবে।

যে বা যারা সত্য ও ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদে অংশ গ্রহণ করবে, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক মহাশক্তিশালী, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি যাকে সাহায্য করেন তার বিজয় সুনিশ্চিত। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বদর, ওহোদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং অষ্টম হিজরীতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে মক্কা বিজয় দান করেছেন। বাতিলের মূলোৎপাটন হয়েছে এবং সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا
الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ
الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ
وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾ وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ
مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾
فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا
وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ
لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا
تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ﴿٤٦﴾

তরজমা

(৪১) যদি আমি এ সমস্ত লোকদেরকে দেশের মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে, আর ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর সৎ কাজের পরিণাম আল্লাহ পাকেরই হাতে।

(৪২) আর (হে রসূল!) যদি তারা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে (তবে তা নতুন কিছু নয়, আপনি চিন্তিত হবেন না কেননা) তাদের পূর্বে নূহের জাতি, আদ ও সামুদ জাতিও (তাদের নিকট প্রেরিত রসূলকে) মিথ্যাজ্ঞান করেছিল।

(৪৩) ইব্রাহীম ও লুতের জাতিও।

(৪৪) এবং মাদীয়ানবাসীরা তাদের নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, আর মূসাকেও অস্বীকার করা হয়েছিল। আমি কাফেরদেকে অবকাশ দিয়েছিলাম। এরপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম (শাস্তি দিয়েছিলাম)। অতএব, আমাকে অস্বীকার করার শাস্তি কেমন হয়েছিল?

(৪৫) আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি, তাদের অধিবাসীরা ছিল পাপীষ্ঠ। এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদ সহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল, আর কত সুদৃঢ় অট্টালিকা পড়ে রয়েছিল।

(৪৬) তারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তাহলে তারা এমন হৃদয় লাভ করতো, যা দ্বারা তারা বুঝতে পারে, এমন কর্ণ লাভ করতো, যা দ্বারা তারা শুনতে পায়। বস্তুতঃ তারা চোখের অন্ধ নয়; বরং অন্ধ হল তাদের বক্ষস্থিত হৃদয়।

তফসীরুল কোরআন

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনের সম্পর্কে। কেননা, আমরাই অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিস্কৃত হয়েছি, কাফেরদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছি। এরপর আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর জমিনের উপর ক্ষমতা দান করেছেন, আমরা নামায কায়েম করেছি, রোজাব্রত পালন করেছি, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করেছি এবং মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দিয়েছি এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখেছি, তাই এ আয়াত আমার এবং আমার সাথীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

তফসীরকার আবুল আলা বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মোহাজেরীনদের সম্পর্কে, যারা ইসলামের জন্যে তথা সত্য ও ন্যায়ের জন্যে, তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে অত্যাচারিত-উৎপীড়িত হয়েছেন, এমনকি নিজেদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন এবং হিজরতের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুমহান নেতৃত্বে মদীনাবাসী মুসলমানগণ সহ কাফেরদের বিরুদ্ধে তাঁরা জেহাদ করেছেন এবং আল্লাহ পাক তাঁদেরকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং আলোচ্য আয়াতে যে চারটি কাজের উল্লেখ রয়েছে, তা তাঁদের দ্বারা সুসম্পন্ন হয়েছে। ১. নামায কায়েম করা, ২. যাকাত আদায় করা, ৩. সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া ৪. মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। যখন আল্লাহ পাক খোলাফায়ে রাশেদীনকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন, তখন তাঁরা এ দায়িত্ব সঠিক ও সুন্দরভাবে পালন করেন।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক যাদের কথা এরশাদ করেছেন তাঁরা হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন এবং খোলাফায়ে রাশেদীন যে সত্যিই আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় এবং মনোনীত ছিলেন, এ আয়াত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইতোপূর্বে একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক তাদেরকেই সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ পাকের দ্বীনকে সাহায্য করে। খোলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। তাঁরা দ্বীন ইসলামের জন্যে অসাধারণ ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাঁদের যথা সর্বস্ব বিলীন করে দিয়েছেন। তাঁরা নামায কায়েম করেছেন সঠিকভাবে, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন সম্পূর্ণভাবে, ভাল কাজের নির্দেশ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৬৬
২ । তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৪১

দিতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে কখনও কুণ্ঠিত হননি। তাই আল্লাহ পাক তাঁদেরকে শুধু আরব জাহানেই নয়; বরং সারা পৃথিবীর এক বিরাট অংশে ক্ষমতা প্রদান করেছেন। মাত্র বারো বছরের মধ্যে তদানীন্তন পৃথিবীর দু' পরাশক্তি তথা পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্যকে আল্লাহ পাক তাঁদের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত করেছেন, কাফেরদের থেকে ছিনিয়ে পৃথিবীর নেতৃত্ব মুসলমানদেরকে অর্পণ করেছেন। আর এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছেন।[১]

ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে যখন সমাজতন্ত্র বাতিল এবং ক্ষতিকর হওয়ার কারণে তার ধ্বংসাবশেষ রেখে চির বিদায় গ্রহণ করেছে এবং ধনতন্ত্র তার অসমনীতির দুর্বলতার কারণে বাতিল বলে ঘোষিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে, এমনি অবস্থায় এ অশান্ত পৃথিবীর মানুষ শান্তি পেতে পারে ইসলামী আদর্শের সঠিক ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে। আর ইসলামী আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়া পূর্বশর্ত। এজন্যে বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের দাবি উঠেছে এবং একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে, পৃথিবী থেকে সর্ব প্রকার জুলুম-অত্যাচারের অবসান ঘটাতে হলে, সকল অন্যায় অনাচারের মূলোৎপাটন করতে হলে, মূর্খতা ও বর্বরতার অন্ধকার দূরীভূত করতে হলে, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, জুলুম-অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে সুবিচার কায়েম করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। যেভাবে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, ঠিক তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনা করলে এ পৃথিবীতে আবার শান্তি কায়েম হবে, আবার শান্তি ফিরে আসবে। প্রতিটি মানুষ পাবে তার প্রাপ্য হক্ব। জুলুম অত্যাচারের চিহ্ন মাত্র খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

প্রশ্ন হল, কোন্ কর্মসূচির বাস্তবায়নে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে? আলোচ্য আয়াতে এ প্রশ্নেরই জবাব রয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ আমি যদি পৃথিবীতে তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে। নামায হল আল্লাহর হক্ব। অর্থাৎ স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ব্যাপারে যাবতীয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হবে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারদের প্রধান দায়িত্ব। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের বাস্তবায়ন হবে পরিপূর্ণভাবে। মুসলমান যদি প্রকৃত মুসলমান হয়, নিখুঁত এবং খাঁটি মুসলমান হয় তবে মসজিদ সমূহ আবাদ হবে। আল্লাহ পাকের নামের পবিত্রতম মাহাত্ম উচ্চারিত হবে সর্বত্র। পবিত্র কোরআনের

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১২৫

মহান শিক্ষা সাধারণভাবে এবং সরকারিভাবে প্রদান করা হবে। শুধু পাঠ করা নয়; বরং এ মহান গ্রন্থের মর্ম উপলব্ধি করার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সমাজের যাবতীয় অন্যায়-অনাচার বিলুপ্ত হবে, কেননা প্রত্যেকেই আল্লাহ পাককে ভয় করে জীবন-যাপন করবে।

وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারদের দ্বিতীয় কর্তব্য হবে, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত করা। কোন মানুষ যেন অভুক্ত বা নগ্ন না থাকে তার বাস্তব ব্যবস্থা করা। যাকাত প্রথা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব আসবে। প্রত্যেকটি মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, অর্থ-সম্পদ আহরণ করা জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়; বরং উপলক্ষ্য মাত্র, পথিক মাত্রকে পাথেয় সংগ্রহ এবং সযত্নে তা সংরক্ষণও করতে হয়। কিন্তু তাই বলে কোন পথিকের পাথেয় তার ভ্রমণের উদ্দেশ্য হতে পারেনা। আর প্রত্যেকটি মানুষ যেমন নিজের পানাহারের ব্যবস্থা করবে, ঠিক তেমনি অন্যের পানাহারের ব্যবস্থা গ্রহণেও তৎপর হবে। যাকাত প্রথা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সুদ-ঘুষ-প্রতারণা, ছল চাতুরী, ওজনে ফাঁকি, ধোকাবাজী এক কথায় এ পর্যায়ের যাবতীয় অন্যায় অনাচারের মূলোৎপাটন করা হবে। সুদ বিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা হবে। চুরি-ডাকাতি, রাহজানি-ছিনতাই, সন্ত্রাস চিরতরে বিদায় নেবে। নৈতিকতা বিরোধী যাবতীয় কাজ যথা সিনেমা, থিয়েটার-নাচ-গান প্রভৃতি বাতিল ঘোষণা করা হবে। একটি পূতঃ পবিত্র পরিচ্ছন্ন সমাজ ও জাতি গড়ে উঠবে। আর প্রত্যেকটি মানুষ তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, সত্যের নির্দেশ দেবে এবং অসত্য থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।

যদি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তবে সত্যিকার অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে, তখন এ পৃথিবী থাকবেনা; বরং তা জান্নাতের একটি সুন্দরতম নমুনায় রূপান্তরিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে।[১]

وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

(আর সৎ কাজের পরিণাম আল্লাহ পাকেরই হাতে) যেহেতু সৎ কাজের পরিণাম আল্লাহ পাকের হাতে, তাই মোহাজেরদেরকে ইতোপূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই যথা সময়ে পূর্ণ হবে। মূলতঃ পূর্ববর্তী আয়াতে মজলুম মুসলমানদেরকে সাহায্য করার যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তাকে আরো সুদৃঢ় করা হয়েছে এবং কাফেরদের মোকাবেলায় মুসলমানদের বিজয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে এ আয়াতে। অতএব, আজ কাফেররা যত শক্তিশালী হোক না কেন এবং মুসলমানগণকে যত দুর্বলই মনে হোক না কেন, অবশেষে মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ

আর (হে রসূল!) যদি তারা আপনাকে মিথ্যা জ্ঞান করে (তবে তা নতুন কিছু নয়, আপনি চিন্তিতও হবেন না, কেননা) তাদের পূর্বে নূহের জাতি, আদ ও সামুদ জাতিও (তাদের নিকট প্রেরিত রসূলকে) মিথ্যাজ্ঞান করেছে।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৬৮৬

প্রিয়নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ হে নবী! মক্কার মুশরেকরা যদি আজ আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে থাকে এবং আপনার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, তবে তাতে বিস্মিত ও দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা, অতীতেও যুগে যুগে কাফের মুশরেকরা তাদের প্রেরিত নবী রসূলগণের সঙ্গে অনুরূপ আচরণই করেছে। তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে। নূহের জাতি তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছে। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর তিনি তাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু তারা শুধু যে তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে তাই নয়; বরং তাঁর প্রতি চরম জুলুম অত্যাচার করেছে। আদ ও সামুদ জাতি হযরত হুদ (আঃ) এবং হযরত সালেহ (আঃ)-কে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছে। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতিও তাঁকে চরম কষ্ট দিয়েছে। ঐ কাফের মুশরেকরা যুগে যুগে অহংকার করেছে, ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। কিন্তু অবশেষে জয় হয়েছে সত্যের, ন্যায়ের। আল্লাহর দুশমনদেরকে অপমানিত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

(হে রসূল!) এ যুগের কাফের মুশরেকরা পূর্বের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তারা যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে এবং আপনার প্রতি ও আপনার সাহাবায়ে কেরামের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে থাকে, তবে তাদের জানা উচিত যে তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তাদের পরিণাম ভয়াবহ। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَأَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ

"আমি কাফেরদেরকে অবকাশ দেই, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করি। অতএব, আমাকে অস্বীকার করার শাস্তি কেমন হয়েছে"?

আল্লাহ পাক পরম করুণাময়। তাই তিনি কাফের মুশরেক ব্যতীত, দূরাত্মা পাপীষ্ঠদেরকেও অবকাশ দিয়ে থাকেন। যাতে করে তারা আত্ম সংশোধনের সুযোগ লাভ করে। কিন্তু আত্ম সংশোধনের স্থলে তারা আত্ম প্রতারিত হয়। আত্ম বিস্মৃত হয়। তাদের পাপের বোঝা আরো বেড়ে যায়। পরিণামে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। (হে রসূল!) যে কাফেররা আপনার প্রতি জুলুম অত্যাচার করছে তাদের পরিণামও যে ভয়াবহ হবে এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা, ইতিপূর্বে এমন পথভ্রষ্ট বহু জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ

"আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি, তাদের অধিবাসীরা ছিল পাপীষ্ঠ। এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদ সহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল, আর কত সুদৃঢ় অট্টালিকা পড়ে রয়েছিল"।

মক্কার কাফের মুশরেকরা যে অন্যায় অনাচারে লিপ্ত রয়েছে, এমনি অন্যায়-অনাচারের শাস্তি স্বরূপ কত জনপদবাসীকে ইতোপূর্বে ধ্বংস করা হয়েছে। তাদের সখের সুউচ্চ অট্টালিকাগুলো নিজেরই ছাদের উপর মুখ থুবরে পড়ে রয়েছে। তাদের কত ঝরণা অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। তাদের হল ও মহলগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কেননা, তারা ছিল জালেম। তারা এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করেনি, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেছে, কিন্তু তাঁর প্রতি হয়েছে অকৃতজ্ঞ। অথচ নিজেদের হাতে বানানো মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করেছে। তাদেরকেই ভাল-মন্দের নিয়ামক মনে করেছে। তাই তাদের এ ভয়াবহ পরিণাম হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যে কূপ ও সুদৃঢ় অট্টালিকার কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, এর উভয়টিই ছিল ইয়েমেনে। অট্টালিকাটি ছিল পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায়, আর পানির কূপটি ছিল পাহাড়ের পাদদেশে। যখন এসবের মালিকরা আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে তখন আল্লাহ পাক তাদের অট্টালিকা এবং কূপ সহ যথা সর্বস্ব ধ্বংস করে দেন।

আবু রওক তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ কূপটি ছিল হাজারা মাউত এলাকার একটি শহরে। এ শহরের নাম ছিল হাসুরা। এ শহরটি আবাদ করেছিলেন চার হাজার মোমেনের একটি দল। যারা হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর সঙ্গী হয়ে এখানে এসেছিলেন। এখানে আগমনের পর হযরত সালেহ (আঃ)-এর ইন্তেকাল হয়। এজন্যে শহরটির নাম হয় হাজারা মাউত (অর্থাৎ হযরত সালেহ (আঃ) এখানে এসেছেন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেছেন)। হযরত সালেহ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর লোকেরা শহরটিকে সুন্দরভাবে নির্মাণ করে এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকে। সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তারা নিজেদের মধ্যে একজন শাসনকর্তা নির্বাচন করে। অবশেষে তাদের মধ্যে অনেক লোক বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাদের মধ্যে নৈতিক দুর্বলতা সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ে। তারা মূর্তি পূজা শুরু করে। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্য হানজাল এবনে সাফওয়ানকে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তিনি তাদেরকে অনেক উপদেশ দেন। কিন্তু তারা তাঁকে অমান্য করে এবং তাঁকে বাজারে হত্যা করে। আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেন এবং তাদের সুউচ্চ ইমারত এবং কূপ সব এমনিই পড়ে থাকে।[১]

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ

. "তারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তাহলে তারা এমন হৃদয় লাভ করতো, যা দ্বারা তারা বুঝতে পারে, এমন কর্ণ লাভ করতো, যা দ্বারা তারা শুনতে পায়"।

পূর্ববর্তী আয়াতে অবাধ্য কাফেরদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, এ কাফেররা পৃথিবীতে ভ্রমণ কেন করেনা, যাতে করে তারা পূর্ব কালের পাপীষ্ঠ লোকদের ধ্বংসাবশেষ দেখতো এবং সত্য উপলব্ধি করতো। তাদের চোখ কান ফুটতো। তাদের হৃদয় সত্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করতো এবং তাদের শ্রবণ শক্তি সত্য কথা শ্রবণ করার শক্তি অর্জন করতো।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১২৬-২৭

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

(বস্তুতঃ তারা চোখের অন্ধ নয়; বরং অন্ধ হল তাদের বক্ষস্থিত হৃদয়) তারা চোখের অন্ধ নয়, মনের অন্ধ। তারা তৌহীদের দলিল-প্রমাণ লক্ষ্য করে, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত দেখতে পায়। কিন্তু এসব দেখে এক আল্লাহ পাকের প্রতি তারা বিশ্বাস করেনা কেননা, তাদের মন সম্পূর্ণ অন্ধ। প্রকাশ্যে চক্ষুস্মান হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থেই তারা অন্ধ। এতে একথা প্রমাণিত হয়, চক্ষুর অন্ধত্বের চেয়েও মনের অন্ধত্ব অধিকতর বিপজ্জনক।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, কোন বিষয় চোখে দেখে উপকৃত হওয়ার পন্থা হল, মনের আলোর উপস্থিতি। মনের আলো থেকে বঞ্চিত হলে চোখের দেখায় তেমন কোন উপকার হয় না।

বায়হাকী দালায়েলে, এবনে আসাকের আকাবা এবনে আমের জুহানীর সূত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, মনের অন্ধত্ব হল জঘন্যতম অন্ধত্ব!

আল্লামা বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, যখন এ আয়াত

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ

(যে এ পৃথিবীতে অন্ধ হবে, আখেরাতেও সে অন্ধ হয়ে উঠবে) নাযিল হল, তখন আবদুল্লাহ এবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) আরজ করলেন, আমি দুনিয়াতে অন্ধ, আখেরাতেও কি অন্ধ হয়ে উঠবো? আলোচ্য আয়াত তখনই নাযিল হয়। অর্থাৎ আয়াতে যে অন্ধত্বের কথা বলা হয়েছে তা হল মনের অন্ধত্ব, চোখের নয়। তাই এমন অন্ধ লোকেরা সব কিছু দেখেও কিছুই দেখতে পায়না। আর কোন প্রকার ডাকই তাদের মনে রেখাপাত করেনা।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا
عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ
أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۖ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾ قُلْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْ
فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

তরজমা

(৪৭) (হে রসূল!) তারা আপনার নিকট আযাবকে ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ পাক কখনো তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।

(৪৮) পাপীষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমি আরো কত জনপদকে-ই অবকাশ দিয়েছি, এরপর তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি এবং আমার নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(৪৯) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, হে মানব জাতি! আমিতো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

(৫০) অতএব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

(৫১) আর যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টা করে, তারাই হবে দোযখের অধিবাসী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, কাফের মুশরেকরা হলো মনের অন্ধ, তাদের অন্তর-দৃষ্টি বলতে কিছুই নেই, তারা পরিণামদর্শী নয়। আর আলোচ্য আয়াতে এ কথারই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের আযাবকে ত্বরান্বিত করার জন্যে তথা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার জন্যে তারা তাড়াহুড়া করছে, তা নিঃসন্দেহে তাদের অন্তরের অন্ধত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়।

শানে নুযূল

আল্লামা বগভী লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে নজর এবনে হারেস সম্পর্কে। সে দোয়া করেছিলো, হে আল্লাহ! মোহাম্মদ (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা যদি তোমার তরফ থেকে সত্য হয়, আর তিনি যদি সত্যবাদী হন (যা আমরা অস্বীকার করি) তবে আমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর।[১]

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ

আর কাফেররা আপনার নিকট আযাবের জন্যে তাড়াহুড়া করছে, অথচ ঐ আযাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা কি মনে করে তাদের উপর থেকে আযাব চলে যাবে? অথবা তারা কি এ ধারণা করে যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক যে আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং যে ওয়াদা করেছেন তার বরখেলাফ করবেন? এমনটি কখনও হবেনা, আযাব অবশ্যই আসবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১২৯

وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ

"আল্লাহ পাক তাঁর ওয়াদা কখনও বরখেলাফ করেন না"। তিনি আযাব সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাক সওয়াবের যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পুরো করা হবে। সেই ওয়াদা পূর্ণ না হওয়া যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি অবাধ্য কাফেরদের শাস্তির কথাও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে অর্থাৎ কাফের মুশরেকদের প্রতি অবশ্যই আযাব আসবে, যার মৃত্যু হয়েছে শেরকের উপর তাকে অবশ্যই চির শাস্তি ভোগ করতে হবে কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ .....

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে ক্ষমা করবেন না, তবে এতদ্ব্যতীত অন্য গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতেও পারেন) অতএব, কাফের মুশরেকদেরকে অবশ্যই দোযখের চিরশাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

"আর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান"।

একদিন হাজার বছরের সমান

পৃথিবীর হাজার বছর আল্লাহ পাকের নিকট মাত্র একদিনের সমান। অপরাধী কাফেররা আজ যেমন আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, হাজার বছর পরও আল্লাহ পাকের কবলেই থাকবে, পলায়নের কোন সুযোগ তারা পাবেনা।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ পাক হাজার বছরের কাজ এক মুহূর্তেই করতে পারেন। তবে যখন যা যেভাবে তিনি পছন্দ করেন, তা সেভাবেই তিনি করে থাকেন। এর হেকমত সম্পর্কে তিনিই সম্পূর্ণ অবগত। কাফেরদেরকে কখন শাস্তি দিতে হবে তা তিনি ভালো ভাবেই জানেন, এর হেকমত সম্পর্কে এক আল্লাহ পাকই সম্পূর্ণ অবগত। কারো তাড়াহুড়ায় তাঁর কর্মসূচিতে কোন প্রকার পরিবর্তন হয়না। কেয়ামতের এক দিন পৃথিবীর হাজার বছরের সমান। এমন অবস্থায় কাফেরদের আযাবের জন্যে তাড়াহুড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন, আল্লাহ পাকের নিকট একদিনে যা সময় হয়, তা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান। যেহেতু আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যখন ইচ্ছা তখনই অপরাধীকে পাকড়াও করতে পারেন। পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়, আর আযাবে বিলম্ব করা হলেও অপরাধী তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে সক্ষম নয়। তাই আযাবকে তাড়াহুড়া করে নাযিল করা বা কিছু সময় অবকাশ দিয়ে নাযিল করা আল্লাহ পাকের কুদরতের সম্মুখে উভয় অবস্থাই সম্পূর্ণ সমান। অতএব, দূরাত্মা কাফেররা আযাবকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে যা বলে তার কোন প্রয়োজন নেই।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, তারা যে আযাবকে ত্বরান্বিত করতে বলে তার একদিন মানুষের গণনার হিসাবে হাজার বছরের সমান। কেননা, দুঃখের দিন অনেক বড় হয়। আর আনন্দের ক্ষণ হয় অনেক ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত। এতদসত্ত্বেও তারা এমন ভয়াবহ আযাবকে ত্বরান্বিত করতে বলে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাকের ধৈর্য ও সহনশীলতার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁর ওয়াদা কখনও বরখেলাফ করেন না। কিন্তু তিনি তাঁর আযাবকে সেদিন পর্যন্ত বিলম্ব করছেন যেদিন তোমাদের হাজার বছরের সমান সুদীর্ঘ হবে, অর্থাৎ কেয়ামতের দিন। বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) ও একরামা (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আখেরাতের একদিন তোমাদের হাজার বছরের সমান হবে। তারা তাদের এ মতের সমর্থনে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে দুঃস্থ মোহাজেরদের দল! তোমাদের জন্যে সুসংবাদ, কেয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ নূর হাসিল করবে, তোমরা জান্নাতে অর্থ-সম্পদশালী লোকদের অর্ধেক দিন পূর্বে প্রবেশ করবে, আর তোমাদের প্রতিপালকের একদিন তোমাদের হাজার বছরের সমান হবে।

তিরমিযী শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দারিদ্র প্রপীড়িত লোকেরা ধনীদের থেকে পাঁচশ' বছর পূর্বে, আর আখেরাতের হিসাবে অর্ধেক দিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۖ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ

"পাপীষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমি আরো কত জনপদকেই অবকাশ দিয়েছি, এরপর তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি এবং আমার নিকট সকলেরই প্রত্যাবর্তন করতে হবে"।

এ আয়াত দ্বারাও একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ওয়াদা বরখেলাফ করেন না। কেননা, অনেক জনপদকে অবকাশ দেয়ার পরও পাকড়াও করা হয়েছে এবং তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। অতএব, কোন জালেম সম্প্রদায়ের শাস্তি বিধানে বিলম্ব হলে একথা মনে করা উচিত নয় যে, আযাব কখনও আসবে না। কেননা, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আযাব ত্বরান্বিত করা বা বিলম্ব করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে, দুনিয়ার রাজা বাদশারা শাস্তি এজন্যে ত্বরান্বিত করে যে আশঙ্কা থাকে, অপরাধী পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরতের হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারেনা, কেউ পলায়ন করতে পারেনা। তাই আল্লাহ পাক অপরাধীকে সুদীর্ঘ অবকাশ দিয়ে থাকেন। আর এ অবকাশের পেছনেও থাকে হেকমত ও মুসলেহাত। হয়তো অপরাধী অবকাশ পেয়ে আত্ম সংশোধনে সচেষ্ট হবে এবং আত্মোন্নতি লাভ করবে। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা স্থান-কাল থেকে পবিত্র এবং তাঁর দরবারে সময়ের কমবেশী হওয়া সমান। তবুও মক্কার কাফেরা আযাবকে ত্বরান্বিত করার কথা বলেছে। আল্লাহ পাক কোন মোসলেহাতে যদি এক হাজার বছরেও আযাবকে বিলম্বিত করেন তবে তাঁর হিসাবে এক দিনই বিলম্ব হবে, আর এ বিলম্ব কোন বিলম্ব নয়।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১২৯-৩০

২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩২

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, হে মানব জাতি! আমি তো তোমাদের জন্যে এক স্পষ্ট সতর্ককারী"।

তোমাদেরকে সাবধান করাই আমার কাজ

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় কাফেরদের জানিয়ে দিন যে, তোমাদেরকে সাবধান করাই আমার কাজ, আযাব দেয়া না দেয়া আল্লাহ পাকের ইচ্ছার ব্যাপার। এ সম্পর্কে তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর অকৃতজ্ঞ হয় এবং যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য বা নাফরমান হয়, যারা নিজেদের অন্যায়-অনাচারের মাধ্যমে এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে তোলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আল্লাহ পাকই করেন। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের ভক্ত অনুরক্ত বন্দা, যারা আল্লাহ পাকের বিধান মেনে জীবন-যাপন করে তাদেরকে আল্লাহ পাক তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা অনুসারে পুরস্কৃত করবেন এবং বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামত তারা লাভ করবে। শুধু তাই নয়; বরং তারা আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবে, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

"অতএব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা"।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম কবুল করলে তার পূর্বের কৃত গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হয়। (মুসলিম শরীফ)

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন, (হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন, আমিতো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী, তোমাদের হিসাব নেয়া আমাদের দায়িত্ব নয়, কার ভাগ্যে হেদায়েত রয়েছে, আর কার অদৃষ্টে আযাব রয়েছে তা আল্লাহ পাকই জানেন। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে তাদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ দিয়েছেন। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দু'টি দায়িত্ব-কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা এবং মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান করা। তাই মোমেনদের জন্যে এ আয়াতে দু'টি সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। ১. যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তাদেরকে মাগফেরাত দান করা হবে এবং উত্তম ও ও সম্মানজনক রিয্ক দান করা হবে, যা হবে স্থায়ী এবং যেহেতু সেখানে রোজগার করার কোন প্রয়োজন হবেনা, তাই এ রিয্ক হবে অত্যন্ত সম্মানজনক।

কল্পনাতীত নেয়ামত

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বেহেশতের নেয়ামত সম্পর্কে বলেছেন, বেহেশত-বাসীদের জন্যে এমন নেয়ামত রয়েছে যা পৃথিবীতে কেউ দেখেনি,

যার বিবরণ কেউ শ্রবণও করেনি, আর কেউ তা চিন্তাও করেনি, তথা মানুষের জন্যে পৃথিবীতে যা কল্পনাতীত, এমন নেয়ামত জান্নাতবাসীগণকে দেয়া হবে।[১]

আল্লামা সুয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, এবনে আবি হাতেম মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক যখনই رِزْقٌ كَرِيْمٌ এর কথা এরশাদ করেছেন, তখন এর দ্বারা জান্নাতকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

"আর যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টা করে তারাই হবে দোযখের অধিবাসী"।

পূর্ববর্তী আয়াতে নেককার মোমেনদের পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে অবাধ্য কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের مُعٰجِزِيْنَ শব্দটির অর্থ হল, যারা আল্লাহ পাকের বিধানের বিরোধিতা করে, যারা মুসলমানদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে, যারা আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করে এবং আল্লাহর নবীর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসী হয় তারাই হবে দোযখবাসী।

ইমাম কাতাদা (রঃ) مُعٰجِزِيْنَ শব্দটির এ অর্থ বর্ণনা করেছেন, যারা নিজের ধারণায় আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করতে প্রয়াসী হয় আর তারা ধারণা করে যে, কেয়ামত হবেনা, জান্নাত এবং দোযখও হবেনা। অথবা এর অর্থ হলো এই, যারা আমার মোকাবেলা করে এবং আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে চায় তারা হবে দোযখবাসী।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হল যারা আমার রসূলকে ব্যর্থ করতে সচেষ্ট হয়, অথচ রসূল তাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করতে প্রয়াসী থাকেন, আর তারা দোযখে প্রবেশ করতে সচেষ্ট থাকে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত ও হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার দৃষ্টান্ত হল সে ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্জলিত করে, যখন চতুর্দিক আলোকময় হয়ে যায় তখন পতঙ্গ এসে তার মধ্যে পড়তে থাকে, আর সে ব্যক্তি পতঙ্গগুলোকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু পতঙ্গ থাকে অগ্নির প্রতি আকৃষ্ট এবং অগ্নিতে প্রবেশ করতে থাকে। ঠিক এভাবে আমিও তোমাদেরকে দোযখে থেকে রক্ষা করতে চাই, আর তোমরা তার মধ্যে প্রবেশ করতে সচেষ্ট থাক।

আল্লামা সুয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, মুজাহেদ (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, যারা লোকদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে বাধা দেয় তারা হবে দোযখবাসী।[২]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৪৮-৪৯
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪০১

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এর অর্থ হল, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ থেকে বাধা দেয় তারাই হবে দোযখবাসী।[১]

ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে বাধা দেয়ার তাৎপর্য হল, তারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং ধারণা করেছে যে, তারা দ্বীন কায়েম করার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে, অথচ তাতে তারা কখনও সক্ষম হবেনা।[২]

وَمَآ أَرْسَلْنَا
مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ
فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ
ءَايَٰتِهِۦ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ
فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَ
إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟
ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾
وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ
ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

তরজমা

(৫২) (হে রসূল!) আমি আপনার পূর্বে যে রসূল বা নবী প্রেরণ করেছি, যখন তারা কোন কিছু ভাবতেন তখন শয়তান তাদের ভাবনায় কিছু না কিছু মিশ্রিত করে দিত। এরপর আল্লাহ পাক শয়তানের মিশ্রিত বিষয় সম্পূর্ণ দূরীভূত করে দেন এবং নিজের কথা মজবুত করে নেন, আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, সকল নিগুঢ় রহস্য সম্পর্কে অবগত।

(৫৩) আর তা এজন্যে যে, শয়তান যা মিশ্রিত করে তা দ্বারা তিনি সে সব লোকদের পরীক্ষা করতে চান, যাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি এবং যারা পাষাণ-হৃদয়। আর নিশ্চয় জালেমরা বিরোধিতায় অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৭, পৃষ্ঠা-৬৮
২। তফসীরে তাবারী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৩০

(৫৪) আর তা এজন্য যে, যাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটি হল আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে ধ্রুব সত্য। ফলে তারা এর উপর বিশ্বাস করে এবং তার সম্মুখে তাদের মন নরম হয়ে আসে। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদেরকেই সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, যারা ঈমান আনে।

(৫৫) আর যারা অবাধ্য নাফরমান হয়েছে, তারা তাতে সন্দেহ পোষণ থেকে বিরত হবেনা, যতক্ষণ না তাদের নিকট অতর্কিতভাবে কেয়ামত উপস্থিত হবে, অথবা যেদিন নিস্কৃতির কোন উপায়ই থাকবে না। সেদিনের আযাব এসে পড়বে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

(وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ.....)

"ইসলামের দুশমনরা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে তথা দ্বীন ইসলামকে প্রতিরোধ করার অপচেষ্টায় সর্বক্ষণ লিপ্ত রয়েছে"।

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ যখন কোন নবী রসূল প্রেরিত হয়েছেন, তখন তাঁদের কথায় শয়তান মানুষের মনে নানা প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করেছে, এটি নতুন কিছু নয়, প্রায় সব যুগেই শয়তানের এ অপচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং আল্লাহ পাক শয়তানের এ অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন এবং অসত্যকে বাতিল করেছেন। এরই মধ্যে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদেরও পরীক্ষা হয়ে গেছে কে খাঁটি, কে নিখুঁত, আর কে মুনাফেক তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ

অর্থাৎ কোন রসূল বা নবী যখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন আয়াত পাঠ করে মানুষকে শ্রবণ করান, তখন শয়তান শ্রোতাদের মনে নানা প্রকার ওয়াস ওয়াসার মাধ্যমে সন্দেহের সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের আয়াত পাঠ করলেনঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

"তোমাদের প্রতি মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে"। তখন শয়তান নির্বোধ লোকদের মনে এ সন্দেহ সৃষ্টি করলো, "দেখো! নিজেরা জবেহ করে যখন জন্তুকে মারে তখন তা হালাল হয়, আর স্বয়ং আল্লাহ পাকের হাতে যার মৃত্যু হয় তাকে হারাম বলে ঘোষণা করা হচ্ছে"।

এভাবে ইবলিস শয়তান মানুষের মনে শরীয়তের বিধান এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

এমনিভাবে আরো দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হলোঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

"তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যরা দোযখের ইন্ধন হবে"। শয়তান তখন কিছু লোকের মনে প্রশ্ন উত্থাপন করলো, পৃথিবীর অনেক লোক হযরত ঈসা (আঃ) এবং ওযায়ের (আঃ)-কে পূজা করে, এ আয়াতের মর্ম মোতাবেক তাঁদেরকেও দোযখে যেতে হবে। এসব প্রশ্নের উত্তর স্ব-স্থানে দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) যখনই আপনার পূর্বে আমি কোন নবী রসূল প্রেরণ করেছি, তখন শয়তান তাদের কথায় এমন সন্দেহ সৃষ্টি করে মানুষকে প্রতারিত করার অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু অবশেষে তাদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কেননা, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক শয়তানের ওয়াস ওয়াসা দূরীভূত করেছেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ

এরপর আল্লাহ পাক শয়তানের ওয়াস ওয়াসাকে দূরীভূত করে দিয়েছেন এবং শয়তান যে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে তার নিরসন করেছেন।

ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ

এরপর আল্লাহ পাক তাঁর আয়াত সমূহকে মজবুত করে দেন তথা শয়তানের তৈরী করা সন্দেহের শেকড় কেটে দেন, যা ধ্রুব সত্য, যা হক্ব তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, শয়তানের ওয়াস ওয়াসার মাধ্যমে সন্দেহ সৃষ্টি করার এতটুকু অবকাশ থাকেনা।

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়, সকল রহস্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। তিনি মানুষের অবস্থা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। যে হেদায়েতের যোগ্য তাকে তিনি হেদায়েত দান করেন, আর যে পথভ্রষ্ট থাকার যোগ্য তাকে পথভ্রষ্ট থাকতে দেন। তিনি যা কিছু করেন তা নিজের হেকমতে করেন, তাঁর কোন কর্মের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করার হক্ব কোন সৃষ্টিরই নেই। অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক তাঁর নবীর নিকট যে ওহী প্রেরণ করেন এবং শয়তান সে সম্পর্কে যে সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, এ বিষয়ে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। যেহেতু তিনি মহাজ্ঞানী, তাই তিনি শয়তানের সকল প্রতারণাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন।

নবী রসূলগণের সংখ্যা

আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, রসূল হলেন তিনি, যাঁর নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জীবরাঈল (আঃ) প্রেরিত হন। আর নবী হলেন তিনি, যাঁকে এলহামের মাধ্যমে অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে নবুওয়্যত প্রদান সম্পর্কে অবগত করা হয়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, রসূল হলেন তিনি, যাঁকে নতুন শরীয়ত দিয়ে প্রেরণ করা হয়। আর নবী হলেন তিনি, যাঁকে নতুন শরীয়ত দেয়া হয় না; বরং পূর্ববর্তী শরীয়তের প্রচার-প্রসার এবং সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হয়। প্রত্যেক রসূলই নবী হন, কিন্তু প্রত্যেক নবীর রসূল হওয়া জরুরী নয়।

হযরত আবুজর (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সর্ব প্রথম নবী কে হয়েছেন? তিনি এরশাদ করেন, হযরত আদম (আঃ)।

আমি আরজ করলামঃ আদম (আঃ) কি নবী ছিলেন?

তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, এমন নবী ছিলেন, যাঁর সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।

আমি আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! রসূল কতজন হয়েছেন?

তিনি এরশাদ করলেনঃ একটি বড় দল, তিনশ দশের উপর আরো কিছু।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবুজর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আরজ করেছি, ইয়া রসূলাল্লাহ! আম্বিয়ায় কেরামের সংখ্যা কত?

তিনি এরশাদ করলেনঃ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, এক বিরাট দল, তাঁদের মধ্যে তিনশ পনের জন রসূল হয়েছেন (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে এবনে রাহবিয়া, এবনে হাব্বান, হাকেম)।[১]

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

"আর তা এজন্যে যে, শয়তান যা মিশ্রিত করে তা দ্বারা তিনি সে সব লোকদের পরীক্ষা করতে চান, যাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি এবং যারা পাষাণ-হৃদয়"।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাকের নবী যখন কোন আয়াত পাঠ করেন, তখন শয়তান সে সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা করে। আল্লাহ পাক সে সন্দেহের মূলোৎপাটন করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, এমন করার কারণ কি? অর্থাৎ শয়তানকে এ সুযোগ কেন দেয়া হয়? আলোচ্য আয়াতে তারই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এর অন্তর্নিহিত নিগুঢ় রহস্য সম্পর্কে এক আল্লাহ পাকই সম্পূর্ণ অবগত। মূলতঃ তিনি বিশ্ববাসীকে পরীক্ষা করতে চান, কার অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত? কে-ভিত্তিহীন সন্দেহের অন্ধকারে ঘুরপাক খায়? আর কে সুস্থ নীরব মন নিয়ে আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করে? এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। যারা সন্দেহবাদী, অবিশ্বাস যাদের মজ্জাগত, পথভ্রষ্ট হওয়াই তাদের অদৃষ্ট। আর যারা পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করে এবং মানে, আল্লাহ পাক তাদেরকে সরল সঠিক পথের হেদায়েত করেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৩৩

وَإِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ

(আর নিশ্চয় জালেমরা বিরোধিতায় অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে) অর্থাৎ এ কাফের মুশরেক এবং মুনাফেকরা ইসলামের বিরোধিতায় এত দূরে সরে পড়েছে, যেখান থেকে তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তারা সন্দেহের চোরাবালিতে আটকে থাকে, এরপর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এরপর চরম শত্রুতায় নিমজ্জিত হয়, তখন সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তারা চিরতরে হারিয়ে ফেলে।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

আর তা এজন্য যে, যাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে এ হল আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে ধ্রুব সত্য। ফলে তারা তার উপর বিশ্বাস করে এবং তাঁর সম্মুখে তাদের মন নরম হয়ে আসে। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদেরকেই সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, যারা ঈমান আনে।

শয়তানকে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ প্রদানের আরও একটি কারণ হল এই যে, যাদেরকে আল্লাহ পাক বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, তারা যেন আল্লাহ পাকের কালামের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের বিশ্বাস যেন সুদৃঢ় হয় যে, এই মহান বাণী আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ এবং তাদের অন্তর যেন আল্লাহ পাকের দিকে বিনয়াবনত হয়।

তফসীরকারগণ বলেছেন, أُوْتُوا الْعِلْمَ বাক্য দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের বিধান সম্পর্কে অবগত।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যটি দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাক শয়তানের সৃষ্ট ওয়াস ওয়াসা এবং সন্দেহের মূলোৎপাটন করেন।

أَنَّهُ الْحَقُّ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যে আয়াত সমূহকে নাযিল করেছেন, তা ধ্রুব সত্য। অথবা এর অর্থ হল, আল্লাহ পাক শয়তানকে মানুষের অন্তরে ওয়াস ওয়াসা দেয়ার যে শক্তি দিয়েছেন তা সত্য, যেমন হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পর থেকে ইবলিসের প্রতারণর কাজ অব্যাহত রয়েছে।

فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ

অর্থাৎ যাতে করে তারা আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কোরআনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করে যে এই মহান বাণী আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে। অথবা এর অর্থ হল তারা যেন এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ একীন করে।

এ আয়াতের বর্ণনা-শৈলী দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন বিষয় সম্পর্কে জানা ঈমান আনয়নের জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং মানা জরুরী, যা শুধু আল্লাহ পাকের দানেই সম্ভব হয়।

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদেরকেই সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, যারা ঈমান আনে"।

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

অর্থাৎ ইসলামের সরল সঠিক পথ। আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হল, যখন শয়তান মানুষের মনে ওয়াস ওয়াসার মাধ্যমে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং যখন সঠিক পথ পাওয়া দুষ্কর হয়ে যায়, তখন আল্লাহ পাকই মোমেনদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। কেননা, হেদায়েত আল্লাহ পাকেরই হাতে রয়েছে। এজন্যে সূরা ফাতেহায় হেদায়েতের তৌফিকের জন্য দোয়া করার তা'লিম দেয়া হয়েছেঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও"।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ

"আর যারা অবাধ্য নাফরমান হয়েছে, তারা তাতে সন্দেহ পোষণ থেকে বিরত হবেনা, যতক্ষণ না তাদের নিকট অতর্কিতভাবে কেয়ামত উপস্থিত হবে, অথবা যেদিন নিষ্কৃতির কোন উপায়ই থাকবেনা, সেদিনের আযাব এসে পড়বে"।

অর্থাৎ যারা কাফের মুশরেক, যারা অবাধ্য নাফরমান, যারা শয়তানের প্ররোচনায় পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান হয়, তারা কেয়ামত পর্যন্ত ঐ সন্দেহের অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকবে। রসূলের আগমনে তাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন অবতরণে এবং তাঁর অগণিত মোজেযা প্রদর্শনেও তারা সঠিক পথ খুঁজে পাবেনা; বরং তারা সর্বদা সন্দেহের আবর্তেই নিপতিত থাকবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে الساعة শব্দের অর্থ মৃত্যুর সময়। আর يوم عقيم অর্থাৎ কেয়ামতের দিন।

তফসীরকার একরামা এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, يوم عقيم বলা হয় সেদিনকে, যেদিনের রাত হবেনা অর্থাৎ কেয়ামতের দিন।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে الساعة শব্দ দ্বারা কেয়ামতের দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং يوم عقيم শব্দ দ্বারা বদরের দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, সেদিন ছিল কাফেরদের চরম দুর্দিন।

আয়াতের মর্মকথা হল, কাফেররা কেয়ামত পর্যন্ত দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সর্বদা সন্দেহে পড়ে থাকবে। যখন হঠাৎ কেয়ামত আসবে তখন তাদের সন্দেহ দূর হবে। তখন পবিত্র কোরআনের মহান বাণী এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহ্বানের সত্যতা সঠিকভাবে উপলব্ধি করবে, কিন্তু সে উপলব্ধি তাদের কোন উপকারে আসবেনা।

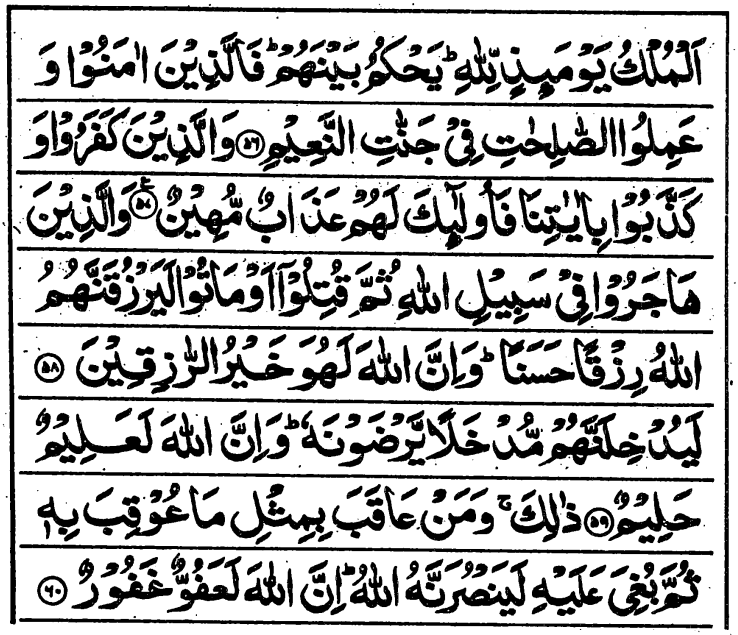
اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ
هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ
اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾
لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ
حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾ ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ
ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

তরজমা

(৫৬) সেদিন একমাত্র আল্লাহ পাকেরই রাজত্ব, তিনিই তাদের ফয়সালা করবেন। অতএব, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারা বাস করবে নেয়ামতের বাগানে।

(৫৭) আর যারা কুফরী ও নাফরমানী করেছে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাদেরই জন্যে রয়েছে অত্যন্ত লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

(৫৮) এবং যারা আল্লাহ পাকের পথে হিজরত করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বাপেক্ষা উত্তম রিয্ক দাতা।

(৫৯) তিনি তাদেরকে এমন এক স্থানে প্রেরণ করবেন, যাকে তারা অত্যন্ত পছন্দ করবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, তিনি সহনশীল।

(৬০) এটিই সত্য, যদি কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তার অনুরূপ বদলা নিয়ে নেয়, এরপর তার উপর কেউ বাড়াবাড়ি করে, তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক মার্জনা-প্রিয়, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, অতর্কিতভাবে যেদিন কেয়ামত আসবে এবং কাফেররা কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে, সেদিনই তাদের অন্তর থেকে সন্দেহ দূর হবে। অর্থাৎ আযাব না দেখা পর্যন্ত তারা সঠিক পথে আসবে না। কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ

অর্থাৎ সেদিন রাজত্ব, আধিপত্য এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। দুনিয়াতে রাজা-বাদশাহরা তাদের নিজেদের ক্ষমতার দাবীদার হয়, কিন্তু কেয়ামতের কঠিন দিনে কারো কোন ক্ষমতাই থাকবেনা, সেদিনের ব্যাপারেই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (সূরা মোমেন-১৬)

"আজ কর্তৃত্ব কার? এক আল্লাহ পাকের, যিনি পরাক্রমশালী"।

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۗ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ. (সূরা ইনতিফার)

"সেদিন একে অপরের জন্যে কিছু করার ক্ষমতা রাখবে না, সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে এক আল্লাহ পাকের"।

সেদিন সম্পর্কে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (সূরা মুতাফ্‌ফিফিন)

(সেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ বিশ্ব প্রতিপালকের সম্মুখে) সেদিন আল্লাহ পাক তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন। আর এ ফয়সালা হবে দু' দলের মধ্যে। আর ঐ দু'দলের বিবরণ পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

"অতএব, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারা বাস করবে নেয়ামতের বাগানে"।

অর্থাৎ যারা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলেছে তথা নেক আমল করেছে, তারা নেয়ামতের বাগানে বাস করবে। পক্ষান্তরে, যারা দুনিয়ার এ জীবনে কাফের হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাদের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি রয়েছে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের فالذين শব্দের ف অক্ষরটির তাৎপর্য হলো, মোমেনদের জান্নাতে প্রবেশ শুধু আল্লাহ পাকের দয়ায় হবে, তার আমলের কারণে নয়। আর কাফেরদের দোযখে প্রবেশ করানো হবে তাদের কৃতকর্মের কারণে। এজন্যে لهم عذاب বলা হয়েছে, فلهم عذاب বলা হয়নি। আর জান্নাতবাসী সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, তারা জান্নাতের বাগানে থাকবে (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে)।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তির আমল তার নাজাতের কারণ হবেনা। তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার আমলও কি নাজাতের কারণ হবেনা? তিনি এরশাদ করলেনঃ না, তবে কি আল্লাহ পাক তাঁর রহমতে এবং দানে আমাকে ঢেকে নেবেন। (বোখারী ও মুসলিম)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা সঠিক পথে চলতে থাক এবং সন্তুষ্ট হও। কেননা, কারো আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেনা। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনিও কি নিজের আমলের জন্যে জান্নাতে প্রবেশ করবেন না? তিনি এরশাদ করলেনঃ আমিও নই, তবে আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর মাগফেরাত ও রহমতে ঢেকে নেবেন।

একটি প্রশ্ন

এখানে প্রশ্ন হতে পারে কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে জান্নাতে প্রবেশ কর"।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে।

জবাব

জান্নাতের বিভিন্ন স্তর ও মর্তবা হবে, আর এ মর্তবায় পৌঁছা আমলের কারণে হবে, আমল যেমন হবে তেমন মর্তবা হবে। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করা এবং চিরদিন সেখানে বাস করা শুধু আল্লাহ পাকের দয়ায় হবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহ পাকের ক্ষমা-পরায়ণতার কারণে পুলসিরাত পার হবে, আর আল্লাহ পাকের রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলের কারণে জান্নাতে মর্তবা পাবে।[১]

আখেরাতে নাজাত শুধু আল্লাহ পাকের দানেই হবে

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আখেরাতের নাজাত লাভ হবে শুধু আল্লাহ পাকের দানে। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি এরশাদ করেছেনঃ বনী ইসরাঈলে এক ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত পরহেযগার। দিবা-রাত্রি সে এবাদত বন্দেগীতেই অতিবাহিত করতো। তার অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি হলো, আমি নেক আমল করার চেষ্টা করি, কিন্তু স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আছে, ক্ষেত-খামার আছে, আয় রোজগার করতে হয়, এতে অনেক সময় ব্যয় হয়। যদি এসব

১। তফসীরে মজাহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৩৯-৪০

কিছু না থাকতো, আর সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের স্মরণে মগ্ন থাকতে পারতাম, তবে কত ভাল হতো! তাদের শরীয়তে এ বিষয়টি জায়েয ছিল, যা আমাদের শরীয়তে জায়েয নয়। তাই সে যুগে মানুষ সব কিছু ছেড়ে পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় চলে যেত এবং দুনিয়াত্যাগী হয়ে জীবন অতিবাহিত করতো। এ ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ছেড়ে সমুদ্রের মধ্যে একটি পাহাড়ের টিলা ছিল, সেখানে চলে গেল। স্ত্রী-পুত্র-পরিবারও নেই, ব্যবসা-বাণিজ্যও নেই, দুনিয়াদারী বলতে কিছু নেই। সে আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল হয়ে গেল।

কিন্তু পানাহারের তো প্রয়োজন রয়েছে। তাই আল্লাহ পাক তার জন্যে এ ব্যবস্থা করলেন, ঐ টিলার উপরে সুস্বাদু পানির ঝর্ণা বের হয়ে আসলো, তা থেকে সুশীতল পানি বের হতে লাগলো। আর সেখানে একটি আনারের গাছ উঠলো। বড় বড় আনার ফল ধরলো। তা যেমন মিষ্ট, তেমনি ছিল অত্যন্ত ভাল জাতের। এই আবেদ, জাহেদ ব্যক্তি প্রত্যহ একটি আনার খেয়ে নিত, আর ঝর্ণা থেকে পানি পান করতো এবং দিবা রাত্রি আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকতো। সুদীর্ঘ পাঁচশ' বছর ঐ ব্যক্তি এভাবে আল্লাহ পাকের এবাদতে অতিবাহিত করলো। এরপর তার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর সময় সে আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়া করলো, হে আল্লাহ! যখন তুমি আমাকে সারা জীবন এবাদতের তৌফিক দান করেছো, তাই আমার মৃত্যুও যেন সেজদা অবস্থায় হয়, এর তৌফিকও দিও, আর আমার দেহকে কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ কর, যাতে করে আমি কেয়ামত পর্যন্ত সেজদারত বন্দা হিসাবে বিবেচিত হই, যেন আমি কেয়ামত পর্যন্ত নামাযেই রত রয়েছি। আল্লাহ পাকের দরবারে তার এ দোয়াও কবুল হল, সেজদারত অবস্থায় তার ইন্তেকাল হল।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আজ পর্যন্ত তার দেহ ঐ পাহাড়ের চূড়ায় সংরক্ষিত রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ পাক তার চারিপার্শ্বে ঘন বন তৈরী করে দিয়েছেন, যে কারণে লোকেরা সেখানে যেতে পারেনা। কেননা, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সেখানে একটা ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি লোকেরা দেখতো যে এক মৃত ব্যক্তি সেজদারত রয়েছে, তবে হয়তো কেউ পূজা পাঠ শুরু করতো। এভাবে মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যাহোক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মৃত্যুর পর তাকে আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, হে বন্দা! আমি আমার দয়ায় তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলেন, জান্নাতের উচ্চতম স্থানে তার নাম লিপিবদ্ধ কর। জান্নাতে তার প্রবেশ মঞ্জুর করা হলো, দোযখ থেকে তাকে রক্ষা করা হলো।

এ ঘোষণা শ্রবণ করে ঐ ব্যক্তির মনে এ ধারণা সৃষ্টি হলো, পাঁচশ' বছরতো আমি কঠোর সাধনা করেছি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ছেড়ে দিয়েছি, তবুও আল্লাহ পাক তাঁর দয়ায় আমাকে ক্ষমা করেছেন। অন্তত আমার সান্ত্বনার জন্যে যদি এ কথাটুকু বলতেন যে, তোর নামাযের জন্যে তোকে নাজাত দিলাম, তুই পাঁচশ' বছর ধরে আমাকে সেজদা করেছিস তার পুরস্কার স্বরূপ তোকে জান্নাত দিলাম, এখনও যখন আমাকে তাঁর দয়ায় মাফ করেছেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের দরবারে আমি কিছুই করিনি। ঐ ব্যক্তির অন্তরে

এই ওয়াস ওয়াসা সৃষ্টি হয়। আর এটি ছিল কুফর ও নাফরমানীর কথা। তাই এ ব্যক্তির মনে এ ওয়াস ওয়াসা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক সবই জানতে পারলেন। কেননা, তিনি মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাই আল্লাহ পাক অনতিবিলম্বে ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলেন, জান্নাতের পরিবর্তে এ ব্যক্তিকে দোযখে নিয়ে যাও, তবে দোযখে প্রবেশ করাবে না। দোযখ থেকে এতটা দূরত্বে দাড় করাও যে, দোযখ পাঁচশ' বছরের পথ দূরে থাকুক। যখন তাকে সেখানে পৌছানো হলো তখন দোযখ থেকে তপ্ত হাওয়া আসতে থাকে। ঐ তপ্ত বায়ুর প্রথম ধাক্কায় তার দেহের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল, পিপাসায় চিৎকার করে উঠলো, মনে হয় তার শরীরের সব কিছু শুকিয়ে গেছে। দোযখে নিক্ষিপ্ত হলে কি অবস্থা হবে, তাতো পরের ব্যাপার। দোযখের একটু গরম হাওয়া তার দেহকে শুষ্ক করে দিয়েছে।

হাদীস শরীফে এসেছে তখন সে দেখলো, একটি হাত আত্মপ্রকাশ করেছে। ঐ হাতে একটি ঠান্ডা পানির পাত্র ছিল। ঐ ব্যক্তি দ্রুত পানির নিকট পৌছে গেল। কিন্তু হাতটি পেছনে সরে গেল। তখন গায়বী আওয়াজ আসলো, পানি পাওয়া যেতে পারে তবে তার মূল্য দিতে হবে, বিনামূল্যে দেয়া হবেনা। তখন সে জিজ্ঞাসা করলো, এ পানির কি মূল্য? গায়বী আওয়াজ আসলো, যে ব্যক্তি পাঁচশ' বছর এবাদত করেছে, যদি সে এবাদত পানির বদলে দিয়ে দেয় তবে এ পানির পাত্র সে পেতে পারে। এ ব্যক্তি বললো, আমার নিকট পাঁচশ' বছরের খাঁটি এবাদত রয়েছে, তাতে কোন মুনাফেকী নেই। সে এ এবাদত পেশ করলো, বিনিময়ে ঐ এক পাত্র পানি পেল। যা পান করে সে যেন তার হারানো প্রাণ ফিরে পেল।

আল্লাহ পাক তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তাকে ফিরিয়ে আন। ফেরেশতাগণ তখন তাকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পুনরায় হাযির করলো। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, হে বন্দা! তোমার পাঁচশ' বছরের এবাদতের মূল্য তুমি নিজেই ঠিক করেছ, এক পাত্র পানি যা তোমাকে দেয়া হয়েছে, তুমি পাঁচশ' বছরের এবাদত করেছ, তার বদলে তোমাকে পানি পান করানো হয়েছে, এখন তুমি হিসাব দাও পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ পাত্র পানি তুমি পান করেছ, তার বদলে কি এবাদত নিয়ে এসেছ, আর ঐ যে লক্ষ লক্ষ ফল তুমি খেয়েছো তার প্রত্যেকটি দানার বদলে কত সেজদা নিয়ে এসেছো? আর দুনিয়ার জীবনে যত নিঃশ্বাস নিয়েছো, যার দ্বারা তুমি জীবিত ছিলে প্রত্যেক নিঃশ্বাসের হিসাব দাও, আর তার বদলে কি এবাদত নিয়ে এসেছো তার হিসাব দাও। তোমার নয়ন যুগলে যে আমি আলো দিয়েছিলাম তুমি সব কিছু দেখছিলে তার বদলে তুমি কত এবাদত নিয়ে এসেছো? তোমার দেহে যে আমি কত শক্তি দিয়েছিলাম তার হিসাব দাও, আর তার বদলে কি এবাদত নিয়ে এসেছো তার হিসাব দাও। আর তোমার অন্তরে যে আমি এর সদিচ্ছা দিয়েছিলাম, দানা পানি দিয়েছিলাম, তোমার দেহে আমি প্রাণ সঞ্চার করেছিলাম, আর তোমার মনে আমি সাহস সৃষ্টি করেছিলাম, এরপর তুমি চাও যে তোমাকে এর বদলা দেয়া হোক। এসব কথা শ্রবণ করে ঐ ব্যক্তি ভীত সন্ত্রস্ত হল, বিনয়াবনত অবস্থায় আরজী পেশ করলোঃ

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় নাজাত শুধু তোমার দানেই হয়, কারো আমলে নয়, আমলের মূল্যতো এতটুকুই যে পাঁচশ' বছরের এবাদত, তার বিনিময় এক পাত্র পানির সমানও নয়"।

আর সে এবাদতও আল্লাহ পাকেরই দান। যদি আল্লাহ পাক তৌফিক না দেন তবে মানুষ এবাদতও করতে পারেনা। যদি দেহ মন সবই ঠিক থাকে কিন্তু মনে এবাদতের ইচ্ছা না হয়, আর ইচ্ছা হলেই কি হবে, যদি সাহস না হয় তবুও এবাদত করা সম্ভব হয়না, গাফলত ও অলসতা বেড়ে যায়, এবাদত করা সম্ভব হয়না। মূলতঃ আল্লাহ পাকই এবাদত করার তৌফিক দান করেন, তিনিই সাহস দেন, তখন আমরা এবাদত করতে পারি। যদি তিনি তৌফিক না দেন তবে আমরা সেজদা করতে পারিনা। অতএব, সবই আল্লাহ পাকের দান, সবই আল্লাহ পাকের রহমত।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

"আর যারা আল্লাহ পাকের পথে হিজরত করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বাপেক্ষা উত্তম রিয্কদাতা"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ নেককার মোমেনদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে যারা ইসলামের জন্যে, শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বাড়ী-ঘর, ভিটে-মাটি, আত্মীয়-স্বজন, দেশ-খেশ সব কিছু ছেড়ে হিজরত করেছেন এবং যারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছেন, এমন মুহাজের এবং মুজাহেদদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে মুহাজেরগণকে জেহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁদেরকে সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য বাড়ি-ঘর ছেড়েছে, হিজরত করেছে তাদের এ অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। তারা কাফেরদের সাথে জেহাদ করে শাহাদাত বরণ করুক অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হোক সকল অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে রয়েছে তাদের জন্যে অশেষ নেয়ামত। তিনি তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করবেন তথা জান্নাতের রিয্ক দান করবেন। আর তাদেরকে এমন স্থানে পৌঁছে দেবেন, যা তারা অত্যন্ত বেশী পছন্দ করে কেননা, বেহেশতে রয়েছে অনন্ত অসীম নেয়ামত আর সে নেয়ামত হবে চিরস্থায়ী, যার কোন দৃষ্টান্ত কোথাও নেই।

وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি তাঁর মুহাজের বন্দাদের এবং তাদের দুশমনদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

حَلِيْمٌ

মুহাজের ও মুজাহেদীনের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তিনি অবশ্যই তা ক্ষমা করবেন– একথা সত্য।

ذٰلِكَ

যদি কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তার অনুরূপ বদলা নিয়ে নেয়, এরপর তার উপর কেউ বাড়াবাড়ি করে তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক মার্জনা প্রিয়, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি নির্যাতিত-উৎপীড়িত হওয়ার কারণে জালেম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, এরপরও যদি জালেম পুনরায় জুলুম করে, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক মজলুমকে সাহায্য করেন। আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে মজলুম ধন্য হয়। এজন্যে হাদীস শরীফে মজলুমের বদ দোয়াকে ভয় করার তাগিদ রয়েছে।

اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب

অর্থাৎ তোমরা মজলুমের বদ দোয়াকে ভয় কর, কেননা তার মধ্যে এবং আল্লাহ পাকের মধ্যে কোন পর্দা নেই।

মজলুমের পক্ষে তার প্রতি যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে, সে পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি থাকলেও তা উন্নত আদর্শ নয়, বরং প্রতিশোধ গ্রহণ হলো কু-প্রবৃত্তির তাড়না। আর ক্ষমা করা বিশেষ গুণ। এজন্যে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ

"আর যে সবর করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা অত্যন্ত সৎ সাহসের ব্যাপার"।

আলোচ্য আয়াতে প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক মার্জনা-প্রিয়, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল"।

আল্লাহ পাকের শাস্তি দেয়ার সম্পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। অতএব, প্রকৃত মোমেন বন্দারও এ আদর্শই গ্রহণ করা উচিত।[১]

আল্লাহ বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত হাসান বসরী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ

مَنْ عَاقَبَ

অর্থাৎ যে মুশরেকদের সাথে লড়াই করে যেমন মুশরেক তার সাথে লড়াই করে। এরপর মুশরেক তার প্রতি অত্যন্ত বেশী বাড়াবাড়ি করে। যেমন তাকে দেশ থেকে হিজরত করতে বাধ্য করে।

لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৪১

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

আল্লাহ পাক শাস্তি দেয়ার সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

অতএব, মুসলমানদের মধ্যে যারা মজলুম তারা ইচ্ছা করলে জালেমের জুলুমের সম পরিমাণ প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু ক্ষমা করাই হলো উত্তম আদর্শ। আল্লাহ পাক বন্দাকে শাস্তি দিতে পারেন যে কোনভাবে, কিন্তু তবু তিনি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

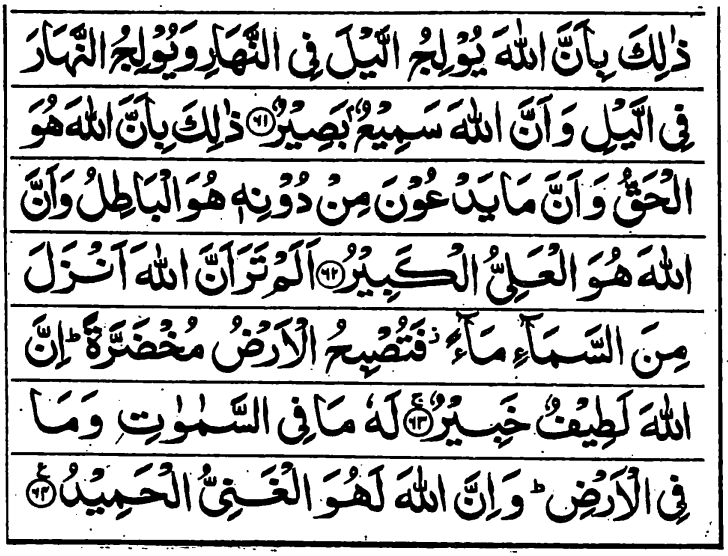
ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ
فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ
الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ
اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾

তরজমা

(৬১) এর কারণ এই যে, আল্লাহ পাক রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে থাকেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।

(৬২) আর তা এজন্যেও যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক, তিনিই ধ্রুব সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে তা মিথ্যা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক, তিনিই সর্বোচ্চ, তিনি মহান।

(৬৩) তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ পাকই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে ধরণী। নিশ্চয় আল্লাহ পাক গোপন কৌশল সম্পর্কে অবগত, তিনি সব কিছুর খবর রাখেন।

(৬৪) আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর, আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক অভাবমুক্ত, স্বয়ং প্রশংসিত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের দয়া মায়া এবং ক্ষমা পরায়ণতার কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার কথা এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বত্র তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। মহান আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত অনন্ত অসীম, অকল্পনীয়। তিনি দিনকে রাত এবং রাতকে দিনে পরিবর্তন করেন। তাঁরই ইচ্ছা এবং মর্জিতে কখনও দিন বড় হয় কখনও রাত বড় হয়।

অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই ক্ষমতার মালিক, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা তা ছিনিয়ে লও, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা তাকে অপমানিত কর, তোমার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সর্বোপরি সর্বশক্তিমান"।

এমনি আরো বহু আয়াতে আল্লাহ পাকের অসীম কুদরত হেকমতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনি অবস্থায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক কি জালেম মজলুমের দিন রাত পরিবর্তন করতে পারেন না? মজলুম যত দুর্বলই হোক আল্লাহ পাক কি তাকে সবল করতে পারেন না? তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনি অবশ্যই তা পারেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে মজলুম মুহাজেরদের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত করে এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে মজলুম মুসলমানদের বিপদের অমানিশা কেটে যাবে, জালেমের কবল থেকে তাঁরা উদ্ধার পাবেন, কুফর ও নাফরমানীর ঘন অন্ধকার কেটে যাবে, আসবে সুদিনের সুবেহে সাদেক, আর তা হবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতে।

وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ.

আর তা এজন্যেই যে আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, তিনি সবকিছু শ্রবণ করেন, সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন, পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নেই।

অথবা এর অর্থ হলো, তিনি মোমেনদের দোয়া শ্রবণ করেন এবং কবুল করেন। জালেম এবং মজলুম উভয়ের আমল প্রত্যক্ষ করেন এবং প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী বদলা দেয়া হবে।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

"আর তা এজন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক, তিনিই ধ্রুব সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে তাতো মিথ্যা। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক, তিনিই সর্বোচ্চ, তিনি মহান"।

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মোমেনদের জন্যে সাহায্য যে অবশ্যই আসবে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা, আল্লাহ পাকই পরম সত্য, তিনি ধ্রুব সত্য, তিনি চির সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেছেন সবকিছু। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, আর সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে। কিন্তু মহান স্রষ্টার লয় নেই। কাফেররা তাঁকে বাদ দিয়ে যা কিছুর পূজা-অর্চনা করে সবই মিথ্যা, সবই বাতিল। আর তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আর সকলেই অসহায় অক্ষম। তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই। অতএব, শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা উচিত।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ

"তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ পাকই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। ফলে সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে ধরণী। নিশ্চয় আল্লাহ পাক গোপন কৌশল সম্পর্কে অবগত, তিনি সব কিছুর খবর রাখেন"।

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এ আয়াতেও আল্লাহ পাকের অসীম কুদরত হেকমতের বর্ণনা রয়েছে। এর পাশাপাশি সমগ্র সৃষ্টি জগৎ যে তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন, তার কয়েকটি দলিল-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَ

তোমরা কি লক্ষ্য করনা? ধরণীর বুকে যখন বৃষ্টির ফোটা পড়ে, তখন মৃত শুস্ক ধরণী জীবন-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, সর্বত্র সজীবতা লক্ষ্য করা যায়। ঠিক তেমনি আল্লাহ পাক যখন শেরক ও কুফর-ক্লিষ্ট অন্তরের বিরাণ ভূমিতে ঈমানের বীজ বপন করবেন এবং ইসলামের তরুলতা উৎপাদন করবেন, তখন তার অবস্থা হবে সম্পূর্ণ নতুন। আল্লাহ পাকের কুদরতের এ মহিমা নিঃসন্দেহে বিশ্বের বিস্ময়। খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ), হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের পূর্বে তথা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবেই ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সেই জীবনের কোন প্রতিচ্ছবি বিশ্ববাসীর সম্মুখে নেই। অথচ যখনই তারা ইসলাম গ্রহণ করলেন, তথা যখনই সত্যিকার জীবনের সন্ধান পেলেন, তখনই তাঁরা বিশ্ব মানবের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করলেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক সকল রহস্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। বিশ্ব সৃষ্টির প্রতিটি অনু পরমাণু সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল। তিনি করুণাময়, তাঁর করুণা লাভে ধন্য হয় ছোট-বড় সকল সৃষ্টি এবং তিনি তাঁর প্রতিটি বন্দার প্রকাশ্য ও গোপন সব বিষয়ে খবর

রাখেন। কার মধ্যে কি যোগ্যতা রয়েছে এবং কার দ্বারা কি কাজ হবে এসব বিষয় তিনি অবগত। শুধু তাই নয় কার কি প্রয়োজন সে সম্পর্কেও তিনি সবিশেষ অবগত।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর, অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক তিনিই। সমগ্র বিশ্ব জগতে তাঁরই একচ্ছত্র ক্ষমতা ও আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। যখন তাঁর যা ইচ্ছা তাই তিনি করেন, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জিকে বাধা দিতে পারে এমন কেউ নেই। কারও নিকট তাঁর কোন ঠেকা নেই।

وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক অভাবমুক্ত, স্বয়ং প্রশংসিত। কোন সৃষ্টিরই তাঁর প্রয়োজন নেই। অথচ সকলের প্রয়োজন তাঁর দয়ার। সকলেই তাঁর দয়ার ভিখারী। আর সকলেই তাঁর দয়ায় ধন্য। যে তাঁর দয়া পায় না, সে-ই হয় বিপন্ন। তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমতপূর্ণ, যুক্তি-সম্পন্ন। তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত। তিনি স্বয়ং প্রশংসিত। কারো প্রশংসারও তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর গুণের যেমন শেষ নেই, ঠিক তেমনি তাঁর প্রশংসারও শেষ নেই এবং দয়া মায়ারও কোন সীমা নেই। তিনি অনন্ত অসীম দয়াময়, তিনি গুণময়।

তরজমা

(৬৫) তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ পাক পৃথিবীর সব কিছুকেই তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং সমুদ্র বক্ষে তাঁর হুকুমে যে নৌকা চলে সেগুলোকেও তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। আর তিনিই আসমানকে স্থির রাখেন, যাতে করে পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ব্যতীত পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, পরম করুণাময়।

(৬৬) এবং তিনিই তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, এরপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু-মুখে পতিত করবেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত বড় অকৃতজ্ঞ।

(৬৭) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যেই ঠিক করে দিয়েছি তার এবাদতের পদ্ধতি, তারা সে অনুসারেই বন্দেগী করে। অতএব, (হে রসূল!) তারা যেন আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে বিতর্ক না করে। আর তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন। নিশ্চয় আপনি সরল সঠিক পথে রয়েছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্বের আয়াত সমূহের ন্যায় এ আয়াতেও আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত হেকমতের নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। যে তৌহীদকে অস্বীকার করে, তাকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ পাক পৃথিবীর সব কিছুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। বিশাল-বিস্তৃত পৃথিবীতে তোমরা যা ইচ্ছা তা করার যে অধিকার পেয়েছ তা কার দান? এবং নিখিল বিশ্বের সব কিছুর দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে সুবর্ণ সুযোগ তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে তা কি তোমরা লক্ষ্য করনি? যিনি বিশাল-বিস্তৃত পৃথিবীকে তোমাদের উপকারার্থে নিয়োজিত করে রেখেছেন, তিনিই মহান স্রষ্টা, পালনকর্তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। পৃথিবীর শুধু স্থলভাগেই নয়; বরং সামুদ্রিক ভাগেও আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের আদেশক্রমেই সমুদ্র বক্ষে তোমাদের জাহাজ সমূহ পরিচালিত হয়ে থাকে, শুধু সামুদ্রিক ভাগে এবং স্থলেই নয়; বরং অন্তরীক্ষেও আল্লাহ পাক তোমাদের অনেক প্রয়োজনের আয়োজন রেখেছেন।

وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

"আর তিনিই আসমানকে স্থির রাখেন, যাতে করে পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ব্যতীত পতিত না হয়"।

আর অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ (সূরা রা'দ)

"যিনি আসমানকে কোন প্রকার খুঁটি ব্যতীত উপরে তুলে রেখেছেন"।

এটি তাঁর অনন্ত অসীম কুদরতের এক বিস্ময়কর নমুনা এবং তৌহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মানব জাতির প্রতি বিশেষ দান। যমীনের উপর আসমানকে স্থির করে রেখেছেন, যাতে করে যমীনের উপর পতিত না হয়।

আল্লাম বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, যমীনের উপর আসমানকে পতিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে কেয়ামতের দিন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যমীনের উপর আসমান পতিত হবে, এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আলোচ্য আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত আসমান যমীনের উপর পতিত হতে পারেনা। এসব বিস্ময়কর কুদরত হেকমত দেখে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা এসব কিছুই আল্লাহ পাকের অন্তহীন কুদরত হেকমতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর নিঃসন্দেহে মানব জাতির প্রতি এসবই আল্লাহ পাকের দান।

স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, পরম করুণাময়"।

তিনি দয়া করে মানুষকে নিখিল বিশ্বে উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁর দানের দুয়ার উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। বিপদাপদের পথ রুদ্ধ করেছেন। মানুষের কর্তব্য হলো, আল্লাহ পাকের এসব বিস্ময়কর সৃষ্টি-রহস্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর অনন্ত অসীম দানের জন্যে তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। বারে বারে এসব বিস্ময়কর সৃষ্টির উল্লেখ করে পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে যে আহ্বান জানিয়েছে তা হলো, সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর মা'রেফাত হাসিল কর, তাঁর প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

"এবং তিনিই তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, এরপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করবেন"।

আল্লাহ পাকই স্রষ্টা, পালনকর্তা, রিয্কদাতা, ভাগ্য-নিয়ন্তা, তিনিই সর্বেসর্বা। মানুষের অসার দেহে তিনিই জীবন দান করেন। আর নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর মানুষকে মৃত্যু-মুখে পতিত করেন, তার জীবনের অবসান ঘটান। জীবন ও মৃত্যু প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, তিনিই সর্বেসর্বা। ইতোপূর্বে মানুষের অস্তিত্ব ছিলনা, আল্লাহ পাকই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। ঠিক তেমনি মৃত জাতির জীবনে আল্লাহ পাক ঈমান পরিবেশন করে তাকেও জীবিত করে তুলতে পারেন। আল্লাহ পাকের অন্তহীন কুদরত হেকমত দেখে মানুষের জ্ঞান-চক্ষু উম্মীলিত হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষ আত্মবিস্মৃত, তাই সে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞ হয়না। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ·

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

"নিশ্চয় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ"।

কেননা, আল্লাহ পাকের অন্তহীন নেয়ামত সে ভোগ করে, কিন্তু তবু তার জন্যে শোকর-গুজার হয়না। এ জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব আল্লাহ পাকেরই দান। এরপর আসে মৃত্যু যা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর দ্বার উম্মুক্ত করে দেয়। এদিক থেকে বিচার করলে মৃত্যুও আল্লাহর নেয়ামত। কেননা মৃত্যুর মাধ্যমে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর নেয়ামত লাভের পথ উম্মুক্ত হয়। যদি তা না হতো, তবে জান্নাত কি করে লাভ করা যেত এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার কি পন্থা হতো।

অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর লালন-পালন এসব কিছুই মুশরেকরা অস্বীকার করে এবং এর চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে? তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

"নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ"।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যেই ঠিক করে দিয়েছি তার এবাদতের পদ্ধতি। তারা সে অনুসারেই বন্দেগী করে। অতএব, (হে রসূল!) তারা যেন আপনার সাথে এ বিষয়ে বিতর্ক না করে"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের উল্লেখ রয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, অতীতে আল্লাহ পাক প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এবাদত-বন্দেগীর ভিন্ন ভিন্ন রীতি-নীতি বা শরীয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা সে যুগের উপযোগী ছিল। তারা আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মোতাবেকই বন্দেগী করতো। অনুরূপভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও পরিপূর্ণ শরীয়ত ও সর্বশেষ শরীয়ত দান করেছেন, যাঁর অনুসরণ করা সর্বকালের সকল মানুষেরই কর্তব্য। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী, তাঁর পর কোন নবীর আগমন হবেনা এবং তাঁর শরীয়ত সর্বশেষ শরীয়ত, এরপর আর কোন শরীয়ত আসবে না। অতএব, এ ব্যাপারে কোন প্রকার বিতর্কের অবকাশ নেই। যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে, তারা নাজাত লাভ করবে। আর যারা তাঁর অনুসরণে অপ্রস্তুত হবে, তারা নাজাত লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ

(হে রসূল!) কেউ যেন আপনার সাথে দ্বীনি ব্যাপারে বা শরীয়তের ব্যাপারে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়) কেননা, আপনার দ্বীন আল্লাহ পাকের মনোনীত, আপনি আল্লাহ পাকের প্রেরিত, তাই তা কলহ-দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই কোরবানীর জন্তু জবেহ করার পন্থা নির্দিষ্ট ছিল। তারা সে পন্থাতেই জবেহ করতো। (হে রসূল!) লোকদের উচিত হলো, জবেহ করার ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো, আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই শরীয়তের রীতি-নীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার منسك শব্দটির তরজমা করেছেন পর্ব, বিশেষ অনুষ্ঠান।

মুজাহেদ (রঃ) ও কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো কোরবানীর স্থান, যেখানে তারা কোরবানী করতো। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, منسك শব্দটির অর্থ হলো, এবাদতের স্থান।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে বোদায়েল এবনে ওরাকা, এজিদ এবনে খুনায়েনস এবং বসর এবনে সুফিয়ান নামক ব্যক্তিদের সম্পর্কে। এ কাফেররা সাহাবায়ে কেরামের নিকট এসে বলেছিল, তোমরা যে সব জন্তুকে জবেহ করে মার তা হালাল মনে করে খাও, আর যে সব জন্তুকে আল্লাহ পাক সরাসরি মৃত্যু দেন, সেগুলোকে মৃত মনে করে তোমরা সেগুলোর গোশ্ত খাওয়া নিষিদ্ধ মনে কর, এর কারণ কি? আল্লাহ পাক তাদের এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের সাথে কোন ব্যাপারে বিতর্কে মশগুল না হয়ে শুধু ইসলাম গ্রহণের জন্যে তাদেরকে আহ্বান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এরশাদ হয়েছেঃ

وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ

(হে রসূল!) তাদেরকে আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন, যেন তারা তৌহীদের মূলনীতিতে বিশ্বাস করে কেননা, সমস্ত নবী রসূলগণ তাঁদের নিজ নিজ যুগে মানুষকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। এ মূলনীতিতে কোন মত পার্থক্য নেই। অতএব, এ সম্পর্কে বিতর্ক সম্পূর্ণ অশোভন। অবশেষে এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

"(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনিই সরল সঠিক পথের হেদায়েতের উপর রয়েছেন"।

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ

পৃথিবীর কোন মানুষকে যদি হেদায়েত লাভ করতে হয় তবে অবশ্যই আপনার অনুসারী হতে হবে। দুনিয়াতে শান্তি লাভ করার, জীবন-সাধনাকে সার্থক করার এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে নাজাত পাওয়ার একমাত্র পথ হলো প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ। কেননা, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ "(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনিই সঠিক পথে রয়েছেন"।

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا
لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ
يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكُمُ ۗ
النَّارُ ۖ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

তরজমা

(৬৮) আর (হে রসূল!) যদি তারা আপনার সাথে কলহ করতে চায় তবে আপনি বলে দিন, তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সে সম্পর্কে বিচার মীমাংসা করে দেবেন।

(৭০) তুমি কি জাননা? আসমান যমীনে যা কিছু আছে, আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। এ সবই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, নিশ্চয় তা আল্লাহ পাকের নিকট অতি সহজ।

(৭১) আর তারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে, যার সম্পর্কে তিনি কোন দলিল পেশ করেননি, আর সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানও নেই, আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(৭২) এবং তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের চেহারায় অসন্তোষের লক্ষণ দেখতে পাবেন। যারা তাদের নিকট আমার আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করে, কাফেররা তাদের প্রতি আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। (হে রসূল!) আপনি বলুন, তবে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে অধিকতর মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? তা হলো আগুন। কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আশ্রয়-স্থল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন এবং কাফেররা যদি আপনার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত চায় তবে আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না, কেননা আপনি সঠিক পথে রয়েছেন। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ جَادَلُوْكَ

অর্থাৎ যদি কাফেররা গায়ে পড়ে আপনার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ পাক তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। তোমাদের এ অন্যায় আচরণের এবং এ কলহ-দ্বন্দ্বের শাস্তি তিনি তোমাদেরকে দেবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। কাফেরদের যাবতীয় অন্যায়-অনাচার আল্লাহ পাকের নজরে রয়েছে, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সে সম্পর্কে বিচার মীমাংসা করে দেবেন"।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন, অর্থাৎ কেয়ামতের দিনই আল্লাহ পাক মোমেন ও কাফেরের মধ্যে ফয়সালা করবেন। দুনিয়াতে কে হক্ব পন্থী ছিল, আর কে বাতিল পন্থী তার চূড়ান্ত ফয়সালা সেদিনই হবে। মোমেনগণকে সওয়াব দেয়া হবে, আর কাফেরদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

"তুমি কি জাননা? আসমান যমীনে যা কিছু আছে, আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। এসবই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় তা আল্লাহ পাকের নিকট অতি সহজ"।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন মোমেন ও কাফেরের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। প্রশ্ন হলো, কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন? এ প্রশ্নের জবাবে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ পাকের এলমের ভিত্তিতে ফয়সালা করা হবে। কেননা, সৃষ্টি জগতের সব কিছুর ব্যাপারেই আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। শুধু মানুষ সম্পর্কেই নয়; বরং আসমান যমীনে যা কিছু আছে সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। আর সব কিছু লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ আছে, আর আল্লাহ পাকের জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই নেই।

إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

"নিশ্চয় তা আল্লাহ পাকের নিকট অতি সহজ"।

অর্থাৎ মানুষের আমল তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা দেয়া কোন কঠিন কাজই নয়। কেননা, আল্লাহ পাকের এলম সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সব কিছুই লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ

"আর তারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে, যার সম্পর্কে তিনি কোন দলিল পেশ করেননি, আর যে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানও নেই"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ পেশ করার পরও এ মুশরেকরা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে অন্য কিছুর উপাসনা করে থাকে, অথচ এর সত্যতার কোন দলিল তাদের নিকট নেই, আর এ সম্পর্কে কোন জ্ঞানও তাদের নেই।

বলাবাহুল্য, আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা অমার্জনীয় অপরাধ, এতদসত্ত্বেও কাফেররা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে, প্রকৃতপক্ষে তারা হলো জালেম।

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ

(আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই) যে তাদের আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ

"এবং তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের চেহারায় অসন্তোষের লক্ষণ দেখতে পাবেন"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হে নবী! কাফের মুশরেকদের সকল অন্যায় আচরণই আল্লাহ পাকের নজরে

রয়েছে। তৌহীদ সম্পর্কীয় বর্ণনা তাদের নিকট অসহনীয়। তারা যখন কোরআনে করীমের আয়াত শ্রবণ করে, তখন ক্রোধে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়, অসন্তোষ তথা ক্রোধের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় তাদের চেহারায়। এমনকি, তাদের অবস্থা এই হয়, যেন তারা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতকারী মোমেনদের উপর হামলায় উদ্যত।

قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, তবে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে অধিকতর মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? তা হলো আগুন। কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আশ্রয়-স্থল"।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন, এখন তো তোমরা কোরআনে করীমের আয়াত সহ্য করতে পারছো না; তবে কি করে দোযখের কঠিন শাস্তি সহ্য করবে? বস্তুতঃ আজ যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআনকে সহ্য করতে পারেনা, তবে কি তারা দোযখের আযাব সইতে পারবে? উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি তোমরা গ্রহণ করবে, তা তোমরাই বিবেচনা করে দেখ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ
اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ
مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿۷۳﴾ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ
حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۷۴﴾ اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ
الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۷۵﴾
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ ﴿۷۶﴾

তরজমা

(৭৩) হে মানব জাতি! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, তোমরা মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। আল্লাহ পাকের পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সকলে একত্রিত হয়েও একটি মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারবে না। আর যদি মাছি তাদের কোন কিছু কেড়ে নেয়, তবে তারা তার নিকট থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবেনা। প্রার্থী এবং প্রার্থিত উভয়েই দুর্বল।

(৭৪) তারা আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত শক্তিশালী, তিনি পরাক্রমশালী।

(৭৫) আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এবং মানুষের মধ্য থেকে তাঁর বাণীবাহক মনোনীত করেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু শ্রবণ করেন এবং সব কিছু দেখে থাকেন।

(৭৬) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে, তিনি সবই জানেন। আর আল্লাহ পাকের নিকটই সকল কাজের শেষ গতি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরেকদের মূর্খতা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা কোন দলিল-প্রমাণ ব্যতীত আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে এবং এমন কিছুর নিকট মাথা নত করে, যা নিতান্ত তুচ্ছ। আর আলোচ্য আয়াতে শেরকের জঘন্যতা এবং অযৌক্তিকতা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে মুশরেকদের আহম্মকী এবং নির্বুদ্ধিতা একটি উপমা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এ উপমার মাধ্যমে শেরক যে অন্তঃসার-শূণ্য এবং মারাত্মক তা উপলব্ধি করা সহজ হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ

"হে মানব জাতি! একটি উপমা বর্ণিত হচ্ছে অতএব, তোমরা তা অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর"।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ

"আল্লাহ পাকের পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকে, তারা সকলে একত্রিত হয়েও একটি মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারবে না"।

বলাবাহুল্য, মাছি একটি অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র প্রাণী। তার কোন গুরুত্ব যেমন নেই, তেমনি কোন শক্তিও নেই। কিন্তু এ মুশরেকরা যে সব দেব-দেবীর পূজা করে, নিজেদের হাতে বানানো মূর্তির পূজা করে এবং সেগুলোর সম্মুখে মাথা নত করে, এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী না করে এ অসহায়, নিরুপায় মূর্তিগুলোর সম্মুখে মাথা নত করে। অথচ এ মূর্তিগুলো একটি মাছির মত ক্ষুদ্র তুচ্ছ প্রাণীও সৃষ্টি করতে পারেনা। এমনকি যদি সমস্ত মূর্তিগুলো একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে, তবু একটি মাছির মত তুচ্ছ প্রাণী সৃষ্টি করতে তারা সক্ষম নয়। শুধু তাই নয়; বরং মাছি যদি তাদের কথিত উপাস্যদের কোন কিছু নিয়ে যায়, তবে তা উদ্ধার করার শক্তিও তাদের নেই। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ

"আর যদি মাছি তাদের কোন কিছু কেড়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতেও পারবে না"।

অর্থাৎ মুশরেকদের এ উপাস্যরা এত অসহায় যে, তাদের সম্মুখে ভক্ত পূজারীরা যে সব খাবার রাখে, মাছি যদি সে খাবার কেড়ে নেয়, তবে মাছিকে বাধা দেয়ার শক্তি তাদের নেই এবং মাছি থেকে সে খাবার উদ্ধার করার শক্তিও তাদের নেই। অতএব, এ উপাস্যরা তুচ্ছ মাছি থেকেও দুর্বলতর। এমনি অবস্থায় নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা, রিয্কদাতা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের বন্দেগী না করে ঐ অসহায় তুচ্ছ হাতে বানানো বস্তুগুলোর উপাসনা করা কত বড় নির্বুদ্ধিতা তা সহজেই অনুমেয়। অতএব, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করার কোন যুক্তি নেই আর তা শুধু অযৌক্তিক, অসুন্দরই নয়; বরং মারাত্মক অপরাধ, যার শাস্তি হলো চিরস্থায়ী দোযখ।

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ

"প্রার্থী এবং প্রার্থিত উভয়েই দুর্বল"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের طالب শব্দ দ্বারা মাছিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, মাছি এ খাবারটির প্রার্থী যা মূর্তির সম্মুখে রয়েছে। আর المطلوب। হলো মূর্তি, যার কাছ থেকে মাছি খাবার ছিনিয়ে নেয়। মূর্তিগুলো মাছি থেকেও অসহায় ও দুর্বলতর। কেননা, মাছি যখন মূর্তির সম্মুখ থেকে খাবার ছিনিয়ে নেয় তখন মাছিকে সে বাধা দিতে পারেনা এমনকি, মাছি থেকে ঐ খাবার উদ্ধারও করতে পারেনা।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, طالب শব্দ দ্বারা মূর্তি পূজারীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর المطلوب। দ্বারা মূর্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ অসহায় অক্ষম মূর্তিগুলোকে যারা মা'বুদ বা উপাস্য মনে করে, তারা আরও দুর্বল, আরও অসহায়।[১]

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیٌّ عَزِیْزٌ

"তারা আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত শক্তিশালী, তিনি পরাক্রমশালী"।

মহান মহিমময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের মহিমা এবং মর্যাদা যথাযোগ্যভাবে বুঝতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। যদি সর্বগুণাকর বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য মর্যাদা তারা বুঝতো, তবে স্বহস্তে তৈরী করা মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করতো না। এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতো, তাঁর বন্দেগী করতো এবং তাঁর প্রতি অনুগত ও কৃতজ্ঞ থাকতো। তিনি মহা পরাক্রমশালী, তিনি সর্বশক্তিমান। সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। এ হতভাগা নির্বোধরা এ সত্য উপলব্ধি করেনি, তাই তারা বদ নসীব।

اَللّٰهُ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৪৯

"আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এবং মানুষদের মধ্য থেকে তাঁর বাণী বাহক মনোনীত করেন"।

যেমন হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর দ্বারা নবী রসূলগণের নিকট আল্লাহ পাক তাঁর বাণী প্রেরণ করেন এবং কোন ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহ পাক মানুষের রিয্ক পৌছান এবং কোন কোন ফেরেশতাকে মানুষের রূহ কবজ করার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত জীব্রাঈল (আঃ), মিকাঈল (আঃ), ইসরাফিল (আঃ) এবং আজরাঈল (আঃ) প্রমুখ ফেরেশতাগণকে আল্লাহ পাক বিশেষ বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন। আর মানুষের মধ্যে যাদেরকে নবী বা রসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন, তাঁদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়। ফেরেশতাগণের মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর মহান বাণী নবী রসূলগণের নিকট প্রেরণ করেন। সর্ব প্রথম রসূল ছিলেন হযরত আদম (আঃ)। আর সর্বশেষ রসূল হলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কাফের মুশরেকরা যখন বলেছিল,

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

"আমাদের মধ্য হতে তাঁর প্রতিই কি কোরআন নাযিল করা হলো"?

অর্থাৎ আমাদের মাঝে অনেক নেতৃত্বস্থানীয় মাননীয় ব্যক্তি রয়েছে, অথচ তাদেরকে বাদ দিয়ে এর প্রতিই কি কোরআন নাযিল হলো? তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ

অর্থাৎ নবুওয়্যত রেসালতের মহান মর্যাদায় কোন ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করার একমাত্র অধিকার আল্লাহ পাকেরই। তিনিই জানেন তাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত। তিনিই তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। যাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন, তাঁকেই নবুওয়্যত ও রেসালতের দায়িত্ব দেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهٗ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক কার প্রতি রেসালতের দায়িত্ব অর্পণ করবেন, তা তিনি ভালভাবেই জানেন।

বলাবাহুল্য, যেহেতু বন্দার মধ্যে এ শক্তি ও যোগ্যতা নেই যে, সে আল্লাহ পাকের পরিচয় পেতে পারে, তাঁর মা'রেফাত হাসিল করতে পারে, এজন্যে আল্লাহ পাক নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, যাতে করে তাঁরা আল্লাহ পাকের বন্দেগীর জন্যে মানুষকে আহ্বান করেন এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেন।

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু শ্রবণ করেন এবং সব কিছু দেখে থাকেন"।

তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

তিনি সমস্ত ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অতীত ও ভবিষ্যতের সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো লোকেরা যা কিছু নেক আমল করে পূর্বে প্রেরণ করেছে, আর যা কিছু পেছনে রেখে এসেছে অর্থাৎ ভাল বা মন্দ আমল যা ইতিপূর্বে প্রেরণ করেছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যে আমল ইতিপূর্বে করেছে, আর যা ভবিষ্যতে করবে, আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে অবগত।

আর কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ নবী রসূলগণের জন্মের পূর্বের অবস্থা, সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত।

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

"আর আল্লাহ পাকের নিকটই সকল কাজের শেষ গতি"।

অর্থাৎ সব বিষয় অবশেষে আল্লাহ পাকের নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে। বন্দা মাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হবে তার আমল সম্পর্কে। প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে, জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে জবাবদেহী করতে হবে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ বাক্যটি দ্বারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও আধিপত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তাঁর নাফরমানী যেন না করা হয়, এ বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

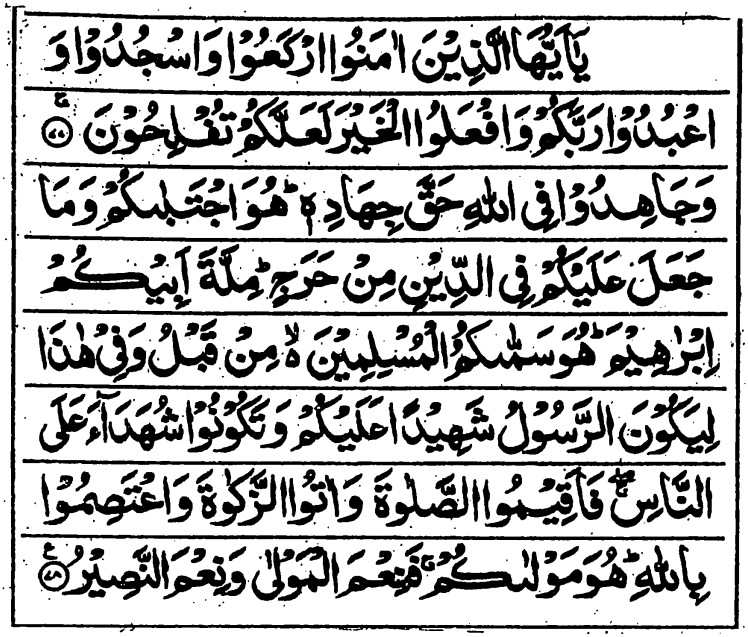
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَ
ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾
وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ۙ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا
لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى
ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟
بِٱللَّهِ ۖ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

তরজমা

(৭৭) হে মোমেনগণ! তোমরা রুকু কর, সেজদা কর আর তোমাদের প্রতিপালকের বন্দেগী কর। আর ভাল কাজ কর, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।

(৭৮) আর আল্লাহর রাহে জেহাদ কর, যেমন তাঁর জন্যে জেহাদ করা উচিত। তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন প্রকার কঠোরতা আরোপ করেননি। এটি তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের দ্বীন, তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান। আর এ কোরআনের মধ্যেও যেন রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী স্বরূপ হয়, আর তোমরা সাক্ষী স্বরূপ সমগ্র মানব জাতির জন্যে। অতএব, তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় করতে থাক। আর আল্লাহ পাককে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাক, তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তৌহীদ ও রেসালতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এ আয়াত সমূহে মুসলমানদেরকে কল্যাণকর কাজের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং দ্বীন ইসলামের উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা, এটি নাজাত লাভের এবং

চির সাফল্য অর্জনের পন্থা। যাবতীয় সৎ কাজ, সদকা-খয়রাত এবং যাবতীয় চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করা এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর আল্লাহ পাক সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে জেহাদের আদেশ দিয়েছেন। কেননা, সৎ কাজগুলোর মধ্যে জেহাদ বিশেষ এবং উত্তম কাজ। এর পাশাপাশি একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, দ্বীন ইসলাম অত্যন্ত সহজ, এর উপর আমল করা কঠিন কিছু নয়। অতএব, মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো, দিবা-রাত্রি আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকা এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমের উপর মজবুত ভাবে কায়েম থাকা, যাতে করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের সাহায্য লাভে তোমরা ধন্য হতে পার।

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا

হে মোমেনগণ! তোমরা শেরক থেকে দূরে থাক এবং শুধু এক আল্লাহ পাকের মহান দরবারে রুকু সেজদা করতে থাক। তাঁর হুজুরে চরম বিনয় প্রকাশ করতে থাক, তিনি তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, তাঁর বন্দেগীতে তোমরা মশগুল থাক। আর সৎ কাজ করতে থাক। কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ কর, শুধু এভাবেই তোমরা জীবন-সংগ্রামে সফলকাম হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, রুকু সেজদা করার তাৎপর্য হলো, নামায কায়েম করা। আর নেক কাজ করার ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা, তাদের সহায়তা করা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা এবং চরিত্র মাধুর্যের বহিঃপ্রকাশ হয় এমন ব্যবহার করা।

তফসীরকারগণ বলেছেন, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ বাক্যটির মধ্যে যাবতীয় সৎ কাজই অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সর্ব প্রকার কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ কর।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

উপরোক্ত কর্মসূচির বাস্তবায়নে আশা করা যায় যে, জীবন-সাধনায় তোমরা সফলকাম হবে, অর্থাৎ এ সমস্ত সৎ কাজ কর এবং আশা কর যে তোমরা সাফল্যমন্ডিত হবে, তবে এ নেক কাজ করলেই যে সাফল্য অর্জিত হওয়া জরুরী হবে তা নয়; বরং চির সাফল্য লাভ হবে একমাত্র আল্লাহ পাকের দয়ায়, তাঁর দানে ধন্য হলে এবং তাঁর রহমত করমে।[১]

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বনী ইসরাঈলের একজন নবীর নিকট আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে এ আদেশ প্রেরণ করেন যে, তোমার উম্মতের মধ্যে যারা আমার অনুগত তাদেরকে একথা জানিয়ে দাও যে, তারা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৫১

যেন নিজেদের আমলের উপর ভরসা না করে কেননা, কেয়ামতের দিন যাকে আমি হিসাবের জন্যে দাড় করাবো এবং যাকে আমি আযাব দেয়ার ইচ্ছা করবো, তাকে অবশ্যই আযাব দেব (অর্থাৎ তার হিসাব শক্ত হবে, তাকে ক্ষমা করা হবেনা, তাই সে আযাবে গ্রেফতার হবে)। আর তোমার উম্মতের গুনাহগারদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদেরকে ধ্বংস-প্রাপ্ত মনে না করে এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়। কেননা, আমি অনেক বড় বড় গুনাহগারকে মাফ করে দেব, আর আমি কোন পরোয়া করবো না (হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত এবং আবু নাঈম সংকলিত)।

বাজ্জার হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেকটি মানুষের তিনটি রেজিষ্ট্রার বের করা হবে। একটি রেজিষ্ট্রারে তার নেক আমলের কথা থাকবে। আর অন্য একটি রেজিষ্ট্রারে তার গুনাহ লিপিবদ্ধ থাকবে। আর তৃতীয় একটি রেজিষ্ট্রারে আল্লাহর নেয়ামত লেখা থাকবে, যা তাকে দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ পাক তাঁর সবচেয়ে ক্ষুদ্র নেয়ামতকে আদেশ দেবেন যে, তোমার বিনিময়ে এ বন্দার নেক আমল গ্রহণ কর। নেয়ামত তার বিনিময়ে সমস্ত নেক আমল নিয়ে নেবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নেক আমলের মোকাবেলায় নেয়ামতের পাল্লা ভারী হবে। তখন নেয়ামত আরজ করবে, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের শপথ! আমি আমার মোকাবেলায় এ ব্যক্তির সমস্ত নেকী গ্রহণ করেছি, তার সকল নেক আমল শেষ হয়ে গেছে, এখন শুধু গুনাহ রয়ে গেছে, তোমার একটি নেয়ামতের মোকাবেলায় তার সমস্ত নেক আমল খতম হয়েছে। এ অবস্থায় যদি আল্লাহ পাক তার প্রতি দয়া করতে মর্জি করেন তবে এরশাদ করবেন, "হে আমার বন্দা! আমি তোর জন্যে তোর নেকীগুলো কয়েক গুণ করে দিয়েছি, আর তোর গুনাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করিনি, আর তোর প্রতি আমার নেয়ামতগুলো বখশিস করে দিয়েছি"।

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

"আর আল্লাহর রাহে জেহাদ কর, যেমন তাঁর জন্যে জেহাদ করা উচিত"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা সাধনায় রত থাক, তথা দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদ কর। আল্লাহর দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদের হক্ব আদায় কর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হলো, তোমার সমুদয় শক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় কর। আর আল্লাহর রাহে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করোনা। এটিই জেহাদের হক্ব।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ কর, আর তাঁর এবাদত কর যেমন তোমাদের উপর এবাদতের হক্ব রয়েছে।

অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেনঃ জেহাদের হক্ব হলো এই, জেহাদকারীর নিয়ত সঠিক হতে হবে অর্থাৎ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে জেহাদ করবে। আর জেহাদের হক্ব হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর নাফরমানী না করা।

আবদুল্লাহ এবনে মোবারক বলেছেন, এর অর্থ হলো নিজের প্রবৃত্তিকে বশে আনা, এটিই জেহাদে আকবর। আর এর মাধ্যমেই জেহাদের হক্ব আদায় হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আত্ম সংশোধনের সচেষ্ট হওয়া এবং আত্মসংস্কার করার নির্দেশই রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করে এরশাদ করেছেন, "আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদে ফিরে এসেছি"।

বায়হাকী তাঁর রচিত "আয জোহদ" নামক গ্রন্থে হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু মুজাহেদ এসেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে খোশ আমদেদ জানালেন এবং এরশাদ করেনঃ "তোমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদ ফিরে এসেছো"। আরজ করা হলো, বড় জেহাদ কি? তিনি এরশাদ করেছেনঃ "নিজের প্রবৃত্তিকে বশে আনাই বড় জেহাদ"।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতের মর্মবাণী হলো, তোমরা আত্মসংশোধনে সচেষ্ট হও, নিজের প্রবৃত্তিকে বশে আনতে চেষ্টা কর এবং অন্য মানুষের সংশোধনের জন্যেও চেষ্টায় ত্রুটি করোনা এবং ইসলামের দুশমদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর। কেননা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কৃত কোন কাজই ব্যর্থ হবার নয়।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য যে সাধনাই করা হোক তা মুখে কিংবা লেখনী দ্বারা হোক, দৈহিক বা আর্থিক-সবই জেহাদের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে নিজের নফস বা রিপুর বিরোধিতা, ইবলিস শয়তানের বিরোধিতা, কাফের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এসব কিছুকেই জেহাদ বলা হয়।

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, তোমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর, যেন তারা আল্লাহর রাহে ফিরে আসে, তথা ইসলামে ফিরে আসে।

আর এবনে মুনজের এবং এবনে জোরায়েয (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে থাক এবং কোন সমালোচকের সমালোচনাকে ভয় করোনা। এটিই হলো জেহাদের হক্ব আদায় করা।[১]

هُوَ اجْتَبٰىكُمْ

"তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৫৪
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪০৭

মুসলিম জাতির উচ্চ মর্যাদা

আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে অসাধারণ নেয়ামত দান করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের মর্যাদা দিয়েছেন, তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান করেছেন। তোমাদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়ার মর্যাদা দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্ববাসীকে আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছাবার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক আমাকে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার জন্যে মনোনীত করেছেন। তিনি আমার সাথী বা সাহাবীদেরকেও মনোনীত করেন, আর আমার সাথীদের মধ্য থেকে আমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছেন এবং আমার সাহায্যকারী মনোনীত করেছেন।

হযরত ওয়াসেলা এবনে আসকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর থেকে কেনানকে পছন্দ করেছেন। আর কেনানের বংশধরদের থেকে কোরায়শকে মর্যাদা দিয়েছেন। আর কোরায়শ থেকে বনী হাশেমকে পছন্দ করেছেন। আর বনী হাশেম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। (মুসলিম)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

"তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন প্রকার কঠোরতা আরোপ করেননি"।

অর্থাৎ যা পালন করা দুঃসাধ্য, এমন কোন বিধান তোমাদের ধর্মে রাখা হয়নি তথা দ্বীন ইসলামকে সহজ করে দিয়েছেন।

দ্বীন ইসলামকে সহজ করেছেন

তফসীরকারগণ এ কথার ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন ভাবে।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, দ্বীন ইসলামকে সহজ করার তাৎপর্য হলো, যেমন অযুর পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা যায়, ভ্রমণ কালে চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযকে দু' রাকাত পড়ার তথা কসর করার বিধান দেয়া হয়েছে। দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম হলে বসে, এমনকি শায়িত অবস্থায় নামায আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, বনী ইসরাঈলের উপর যে সব কঠিন বিধান জারি করা হয়েছিল, উম্মতে মোহাম্মদীয়া থেকে তা তুলে নেয়া হয়েছে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মোমেনগণ কোন গুনাহর কাজে লিপ্ত হলে, আল্লাহ পাক এ গুনাহর শাস্তি থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করে দেন। তওবার তৌফিকের মাধ্যমে অথবা দুনিয়াতে কোন শাস্তি দিয়ে অথবা কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে কোন ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতের জন্যে এমন সহজ ব্যবস্থা ছিলনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো শরীয়তের বিধানের উপর আমল করা কষ্টদায়ক হয়নি, বরং মানব মন তার প্রতি আকৃষ্ট হয় যেমন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নামায আমার নয়ন মনের তৃপ্তিদায়ক। (আহমদ, নেসায়ী)

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۚ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

"এটি তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের দ্বীন, তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান"।

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রপিতামহ হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। আর এ সূত্রে তিনি তোমাদেরও প্রপিতামহ। মক্কাবাসী দ্বীনে ইব্রাহীমকে পছন্দ করতো, এমনকি মুশরেকরা দাবী করতো আমরা মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, দ্বীন ইসলামই হলো মিল্লাতে ইব্রাহীম। যারা শরীয়তে মোহাম্মদীকে মেনে চলে, তারাই মিল্লাতে ইব্রাহীমের সত্যিকার অনুসারী, তোমরা নও। কেননা তোমরা মুশরেক, আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আজীবন শেরকের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। আল্লাহ পাক ইতোপূর্বে পূর্বকালের আসমানী কিতাব সমূহে এবং এই পবিত্র কোরআনেও তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলমান।

তফসীরকার এবনে যায়েদ বলেছেন, هو সর্বনামটি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে ইব্রাহীম (আঃ)-এর দিকে। অর্থাৎ ইব্রাহীমই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম কেননা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণের সময় যে তিনটি দোয়া করেছিলেন, তন্মধ্যে একটি হলোঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ.....

(হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে তোমার অনুগত বানাও, আর আমাদের বংশধরদেরকেও তোমার অনুগত কর) এভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উম্মতে মোহাম্মদীয়ার নামকরণ করেছেন মুসলিম।

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

"যেন রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী স্বরূপ হয় আর তোমরা সাক্ষী হও সমগ্র মানব জাতির জন্যে"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করেছেন, তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান, যেন তোমাদের রসূল কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমি তাদের নিকট ইসলাম পৌঁছিয়ে ছিলাম এবং তোমরা সাক্ষ্য প্রদান কর সমগ্র মানব জাতির ব্যাপারে যে, তাদের যুগে প্রেরিত নবীগণ তাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে ছিলেন।

হাদীস শরীফে উল্লেখিত আছে, কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম হযরত ইস্রাফিল (আঃ)-কে ডাকা হবে। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি আমার বাণী পৌঁছিয়ে ছিলে?

ইস্রাফিল (আঃ) বলবেন, আমি জীব্রাঈলের নিকট ঐ বাণী পৌঁছিয়েছি। তখন জীব্রাঈল (আঃ)-কে হাযির করা হবে এবং তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। জীব্রাঈল (আঃ) বলবেন, আমি ঐ হুকুম পয়গম্বরগণের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। তখন নবী রসূলগণকে হাযির করা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে, জীব্রাঈল (আঃ) কি তোমাদের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে ছিল, তোমরা তা কি করেছিলে? তারা আরজ করবেন, আমরা আমাদের নিজ নিজ উম্মতকে তা পৌঁছে দিয়েছি। তখন সকল উম্মতকে হাযির করা হবে এবং অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে। কিছু লোক বলবে, পৌঁছিয়েছেন। তখন নবী রসূলগণ বলবেন, আমাদের নিকট সাক্ষী রয়েছে, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আমরা তোমার বাণী পৌঁছিয়েছি। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের সাক্ষী কে? তখন তারা বলবেন, উম্মতে মোহাম্মদীয়া। তখন উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে হাযির করা হবে এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। উম্মতে মোহাম্মদীয়া এ সাক্ষ্য দেবে যে, প্রত্যেক নবী আল্লাহ পাকের বাণী তাদের নিজ নিজ উম্মতকে পৌঁছিয়ে ছিলেন। তখন অন্য উম্মতের লোকেরা বলবে, হে পরওয়ারদেগার! উম্মতে মোহাম্মদীয়া আমাদের পরে এসেছে, তারা কিভাবে আমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে? এ প্রশ্ন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে করা হবে। তখন উম্মতে মোহাম্মদীয়া বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করেছ এবং তাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছ, আমাদের রসূলই আমাদেরকে একথা বলেছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা তাদের নিকট প্রেরিত নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, আর পবিত্র কোরআনই আমাদের কথার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে এ কথাই এরশাদ হয়েছেঃ

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের দিন উম্মতে মোহাম্মদীয়াই হবে রাজসাক্ষী। এ উচ্চ মর্যাদা লাভ হবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সৌজন্যে। অতএব, উম্মতে মোহাম্মদীয়ার কর্তব্য হলো, এ উচ্চ মর্যাদা এবং মহান দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করা। পরবর্তী আয়াতে এ উদ্দেশ্যে তিনটি কর্মসূচি বর্ণিত হয়েছে।

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা নামায কায়েম কর।

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থাৎ যাকাত আদায় কর তথা শারীরিক ও আর্থিক এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার চেষ্টা কর। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যে নেয়ামত দিয়েছেন তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখ।

وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ

অর্থাৎ জীবনের সকল বিষয়ে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখ, শুধু আল্লাহ পাকের কাছে চাও, আর কারো কাছে নয়।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহর দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাক।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা তা সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবেনা। একটি আল্লাহর কিতাব, দ্বিতীয়টি তাঁর রসূলের আদর্শ।

هُوَ مَوْلٰكُمْ

তিনিই তোমাদের অভিভাবক, তিনিই তোমাদের সাহায্যকারী, তিনিই তোমাদের নেগাহবান।

فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

(কত উত্তম এই অভিভাবক, আর কত উত্তম সাহায্যকারী!) অতএব, তোমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখ। তাঁর নিকটই আশা কর এবং তাঁর প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১৯ই জুন ১৯৯৩ মোতাবেক ২৮শে জিলহজ্ব ১৪১৩ হিজরী, রোজ শনিবার রাত সাড়ে এগারটায় তফসীরে নূরুল কোরআনের সপ্তদশ খন্ডের রচনা শেষ হল। হে আল্লাহ! কবুল কর এ সাধনাকে, সহজ কর এ মহান কাজকে এবং তফসীরে নূরুল কোরআনকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, তোমার রহমত ও মাগফেরাত দানে আমাদেরকে ধন্য কর। আমীন।

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين